প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট-লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

প্রচ্ছদ : শ্রী সৌরেন সেন

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৪, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৬, ডিসেম্বর ১৯৫৯
তৃতীয় সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬৭, মার্চ ১৯৬০

মুদ্রক : শ্রী সিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা ৬

গ্রন্থসূচি

ভূমিকা : সংস্কৃত কবিতা ও 'মেঘদূত

সংস্কৃত কবিতার সঙ্গে আজকের দিনে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। সেই বিচ্ছেদ দুস্তর না হোক, সুস্পষ্ট। আর তার কারণ শুধু এই নয় যে সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা আমরা করি না। চর্চা করি না — এ-কথা সত্য কিনা তাও সন্দেহ করা যেতে পারে। ইংরেজ আমলে সংস্কৃত শিক্ষার মর্যাদাহ্রাস, আধুনিক যন্ত্রযুগে সংস্কৃত বিদ্যার আর্থিক মূল্যের অবনতি, কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে সংস্কৃতের ক্ষীয়মাণ প্রয়োজন — এই সব নৈরাশ্যকর তথ্য সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষার চর্চা ক'রে থাকেন ; যাঁরা নামত এবং প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত, তাঁদের সংখ্যাও খুব কম নয়। এমন নয় যে দেশসুদ্ধ সবাই সংস্কৃত ভুলে গেছে, স্কুলে-কলেজে তা পড়ানো হয় না, কিংবা আধুনিক বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের কোনো যোগ নেই। বরং আধুনিক বাংলা ভাষায় দেশজ শব্দের বদলে তৎসম ও তদ্ভবের প্রচার বেড়েছে (তথাকথিত বীরবলী ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়), এবং রবীন্দ্রনাথ, যিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর বিরাট মূলধনের বৃহত্তম অংশটিও সংস্কৃত থেকে আহৃত। অথচ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথ পড়েন, তাঁদের মধ্যে হাজারে একজনও কোনো সংস্কৃত কাব্যের পাতা ওল্টান কিনা সন্দেহ। যে-সব শিক্ষাপ্রাপ্ত বা শিক্ষালাভেচ্ছু বাঙালি 'হ্যামলেট' প'ড়ে থাকেন, বা গ্যেটের 'ফাউস্ট' বা, এমনকি, 'রাজা অয়দিপৌস' অথবা 'ইনফের্নো', তাঁদের মধ্যে ক-জন আছেন যাঁদের 'মেঘদূত' বা 'শকুন্তলা' পড়ার কৌতূহল জাগে, কিংবা যাঁরা ভাবেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় না-থাকলে তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লো না ? যাঁরভেই হয়, তাঁদের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর।

এই অবস্থার জন্য আমাদের অত্যধিক পশ্চিমপ্রীতিকে দোষ দেয়া সহজ, কিন্তু পশ্চিমের প্রতি এই আসক্তি কেন ঘটলো তাও ভেবে দেখা দরকার। আমি এ-উত্তর দেবো না যে সৃষ্টিশীল জীবিত ভাষায় রচিত পশ্চিমী সাহিত্যের আকর্ষণ এত প্রবল যে তার প্রতিযোগে সংস্কৃত দাঁড়াতে পারে না। পশ্চিমের আকর্ষণ নিশ্চয়ই দুর্বার, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে আমাদের যা পাবার আছে, তাও মূল্যবান, এবং অন্য কোথাও তা পাওয়া যাবে না। এ-কথা পৃথিবী জু'ড়েই সত্য, কিন্তু বিশেষভাবে প্রযোজ্য ভারতীয়দের পক্ষে ; যিনি

কোনো ভারতীয় ভাষা বা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁর পক্ষে সংস্কৃতের অভাবের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। এই কথাটা তর্কস্থলে মেনে নেবার তেমন বাধা হয় না, কিন্তু কাজে খাটাতে গেলেই বিপদ বাধে। আসল কথা, আমরা সংস্কৃতের সম্মুখীন হ'লেই ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করি, তার সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহ জেগে উঠলেও উপযোগী খাদ্য পাই না ;— যা পাই, তা শুধু তথ্য (তাও তর্কমুখর), নয়তো উচ্ছ্বাস, নয়তো হিন্দু-নামাঙ্কিত এক তুষারীভূত মনোভাব, যা কালের গতিকে অস্বীকার ক'রে নিজের মর্যাদায় স্থবির হ'য়ে আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের, সাহিত্য হিশেবে, চর্চার পথ তৈরি হয়নি ; চলতে গেলেই হুঁচট খেতে হয় ইতিহাসে, ঘুরতে হয় দর্শনের গোলকধাঁধায়, নয়তো ব্যাকরণের গর্তে প'ড়ে হাঁপাতে হয়। আসল কথা, আমাদের সমকালীন জীবনধারার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো সত্যিকার সম্বন্ধ এখনো স্থাপিত হয়নি।

প্রাচীন ভারত এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোম একই জগতের অন্তর্ভূর্ত ছিলো, দুই ভূখণ্ডে কিছু বিনিময় ছিলো না তাও নয় ; য়োরোপে খ্রিষ্টীয় সভ্যতার উত্থানের পরে যে-অবরোধ নামে তা রেনেসাঁসের সূচনামাত্রে কেমন ক'রে উত্তোলিত হয় সেই ইতিহাসও পুরাতন কথা। একদিন জগতের হাটে পৌঁছলো আমাদের 'পঞ্চতন্ত্র' — স্কুল থেকে আমাদের পরিচিত সেই করটক ও দমনক নামক শৃগালদ্বয় — আর বুদ্ধজীবনী, বৌদ্ধ কাহিনী, 'কথাসরিৎসাগরে'র অনেকগুলো ছেঁড়া পাতা — পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ য়োরোপের প্রতিটি ভাষায় অনূদিত, অনুলিখিত, ও সম্প্রচারিত হ'লো সেই সম্ভার : সংস্কৃত থেকে ফার্শি, ফার্শি থেকে আরবি, আরবি থেকে তুর্কি, সিরীয়, গ্রীক, লাতিন, ইত্যাদি — এমনি ঘুরে-ঘুরে য়োরোপের সাহিত্যে নতুন একটি দিগন্ত খুলে দিলো। কিন্তু বোকাচ্চো বা চসার জানতেন না তাঁদের অনেক গল্পের আদি উৎস ভারতবর্ষ ও সংস্কৃত ভাষা ; আর শেক্সপিয়ার অবশ্য স্বপ্নেও ভাবেননি যে তাঁর 'দি টেমিং অব দি শ্রু' নাটকের মুখবন্ধটি একটি প্রাচীন ভারতীয় কথিকার সাত-হাত-ফেরতা ভিন্ন প্রকরণ। য়োরোপের 'আলোকপ্রাপ্তি'র যুগে ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে যে-'প্রাচ্য' কাহিনীরচনার ধুম প'ড়ে যায় — যাতে নেতৃত্ব করেন ভলতেয়ার, মঁতেস্কিউ ও স্যামুয়েল জনসন — তাও ছিলো স্বল্প জ্ঞান স্বচ্ছন্দ কপোলকল্পনায় আশ্রিত। ঘোষিতভাবে সংস্কৃত পুঁথি ও ভারতীয় চিন্তা পশ্চিম দেশে বিকীর্ণ হ'লো এই সেদিন মাত্র, যখন, ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠার পর, উইলিয়ম জোন্স 'শকুন্তলা' ও 'মনুসংহিতা'র এবং চার্লস উইলকিন্স ভগবদ্গীতা ও

'হিতোপদেশে'র প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করলেন। একই সময়ে বের্নিয়ে নামে একটি ফরাশি, ভাগ্যান্বেষণে ভারতে এসে, য়োরোপে নিয়ে গেলেন একগুচ্ছ উপনিষদের ফার্শি অনুবাদ, যার সম্পাদনা করেছিলেন শাহাজান-পুত্র দারা শুকো। সেই ফার্শি থেকে, লাতিন, গ্রীক ও ফরাশি মেশানো এক অদ্ভুত ভাষায়, ১৮০১ সালে দ্যুপের‍ঁ যে-অনুবাদ প্রকাশ করেন, সেটি প'ড়েই শোপেনহাওয়ার বলেছিলেন যে 'উপানিষাৎ' তাঁর 'জীবনব্যাপী সান্ত্বনা ও মৃত্যুকালীন শান্তি'। কিন্তু তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য সমাজে সংশয় জেগেছিলো সংস্কৃত নামে কোনো ভাষা সত্যি আছে কিনা; কোনো-কোনো সাম্রাজ্যদাম্ভিক মহোদয় ধ'রে নিয়েছিলেন সেটা ব্রাহ্মণদের জালিয়াতি। অনতিপরেই যখন প্রমাণ হ'লো যে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব আছে, এবং তাতে বিরাট একটি সাহিত্যও বিদ্যমান, আর প্রাচীন পারসিক, গ্রীক ও লাতিনের তা আত্মীয়, তখন সারা য়োরোপে — জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ইতালিতে — দেখা দিতে লাগলেন সংস্কৃতজ্ঞ ভারতবিদ্যানের দল, বহু সংস্কৃত পুঁথি অনূদিত ও মুদ্রিত হ'লো, এবং আমরা, য়োরোপের হাত থেকে, আমাদেরই সংস্কৃত বিদ্যা ফিরে পেলাম।

অর্থাৎ, আধুনিক ভারতে সংস্কৃত চর্চা একটি বিলেতফেরৎ সামগ্রী, ভারতের তুলো বা পাট নিয়ে শ্বেতাঙ্গরা যেমন বিবিধ প্রস্তুত পণ্যের আকারে ভারতের হাটেই চালিয়েছে, তেমনি তাদের বুদ্ধির প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত বিদ্যাও রূপান্তরিত হ'লো নানা রকম ব্যবহারযোগ্য বিজ্ঞানে। সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কারের ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করলেন পশ্চিমী পণ্ডিতেরা; 'আর্য' বা 'ইন্দো-য়োরোপীয়' বংশাবলির সন্ধান পেয়ে ইতিহাসের মূল ধারণা বদলে দিলেন; প্রত্নতত্ত্বের নতুন দ্বার খুলে গেলো; এবং ধর্মতত্ত্বে গবেষণার ক্ষেত্র তিব্বত, বর্মা, মহাচীন অতিক্রম ক'রে জাপানের দিগন্তসীমায় প্রসারিত হলো। এই আকারেই য়োরোপের হাতে সংস্কৃত বিদ্যা ফিরে পেয়েছি আমরা — ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্বের আকারে; এবং নিজেরা যেটুকু কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছি তাও এই সব ক্ষেত্রে — ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বা ধর্মতত্ত্বে।

এমন কেউ নেই, যিনি এ-সব বিষয়ে গবেষণা বা আলোচনার মূল্য স্বীকার না-করবেন। কিন্তু যে-কথাটা আমরা অনেক সময় ভুলে থাকি, এবং মাঝে-মাঝে নিজেদের এবং অন্যদের যা স্মরণ করাবার প্রয়োজন হয়, তা

এই যে এ-সব বিষয় সাহিত্য নয়, এবং সাহিত্যের আত্মা বিষয়ে নিঃসাড় হ'য়েও এ-সব ক্ষেত্রে কৃতী হওয়া সম্ভব। বস্তুত, সংস্কৃত বিষয়ে য়োরোপীয় ভাষায় গ্রন্থের সংখ্যা যেমন বিপুল, ঠিক তেমনি বিরল তার মধ্যে কোনো সপ্রাণ সাহিত্যিক মন্তব্য, বা কবিতা বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি। উইলিয়ম জোন্স ও এড্‌উইন আর্নল্ডের রচনায় আমরা অনেক প্রীতিকর উচ্ছ্বাস পড়েছি — কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় মূল্যায়নের চেষ্টা দেখিনি। গ্যেটের 'শকুন্তলা'-প্রশস্তি, এমার্সনের 'ব্রহ্ম', হুইটম্যানের 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া', এলিয়টের 'দি ওয়েইস্ট ল্যাণ্ড' ও 'ফোর কোআর্টেটস'* — এগুলো বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিক উদাহরণমাত্র : সমগ্রভাবে এ-কথাই সত্য যে সংস্কৃত ভাষার রচনাবলির মধ্যে শ্বেতাঙ্গরা দেখেছেন — গ্রীক বা লাতিনের মতো কোনো সাহিত্য নয়, রসসৃষ্টি নয়, সৃষ্টিকর্ম নয় — দেখেছেন ইতিহাস ইত্যাদির উপাদান, আর ভারতীয় মনের পরিচয় পেয়ে ভারতবাসীকে বশীভূত রাখার ও খ্রিষ্টানীকৃত করার একটি সম্ভাব্য উপায়। শেষের কথাটা, বলা বাহুল্য, ইংরেজ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আমরা লক্ষ করি, আর্থার ওয়েইলির সঙ্গে তুলনীয় কোনো নিষ্ঠাবান ও উৎসর্গিত ইংরেজ অনুবাদক সংস্কৃতের ভাগ্যে জোটেনি — যদিও চৈনিক ও জাপানি ভাষা ইংরেজের পক্ষে অনেক বেশি দুরূহ ও সুদূর ; সংস্কৃত থেকে ভালো অনুবাদ যাঁরা করেছেন তাঁরাও পেশাগতভাবে ভাষাতত্ত্বজ্ঞ বা ঐতিহাসিক, আর পণ্ডিতজনেরা কেউ-কেউ যে অপাঠ্য অনুবাদ প্রণয়ন করেননি তাও নয়। স্বনামধন্য উইলসন-কৃত 'মেঘদূতে'র অনুবাদটি মূল রচনাকে লজ্জা দেয়, এবং তাঁর টীকা প'ড়েও বোঝা যায়, তাঁর

* আমি লক্ষ করছি, এই চারজন লেখকের মধ্যে তিনজনই মার্কিন, আর এটাকে নেহাৎ আপতনও বলা যায় না। কলম্বাস চেয়েছিলেন সমুদ্রপথে ভারতে পৌঁছতে, তাঁর প্রাপ্ত দেশকেও ভারত ব'লে ভেবেছিলেন ; ভারতের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক সম্বন্ধ মার্কিনের পক্ষে ভোলা সহজ নয়। এবং যে-কালে য়োরোপের পরাক্রান্ত জাতিরা প্রাচীলুণ্ঠনে লিপ্ত ছিলো, আমেরিকায় তখন ঐতিহ্যসন্ধানের চেষ্টা চলছে ; সেই সন্ধানের প্রধান প্রবক্তা ওঅল্ট হুইটম্যান, প্রাচী-প্রতীচীর দ্বৈতবোধ অতিক্রম ক'রে, সারা পৃথিবীকে এক ব'লে ভেবেছিলেন। বৈদেশিক সংস্কৃতি বিষয়ে অনীহামুক্তি য়োরোপে সাম্প্রতিক ঘটনা, কিন্তু মার্কিনিরা জাতি হিশেবে তরুণ ও বহুমিশ্র ব'লে, ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় মহাদেশের অধিবাসী ব'লে, অপরিচিত বিষয়ে প্রথম থেকেই সহজে সাড়া দিয়েছে। গ্যেটের কথা আলাদা, বিশ্বসাহিত্যে'র ধারণার তিনিই জনক ; এবং তাঁর উত্তরসাধক টোমাস মান্‌ও, হাইনরিখ ৎসিমার-এর পরামর্শ মতো, 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র ষষ্ঠ উপাখ্যান অবলম্বনে একটি মনোজ্ঞ উপন্যাস রচনা করেন।

প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো 'ভারতের ভূগোল, জলবায়ু, পশুপাখি ও উদ্ভিদবিষয়ে জ্ঞানদান, এবং এ-বিষয়ে তাঁর স্বদেশবাসীকে অবহিত করা যে ভারতীয় মানুষ বর্বর নয়, এমনকি কৃতজ্ঞতার অর্থ বোঝে ('ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়। / প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥')। অক্সফোর্ডের বডেন-অধ্যাপকের পদ যাঁর দানের ফলে সম্ভব হয়, সেই লেফটেনাণ্ট-কর্নেল বডেন স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে এই পদস্থাপনে তাঁর লক্ষ্য সংস্কৃত ভাষায় বাইবেল-অনুবাদের উন্নয়ন, 'যাতে তাঁর স্বদেশীয়রা ভারতবাসীকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করাবার কাজে অগ্রসর হ'তে পারে।' এই পদের প্রথম দুই অধিকারী প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতন ও সশ্রদ্ধ ছিলেন : উইলসন-এর নিয়োগের সপক্ষে প্রধান অনুমোদন ছিলো বাইবেলের কতিপয় শব্দের তৎকৃত সংস্কৃত অনুবাদ ; এবং মনিয়র-উইলিয়মস তাঁর বৃহৎ ও মহৎ অভিধানের ভূমিকায় জানাতে ভোলেননি যে তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ থেকে বাইবেলের জনৈক অনুবাদক প্রচুর সাহায্য পান। অবশ্য খ্রিষ্টধর্মের প্রচার বিষয়ে সব লেখক সরব নন, কিন্তু ভারতীয় বিষয় নিয়ে এমন কোনো ইংরেজ মাথা খাটাননি — হোক তা ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য, কৃষি বা ব্যাকরণ — যিনি মনে-মনে না-জানতেন যে তাঁর কর্ম সাম্রাজ্য-রক্ষা ও -বিস্তারের অঙ্গবিশেষ। 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বলতে উনিশ শতকে যা বোঝাতো, সেই বিরাট দায়িত্বের মধ্যে সংস্কৃত চর্চাও গ্রথিত ছিলো। এ-কথা ব'লে পথিকৃৎ ইংরেজ লেখকদের সাধুতায় আমি সন্দেহপাত করছি না — সাম্রাজ্যশাসন ও সাধুতায় কোনো বিরোধ ছিলো না তাঁদের মনে — এবং তাঁদের কাছে সারা ভারতের ঋণ কত গভীর সে-বিষয়েও আমি সম্পূর্ণরূপে সচেতন। আমি শুধু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে চাচ্ছি। রেনেসাঁসের সময় গ্রীসের অভিঘাতে য়োরোপীয় চিত্তের যে-বৃত্তিটি জেগে উঠলো তা সৌন্দর্যবোধ, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য গবেষণাকে তারই শাখা-প্রশাখা বললে ভুল হয় না। কিন্তু ভারতের আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কার ঘটলো একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনের প্রাক্কালে, সেইজন্য প্রথম থেকেই মনোযোগ পড়লো তথ্যের দিকে; রসের দিকে নয়, বিশ্লেষধর্মী বিজ্ঞানের দিকে, সংশ্লেষধর্মী উপলব্ধির দিকে নয়। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সারা প্রতীচীর ভারত-চর্চার এ-ই হ'লো সাধারণ লক্ষণ। আর তাই, সাহিত্য যেখানে কেবল সাহিত্য, সেই ক্ষেত্রে প্রতীচ্য ভারতজ্ঞের কাছে আমাদের বেশি কিছু শিক্ষণীয় নেই। এই একটা দিকে, আমাদের মনকে তাঁরা

জাগাতে পারেননি ; আর দুঃখের বিষয় আমাদের উনিশ-শতকী জাগরণও এ-বিষয়ে নিষ্ফল হয়েছে।*

য়োরোপীয় ভাষায় যে-সব গ্রন্থ নামত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সকলেই জানেন তাদের মধ্যে ইতিহাসের অংশই মুখ্য, সাহিত্য সেই সম্ভার সাজাবার উপলক্ষ মাত্র। পুস্তকের বড়ো অংশ ব্যবহৃত হয় কালনির্ণয়ে ও তথ্যবিচারে, তার পরে থাকে গ্রন্থাদির তালিকা ও চুম্বক। সমালোচনা বা গুণগ্রহণের চেষ্টা বা ইচ্ছা নেই তা নয়, কিন্তু প্রায়শই তা ভীরু ও অর্ধমনস্ক, লেখক নিজেই তাঁর কথায় বিশ্বাসী কিনা সে-বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ থেকে যায়। যেখানে হয়তো নিন্দা তাঁর অভিপ্রায়, সেখানে তিনি শিষ্টতার আড়ালে আত্মগোপন করেন, অথবা তাঁর নিন্দাবাদে দেখা যায় শুধু প্যুরিটানিক অন্ধতা ; আর তাঁর প্রশংসার মধ্যেও সে-ধরনের উৎসাহ পাওয়া যায় না, যাতে আলোচ্য কবি বা কবিতায় কোনো নতুন অর্থ ধরা পড়ে। ফলত, পুরো ব্যাপারটা এক মৃদু, মোলায়েম ও পাণ্ডুবর্ণ বিবরণের আকার নেয়, যা পাঠ ক'রে কবির আনুমানিক কাল, কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ ও অন্যান্য সম্পৃক্ত তথ্য আমরা জানতে পারি, কিন্তু কাব্যটি কেমন, ভালো যদি হয় তো কোন ধরনের ভালো,

* আমি ভুলে যাচ্ছি না উনিশ শতকের সুকৃতি কত প্রচুর : কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের মহৎ অনুবাদ প্রণয়ন করেন ; বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য লেখকদের অনুবাদে, অনুলিখনে ও প্রবন্ধাবলিতে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারত ইংরেজি-শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজের সামনে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তৎকালীন মনীষীরা যেন ধ'রে নিয়েছিলেন যে প্রাচীন ভারতে যা-কিছু ছিলো তা-ই মহিমান্বিত ; তাঁরা অতীতকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিলেন, কিন্তু যাচাই করতে শেখাননি। রেলগাড়ি-টেলিগ্রাফের যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের সংলগ্নতা কোথায়, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র আধুনিক সাহিত্যে প্রয়োজ্য হ'তে পারে কিনা — এ-সব প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগেনি ; তাঁদের মুখে আমরা শুনেছি শুধু বর্তমানের নিন্দা ও লুপ্ত তপোবনের স্তবগান। এই মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ; তাঁর সমগ্র রচনাবলি অন্বেষণ করলে দেখা যাবে, শুধু একটি স্থলে 'কালিদাসের কালে'র তুলনায় স্বকালকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন (যদিও তির্যক পরিহাসের ভঙ্গিতে) ; কিন্তু 'বিদুষী বিনোদিনী'র সান্ত্বনা সত্ত্বেও 'উজ্জয়িনীর কানন-ঘেরা বাড়ি' বা 'কবিতাপাঠান্তে নায়িকার হাত-থেকে পাওয়া 'বেলফুলের মালা'র জন্য তাঁর আক্ষেপ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ফুরোয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা উঠলে এক মুগ্ধ আবেশ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ; তাঁর 'মেঘদূত' নামক কবিতায় ও প্রবন্ধে এমন-কিছু নেই যা 'মেঘদূতম্'-এ না আছে, এবং 'মেঘদূতম্'-এ এমন অনেক-কিছু আছে যা তাঁর রচনা দুটিতে নেই। যৌনতা ও ইন্দ্রিয়বিলাস ছেঁটে দিলে 'মেঘদূতে'র কঙ্কালমাত্র বাকি থাকে, আর কালিদাসের যা বাকি থাকে তা আর যা-ই হোক তাঁর চরিত্র নয়।

বিদেশী কাব্যের এবং আধুনিক পাঠকের সঙ্গে সেটি কোন ধরনের সম্বন্ধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে — এই সব জরুরি বিষয়ে কিছুই জানতে পারি না। উইলসন তাঁর 'মেঘদূতে'র টীকায় পশ্চিমী কাব্য থেকে বহু সদৃশ অংশ তুলে দিয়েছেন ; কিন্তু পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে অংশগুলি জ্ব'লে ওঠেনি, কোনো ভাবনার প্রভাবে পরস্পরে প্রবিষ্ট হয়নি, জড় বস্তুর মতো শুধু পাশাপাশি পড়ে আছে। 'পরস্পরে প্রবিষ্ট' বলতে কী বোঝায়, তার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় এলিয়টের কবিতা ও প্রবন্ধ, বা আঁদ্রে মালরো-র শিল্পবিষয়ক রচনাবলি, — যেখানে দেশকালের দূরত্ব দ্বারা আপাতবিচ্ছিন্ন ছবি বা কবিতা উদ্দেশ্যময় প্রতিবেশিতার ফলে একই বিশ্ব-ভাবনার অঙ্গ হ'য়ে পরস্পরকে বর্ধিত ও রঞ্জিত করে। এই সংশ্লেষ ঘটাবার জন্য কিছুটা কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন, এবং পণ্ডিতের কাছেও সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু য়োরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞেরা — হাইনরিখ ৎসিমার-এর মতো দুর্লভ দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া — সাধারণত এই গুণে বঞ্চিত, এবং আমরা সম্প্রতি তাঁদেরই ইশকুলে অধ্যয়ন করেছি। ফলত, স্বদেশীয়দের রচনাও একই পথ নিয়েছে ; এ-দেশেও সংস্কৃত বিদ্যার অর্থ দাঁড়িয়েছে সাল-তারিখ নিয়ে সংগ্রাম, তথ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ও বিবরণ — আর অবশ্য তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা। আমরা যারা সাধারণ পাঠক, আমাদের প্রায় ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে সংস্কৃত 'মৃত' ভাষা হ'লেও তার সাহিত্য জীবন্ত ; প্রায় বিশ্বাস করানো হয়েছে যে পুরাকালীন গ্রীক, চীন, লাতিন সাহিত্য, এবং সব দেশের আধুনিক সাহিত্যে যে-সহজ প্রাণস্পন্দন আমরা অনুভব করি, তা থেকে বঞ্চিত শুধু সংস্কৃত, পৃথিবীর মধ্যে শুধু সংস্কৃতই এক বিশাল ও শ্রদ্ধেয় শবে পরিণত হয়েছে, ব্যবচ্ছেদের প্রকরণ না-শিখে যার সম্মুখীন হওয়া যাবে না। আমাদের সঙ্গে সংস্কৃত কবিতার যে-বিচ্ছেদ ঘটেছে এটাই তার অন্যতর কারণ।

২

দ্বিতীয় কারণ — সংস্কৃত ভাষার ও ব্যাকরণের দু-একটি বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃতে শব্দসংখ্যা বিপুল, প্রতিশব্দ অসংখ্য। তার কিছু অংশ বাংলাতেও চ'লে এসেছে ; আমরা যারা সংস্কৃতে সুশিক্ষিত নই আমরাও খুব সহজে যে-কোনো বহুব্যবহৃত বিশেষ্যপদের একাধিক নামান্তর ভাবতে পারি : গৃহ,

ভবন, সদন, নিকেতন; তরু, বৃক্ষ, দ্রুম, পাদপ — এমনি অনেক ক্ষেত্রেই। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার — বা যে-কোনো জীবিত ভাষার — একটি ব্যবহার-গত মৌল প্রভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলায় আমরা 'প্রিয়ার ভবন', 'রাজভবন' বা 'মহাজাতি-সদন' বলবো, কিন্তু 'যদু ঘোষের সদন' বা 'ভবন' বলবো না, 'যদু ঘোষের গৃহ' বললেও বেসুরো ঠেকতে পারে। অর্থাৎ, 'ভবন', 'সদন' বা 'নিকেতন' শব্দকে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, তার সঙ্গে প্রেমের, সম্মানের বা প্রাতিষ্ঠানিক একটি ইঙ্গিত জড়িত রয়েছে। তেমনি, 'বটবৃক্ষ', 'তরুলতা', 'পান্থপাদপ', 'বোধিদ্রুম' — এই প্রয়োগসমূহে শব্দগুলোর অর্থ ঠিক এক থাকছে না, আকারে-প্রকারে গাছেদের মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়ে দিচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে যখন লেখেন, 'বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছেন', তখন এই শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে গাছের বৃক্ষত্ব আমাদের মনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, সংস্কৃতে প্রতিশব্দসমূহ সম্পূর্ণরূপে সমার্থক, তাদের মধ্যে অনায়াসে বিনিময় চলে, তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনাও প্রায় অফুরন্ত। এবং এই প্রতিশব্দপ্রয়োগ সংস্কৃত কবিতার প্রকরণের একটি প্রধান নির্ভর; এমন পুঁথিও পাওয়া গেছে যা প্রতিশব্দের তালিকা, যা থেকে লেখকরা, ছন্দের প্রয়োজন বুঝে, যথোচিত মাত্রাযুক্ত শব্দ বেছে নিতে পারেন। এ-ধরনের কোনো পুঁথি কালিদাসের হাতের কাছে ছিলো কিনা জানা যায় না, তবে সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে বহু প্রতিশব্দ ব্যবহার না-ক'রে সংস্কৃত ভাষায় ছন্দরচনা অসম্ভব। অথচ প্রত্যেক আধুনিক ভাষা উত্তরোত্তর প্রতিশব্দ বর্জন ক'রে চলেছে — তাদের ধর্মই তা-ই; এবং এ-কাজে যে-ভাষা যত বেশি অগ্রসর তাকেই আমরা তত বেশি পরিণত বলি, তত বেশি সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী।

একটা উদাহরণ নেয়া যাক। স্ত্রীজাতি — যাকে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের প্রধান উপাদান বললে ভুল হয় না — তার কতিপয় প্রতিশব্দের সংজ্ঞার্থ মনিয়র-উইলিয়মস-এর অভিধান থেকে উদ্ধৃত করি:

নারী:	a woman, a wife; a female or any object regarded as feminine.
স্ত্রী:	'bearer of children', a woman, female, wife, the female of any animal.
রমণী:	a beautiful young woman, mistress.
ললনা:	(লল=ক্রীড়াশীল) a wanton woman, any woman, wife.

অঙ্গনা : a woman with well-rounded limbs, any woman or female,

কামিনী : a loving or affectionate woman ; a timid woman, a woman in general.

বনিতা : (বনিত=প্রার্থিত, ঈপ্সিত, প্রণয়যোগ্য) a loved wife, mistress, any woman (also applied to the female of an animal or bird).

বধূ : a bride or newly-married woman, young wife, spouse, any wife or woman, a daughter-in-law, any young female relation, the female of any animal, (esp.) a cow or mare.

মহিলা : a woman, female, a woman literally or figuratively intoxicated.

যোষিৎ (যোষণা) : a girl, maiden, young woman, wife (also applied to the females of animals and to inanimate things).

দেখা যাচ্ছে, 'নারী' ও 'স্ত্রী' সাধারণ শব্দ, সমগ্র স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রয়োজ্য, কিন্তু অন্য প্রত্যেকটির অভিপ্রায় ছিলো স্ত্রীজাতির মধ্যে বয়স, রূপ বা অবস্থার প্রভেদ বোঝানো। অথচ একই সঙ্গে প্রত্যেকটির একটি সাধারণ অর্থও উল্লিখিত হয়েছে — পশুপাখি ও জড়ের স্ত্রীজাতিও বাদ পড়েনি — এবং সংস্কৃত সাহিত্যে যা গৃহীত হয়েছে তা এই শব্দসমূহের বিশেষ-বিশেষ অর্থ নয়, অর্থের অতিব্যাপ্তি। কিংবা — এটাই বেশি সম্ভব ব'লে মনে হয় — কবিদের ব্যবহার থেকেই অভিধানকার সংজ্ঞার্থ নির্মাণ করেছেন ('যোষিৎ'-এ কুমারী ও সধবা দু-ই বোঝাচ্ছে)। অর্থাৎ, এই শব্দগুলোর প্রাথমিক অর্থ উপেক্ষা ক'রে কবিরা তাদের নির্বিশেষে ব্যবহার করেছেন, ভিন্ন-ভিন্ন ধারণাকে মিশিয়ে দিয়েছেন নিরভিজ্ঞান সাধারণের মধ্যে। কালিদাস যখন বলেন —

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং

আর যখন বলেন·

সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্

আর —

স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু

আর —

নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্

আর —

লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু

তখন 'স্ত্রী', 'বধূ', 'কামিনী', 'যোষিৎ' ও 'বনিতা'য় বিন্দুমাত্র অর্থভেদ সূচিত হয় না ; বিবাহিত কি কুমারী, গৃহস্থ কি গণিকা, তরুণী কি প্রৌঢ়া — কোনো দিকেই কোনো ইঙ্গিত নেই ; প্রতি ক্ষেত্রে শুধু নিছক নারীকেই বোঝাচ্ছে। কিন্তু বাংলায় 'নারী' বলতে বোঝায় সাধারণ অর্থে স্ত্রীজাতি (শুধু মানুষ), 'বধূ' বলতে নববধূ বা পুত্রবধূ, 'স্ত্রী' বলতে বিশেষভাবে বিবাহিত পত্নী — আর 'রমণী' বা 'কামিনী' শব্দ আমরা ব্যবহার করবো শুধু তখন, যখন রূপের রমণীয়তা বা কামের প্রবণতার ব্যঞ্জনা থাকে। একজন জীবনানন্দ দাশ যখন লেখেন —

> তোমার মতন এক মহিলার কাছে
> যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হ'তে গিয়ে
> অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
> শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
> দেখেছি অমৃতসূর্য আছে —

তখন 'মহিলা' শব্দ 'নারী'র নামান্তরমাত্র থাকে না, তাতে সমকালীন বিভাব জেগে ওঠে, আমরা অনুভব করি এই শ্লোকের উদ্দিষ্টা সেই আধুনিকাদের একজন, বক্তারা যাঁদের 'ভদ্রমহিলাগণ' ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন। আমাদের মনে এই মহিলার স্পষ্ট ছবি জেগে ওঠে : তিনি অত্যন্ত তরুণী নন, আমাদেরই মতো নগরে বাস করেন ; এবং এই শব্দের প্রয়োগে 'কিন্নরকণ্ঠ' ও 'অমৃতসূর্যে'র সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রতিতুলনার বেদনাও প্রতিভাত হয়। এক-একটি শব্দের এই বিশেষ অভিঘাত, আমরা যাকে কবিতার প্রাণ ব'লে ধারণা করি, তা সংস্কৃতে সম্ভব হয় না। সেখানে, কোনো-একটি ধারণার জন্য, একের বদলে অন্য শব্দের ব্যবহার হয় শুধু ছন্দের তাগিদে, সন্ধি-সমাসের প্রয়োজনে, বা ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধি পাবে ব'লে। কোনো শব্দই অসংগত নয়, কোনো শব্দই অনিবার্য বা অনন্য নয়।

তাছাড়া, বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করার যে-ক্ষমতা সংস্কৃত ব্যাকরণের আছে, তার ফলে শব্দার্থের অতিব্যাপ্তির প্রায় সীমা থাকে না। উপরোক্ত শব্দসমূহ কবির পক্ষে যখন যথেষ্ট হয় না, তখন আছে বিবিধ বর্ণনা-মূলক শব্দরাজি : বিম্বাধরা, নিতম্বিনী, ভামিনী, মানিনী — এই তালিকা ইচ্ছে-মতো বাড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। অধরের বর্ণ, নিতম্বের গুরুত্ব, কোপ অথবা অভিমানের অনুষঙ্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে এরাও পরিণত বা অবনত হ'তে পারে শুধুই 'নারী'তে — এমনকি 'মৃগাক্ষী', 'চারুহাসিনী' বা 'ক্ষীণমধ্যমা'র

পক্ষেও তা অসম্ভব নয়। সংস্কৃতে 'জলে'র যত প্রতিশব্দ আছে, তার যে-কোনোটির সঙ্গে '-দ', '-ধর', বা '-বাহ' যোগ করলে তার অর্থ দাঁড়াবে 'মেঘ'। ভাষার এই রকম স্বাধীনতা থাকলে শব্দের প্রাণশক্তি হ্রাস পেতে বাধ্য।

আমি ভুলে যাচ্ছি না যে সব ভাষাতেই শব্দের উৎপত্তিস্থল বর্ণনা; আমি বলতে চাচ্ছি, শব্দ যখন বর্ণনার স্মৃতি হারিয়ে ফ্যালে তখন তার বিকল্পের অভাবেই ভাষার পরিণতি সূচিত হয়। 'স্তন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যে শব্দ করে (অর্থাৎ জানিয়ে দেয় যৌবন আগত), এ-কথা আভিধানিক ছাড়া আর-কেউ না-জানলে ক্ষতি নেই, একটি নারী-অঙ্গের নাম হিশেবেই তা আমাদের কাছে গ্রাহ্য। (রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী'তে ছাড়া আদি অর্থে এই শব্দের ব্যবহার বাংলায় আমি আর কোথাও পেয়েছি ব'লে মনে পড়ে না।) এবং এই নামের মধ্যে একটা ছবিও বিধৃত হ'য়ে আছে, উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই যা আমাদের মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু এই ছবিটা স্পষ্ট হবার জন্যই এটা দরকার যে প্রত্যেকটি নাম-শব্দ একটি-মাত্র উল্লেখের মধ্যে সীমিত থাকবে। 'বহ্নি' শব্দের আদি অর্থ বাহক (যে যজ্ঞের হবি দেবতাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়); সেই অর্থ আমরা ভুলেছি ব'লেই এই যজ্ঞহীন যুগেও তাতে আগুন বোঝায়, নয়তো বাতাস, মেঘ বা নদীও বোঝাতে পারতো—কেননা তারাও বাহকের কাজ করে। 'জল' শব্দের একটি সংজ্ঞার্থ মনিয়র-উইলিয়মস-এর মতে 'any liquid', কিন্তু যদি তা দুধ, মদ বা রক্তের বদলেও ব্যবহৃত হ'তো, তাহ'লে তার ব্যবহারই এতদিনে আর থাকতো না। লক্ষ করলে দেখা যাবে, সেই সব সংস্কৃত শব্দকেই আধুনিক ব্যবহারের পক্ষে সবচেয়ে অনুপযোগী ব'লে মনে হয়, যারা একাধিক অসম্পৃক্ত অর্থের লোভ ছাড়তে পারেনি। 'পয়োধর' মানে মেঘ বা নারীর স্তন হ'তে পারে; এতে বোঝা যায় তা সম্পূর্ণ নাম-শব্দ হ'য়ে উঠতে পারেনি, বৈশেষণিক পরাধীনতায় কুণ্ঠিত হ'য়ে আছে। 'রত্নাকর'-এর চলিত অর্থ সমুদ্র, কিন্তু লিঙ্গভেদহীন বাংলা ভাষায় পৃথিবীকেও রত্নাকর বলা সম্ভব, আর সেজন্যই আধুনিক কবি শব্দটিকেই বর্জন ক'রে চলেন। 'বিম্বাধরা', 'নিতম্বিনী', 'ভামিনী' ইত্যাদিতেও সেই আপত্তি: তারা কোনো বস্তুর নাম নয়, বর্ণনা মাত্র। যেখানে একই অর্থ বহন ক'রে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে শব্দের বর্ণনার অংশ ভোলা যায় না। আর সংস্কৃতে

নিত্য ঠিক তা-ই ঘ'টে থাকে, 'নৃপ', 'ভূপ', 'ক্ষিতীশ', 'পৃথ্বীশ' প্রভৃতি শব্দের সংখ্যা এত বেশি যে তার কোনোটিকেই 'মানুষ' বা 'পৃথিবী' থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায় না (যদিও সে-ভাবে দেখানোই কবিদের উদ্দেশ্য), আর তা যায় না ব'লেই সেগুলোকে সন্দেহ হয় স্তুতিবাক্য ব'লে ; রাজার রাজকীয় চিত্ররূপ — অন্তত আমাদের মনে — প্রকাশ পায় একমাত্র 'রাজা' শব্দে। আমাদের কাছে 'রাজপথ' মানে চৌরঙ্গির মতো কোনো বড়ো রাস্তা, তার সঙ্গে 'রাজা'র সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়েছে, তার কোনো প্রতিশব্দ আমাদের পক্ষে অচিন্তনীয়। আমরা যখন বলি 'রামধনু' বা 'ইন্দ্রধনু', তখন আকাশে উদিত সপ্তবর্ণ অর্ধমণ্ডলটিকেই দেখতে পাই — রামচন্দ্র অথবা বজ্রধর দেবতাটিকে ভাবি না। কিন্তু কালিদাস অনায়াসে লিখতে পেরেছেন 'নরপতিপথ', 'সুরপতিধনু' ; তাঁর অনুকরণে আজকের দিনের কোনো বাঙালি কবি যদি 'মহীপালপথ' বা 'দেবেন্দ্রধনু' লেখেন, আমরা চেষ্টা ক'রে তার অর্থ করবো 'যে-পথে রাজা যাতায়াত করেন', 'যে-ধনু ইন্দ্র ব্যবহার করেন' — বা ঐ ধরনের অন্য কিছু। উষ্ণতা অর্থে 'অশিশিরতা' বা ময়ূর অর্থে 'নীলকণ্ঠ' শুনে আমাদের মনে কোনো অব্যবহিত অভিঘাত ঘটে না, মনে-মনে তর্জমা ক'রে নিয়ে বিষয়টিতে পৌঁছতে হয় — ব্যাপারটা দাঁড়ায় দস্তানা-পরা হাতের স্পর্শের মতো। সন্দেহ নেই, সংস্কৃতে অনেক সময় শব্দ-সংখ্যা বেড়েছে অর্থের নূতনতর দ্যোতনার জন্য নয়, নেহাৎই বৈচিত্র্যের খাতিরে — হয়তো বা ছন্দের মাত্রা মেলাবার উপায়স্বরূপ। এবং যে-শব্দ শুধুই বৈচিত্র্য দেয়, তা কবিতায় কিছু দিতে পারে না। সংস্কৃত ভাষাকে, তার বিপুল শক্তির জন্য, এই এক খেদজনক মূল্য দিতে হয়েছে।

শুধু প্রতিশব্দের স্তূপীকরণ দ্বারা সংস্কৃত মাঝে-মাঝে যে-সম্মোহন সৃষ্টি করতে পারে, তার মূল্য অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। মহাভারতে দ্রৌপদী যখন অর্জুনকে একই ভাষণের মধ্যে কখনো 'পার্থ', কখনো 'কৌন্তেয়', কখনো 'গাণ্ডীবধন্বা' ব'লে সম্বোধন করেন, বা কোনো কামাতুর মুনি কোনো মানবী বা অপ্সরাকে আহ্বান করেন একবার 'মদিরেক্ষণা', একবার 'পদ্মগন্ধা', আর তার পরেই 'পীনস্তনী' ব'লে, সেই শব্দযোজনা আমরা মুগ্ধের মতো শুনতে বাধ্য। কিন্তু লক্ষণীয়, এগুলি সত্যিকার প্রতিশব্দ নয়, শুধু বৈচিত্র্যের জন্য বসানো হয়নি, প্রত্যেকটি বিশেষণ বা বর্ণনা-শব্দ বক্তার আবেগসঞ্চারে আন্দোলিত। উত্তরমেঘে এর একটি সুন্দর উদাহরণ আছে ; মেঘের মুখে

যক্ষ তার প্রিয়াকে যে-বার্তা পাঠাচ্ছে, তার মধ্যে সম্বোধনরূপে যথাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে 'অবিধবা', 'অবলা', 'চণ্ডী', 'গুণবতী', 'চটুলনয়না', 'কল্যাণী' ও 'অসিত নয়না'। এর মধ্যে 'চটুলনয়না' ও 'অসিতনয়না'কে আভরণমাত্র মনে হ'তে পারে, কিন্তু অন্য চারটি যক্ষের আবেগস্পন্দনে বিশেষ অর্থ পেয়েছে। এই ধরনের ব্যবহার এখানে আমার আলোচনার লক্ষ্য নয়, আমি সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রকৃতি বিষয়ে মন্তব্য করছি। আধুনিক ভাষা এক-একটি শব্দের প্রতিশব্দ বা প্রতিদ্বন্দ্বী সরিয়ে দিয়ে-দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দের শক্তির সম্ভাবনা বাড়িয়েছে; আধুনিক কবির কাছে শব্দগুলো নিরপেক্ষ ও বর্ণহীন বস্তু, বা শূন্য ও ঈষদচ্ছ ছোটো-ছোটো আধার, যাকে তিনি ভ'রে তুলবেন, তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারে, তাঁরই দত্ত ভিন্ন-ভিন্ন বিশেষ অর্থে, বিশেষ ব্যঞ্জনায়। শব্দ নিজেই তার নিজের বিষয়ে কোনো খবর দেবে, তা তিনি চান না; তিনি চান শব্দ হবে উপায়, কিন্তু বার্তা তাঁর নিজের। 'মেঘে'র বদলে 'জলদ' বা 'অম্বুবাহ' লিখলে, তাঁর মতে কবিতার বেগটাকে শ্লথ ক'রে দেয়া হয়, কেননা মেঘের যে-সজলতা তাঁর রচনারই মধ্যে মূর্ত হবার কথা, ঐ শব্দ সেটাকে আগেই ফাঁশ ক'রে দিচ্ছে। 'জলে'র নামান্তররূপে 'বারি', 'নীর', 'অম্বু' প্রভৃতি গ্রহণ ক'রে তিনি প্রত্যক্ষতার ক্ষতি করতে চান না; তিনি চান সব সময় শুধু 'জল'ই লিখবেন, আর তারই মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলবেন অভিজ্ঞতার ভিন্ন-ভিন্ন স্তর — প্রলয়ের কল্লোল থেকে অশ্রুবিন্দু পর্যন্ত বাদ যাবে না। এক-একটি শব্দ থেকে কত বেশি কাজ আদায় ক'রে নেয়া যায়, অধুনিক কবির দৃষ্টি সেই দিকে; আর সংস্কৃত কবির চেষ্টা যাতে প্রতিটি শব্দই স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হয়। আধুনিক কবিতায় সব শব্দের মূল্য সমান নয়, মাঝে-মাঝে কোনো-কোনোটি চাবির মতো কাজ করে, রহস্যের দরজা তাতে খুলে যায়, হঠাৎ তার আঘাতে চারদিক আলো হ'য়ে ওঠে, চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ে সারা কবিতায়। 'অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি পড়ে মনের মাটিতে' — এই প্রথম পঙক্তিতে পুরো কবিতার মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে: 'মনের মাটি', তার মানে এটা শুধু আষাঢ়ে বর্ষার বর্ণনা নয়, এ-বর্ষা আমাদের মনেরও, আমাদের মনের সৃষ্টিপ্রেরণার ও কবির কবিতার অনুপ্রেরণার একটি চিত্রকল্প এটি; 'মরুময় দীর্ঘ তিয়াষা'য় সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার কথাই বলা হ'লো এবং শেষের দিকে 'সৃজনের অন্ধকার' ও 'রচিত বৃষ্টি' ও সেই তৃষ্ণারই তৃপ্তির আভাস দিচ্ছে। সংস্কৃতে এ-ধরনের শব্দব্যবহার সম্ভব নয়, কেননা প্রতিটি শব্দ নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং নিজ গুণে

সম্ভোগ্য, তাদের মধ্যে পারম্পরিক অনুরণন বা অনুরঞ্জন নেই। সেইজন্য সংস্কৃত কবিতা কোনো বিস্ফোরকের মতো পাঠকের মনের মধ্যে ফেটে পড়ে না; কবিরা বহুবিধ ইঙ্গিতে-বলার কৌশল জানেন; কিন্তু একই সঙ্গে অভিজ্ঞতার একাধিক স্তর প্রকাশ করেন না।

ব্যাকরণের আর-একটি নিয়মের উল্লেখ করবো, যাকে আমরা বাধা ব'লে অনুভব করি, সেটি এই যে সংস্কৃত বাক্যগঠনে কর্তার ও সমাপিকা ক্রিয়ার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। শুধু একটি কর্তা ও একটি ক্রিয়াপদ নিয়ে, সমাসবদ্ধ বিশেষণের সাহায্যে, সুদীর্ঘ বাক্যরচনা তাতে সম্ভব; কর্তা ও কর্মের মধ্যে মস্ত বড়ো ছেদ থাকলেও এসে যায় না, পাঠক বিভক্তির দ্বারা চিনে নেবেন। ঔপনিষদিক কাব্যে সরল উক্তিরই প্রাধান্য দেখতে পাই, পুরাণ-সাহিত্যের রচনারীতিও অত্যন্ত বেশি জটিল নয়, কিন্তু ক্লাসিকাল যুগের কবিরা প্রকরণশিল্পের ঋদ্ধি ঘটাতে গিয়ে ঋজুতাগুণ হারিয়ে ফেললেন। ধরা যাক 'মেঘদূতে'র প্রথম শ্লোক: তার আসল কথাটা হ'লো, 'কশ্চিৎ যক্ষঃ বসতিং চক্রে'—'এক যক্ষ বাস করলে'—বাকিটা যক্ষের ও তার বাসস্থানের বিশেষণ। শ্লোকটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়:

> এক স্বকর্মে-অমনোযোগী যক্ষ, প্রভুর [দত্ত] প্রিয়াবিরহ-[হেতু]-দুঃসহ একবর্ষভোগ্য শাপের-দ্বারা-বিগতমহিমা [হ'য়ে], সীতার-স্নানহেতু-পবিত্র, স্নিগ্ধচ্ছায়াতরু-[ময়] রামগিরি-আশ্রমে বাস করলে।

একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে মূলের একটি চরণও এই বার্তার কোনো-একটি অংশকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে না; শ্লোকটির শেষ পর্যন্ত না-পৌঁছলে ধারণা হবে না, ব্যাপারটা কী। লেখক যখন কালিদাস, তখন ধ্বনি-মাধুর্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ধীরে ও সাবধানে শ্লোকের অন্বয় ক'রে তবে আমরা বুঝতে পারি কথাটা কী বলা হ'লো। অর্থাৎ, কবিতা ও পাঠকের মধ্যে একটি বুদ্ধির ব্যবধান নিত্য উপস্থিত, পড়ামাত্র কোনো অভিঘাত হবার উপায় নেই—এবং আমরা যাকে পঙক্তি বলি, তাও প্রায় অস্তিত্বহীন;—সংস্কৃত রচনাশিল্পের পরাকাষ্ঠা যে-'মেঘদূত' কাব্য তার কোনো-একটি চরণে একটি সম্পূর্ণ বাক্য পেতে হ'লে আমাদের অনেক অনুসন্ধান করতে হবে। 'আমাকে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন'—এটা সংস্কৃতে অনায়াসে লেখা হ'তে পারে:—'নাটোরের দিয়েছিলো দু-দণ্ড আমাকে শান্তি সেন বনলতা'—উপরন্তু কথাটা একাধিক পদে বিশ্লিষ্ট হবারও বাধা নেই;

'দিয়েছিলো' প্রথম পদে স্থাপিত হ'য়ে, 'আমাকে' চ'লে আসতে পারে চতুর্থে। অর্থাৎ, সংস্কৃত কবিতার চলন ঠিক ক'রে দেয় পুরো স্তবক বা শ্লোক, আর আধুনিক কবিতা পদের বা পঙক্তির চালে চলে। দুয়ের মূলমাত্রা বা unit স্বতন্ত্র। এই প্রভেদ দুস্তর।

৩

আমি মনে-মনে যে কথাটা ভাবছি এবারে তা বলা যেতে পারে : সংস্কৃত কবিতা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম, আদর্শ ও তত্ত্বের দিক থেকে তা-ই, অভ্যাসের দিক থেকেও তা-ই। সন্দেহ নেই, শিল্পমাত্রই রচিত, এবং সেই অর্থে কৃত্রিম, কিন্তু আধুনিক কবিতা অন্ততপক্ষে স্বাভাবিকের অভিনয় করে, আর সংস্কৃত কবিতা সগর্বে কৃত্রিমতাকে অঙ্গীকার ক'রে নেয়।

কোনো কবিতা যে-ভাষায় লেখা হচ্ছে সেই ভাষার চরিত্র তাকে বহুদূর পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যায়, আর সংস্কৃত ভাষা তার পূর্ণ পরিণতির দিনে হ'য়ে উঠলো সর্বতোভাবে কৃত্রিমতার পরিপোষক। ব্যাকরণিক সূক্ষ্মতার ফলে তাতে সহজ কথাও জটিল ক'রে বলা যায়; শব্দের বিনিময়ধর্মিতা ও সন্ধি-সমাসের কৌশল একই উক্তিতে অন্বয়ভেদ সম্ভব ক'রে তোলে। এই ভাষা শ্বেতাঙ্গ ককেশীয়গণ ভারতে নিয়ে আসেন; ভারতের প্রাগার্য সভ্যতা — আধুনিক পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন — অনেক বিষয়ে বেশি উন্নত ছিলো, তবু যে সারা দেশ জুড়ে নবাগতদের ধর্ম ও সংস্কৃতির জয় হ'লো তার একটি প্রধান কারণ এই ভাষার তর্কাতীত শ্রেষ্ঠতা। তবু এ-বিষয়ে সন্দেহ ঘোচে না যে সংস্কৃতের প্রধান কাব্যসমূহ যে-সময়ে লেখা হয়, সে-সময়ে সংস্কৃত সত্যিকার অর্থে কথিত ছিলো কিনা : অন্তত মেয়েরা, শিশুরা ও প্রাকৃতজনেরা যে তাতে কথা বলতো না, তার প্রমাণ নাট্যসাহিত্যেই পাওয়া যাচ্ছে। এবং যে-ভাষায় শিশুর মুখে বোল ফোটে না, স্বামী-স্ত্রীর প্রেমালাপ বা কলহ চলে না, যাতে ঘরকন্না বেচাকেনা ইত্যাদি নিত্যকার কাজ সম্পন্ন হবার উপায় নেই, সে-ভাষায় কেমন ক'রে কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছে তা ভেবে আজকের দিনে আমরা বিস্মিত হ'তে পারি। আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে তা সম্ভব হ'তে পারে শুধু একটি শর্তে : কবিতাকে 'জীবন' বা 'স্বাভাবিক' থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে নেয়া হবে; তাতে অপণ্ডিতের অধিকার থাকবে না; বর্জিত

হবে প্রত্যক্ষতা ও স্বতঃস্ফূর্তি ; হার্দ্য আবেদনের বদলে প্রাধান্য পাবে কৌশল, নৈপুণ্য, বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতর সাহিত্য এই অর্থে কৃত্রিম নয়, বরং তার বিপরীত প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত ; ভাষা সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত ও কবিতার উৎস মানুষের সমগ্র সত্তা — শুধু বুদ্ধি ও দক্ষতা নয়। কটোপনিষদের যম-নচিকেতা-সংবাদটি তার কাব্যগত প্রভাবের জন্য কোনো ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে না ; গীতায় বিশ্বরূপদর্শনের অধ্যায় প'ড়ে গায়ে কাঁটা দেবে না শুধু সেই ব্যক্তির, যে কবিতার ডাকে সাড়া দিতে স্বভাবতই অক্ষম। কবিতার সঙ্গে পাঠকের এই যে অব্যবহিত সম্বন্ধ, এরই কথা ভেবে এলিয়ট গীতাকে বলেছেন 'পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাব্য' — শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে তার কাব্যরস-সম্ভোগের জন্য তার ধর্মীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী হ'তে হয় না*। গীতায় ভাষাব্যবহার প্রত্যক্ষ, মহাভারতের আখ্যান-ভাগেও সাধারণত তা-ই ; যাকে পারিভাষিক অর্থে কাব্য বলা হয় তার শ্রেষ্ঠ রচয়িতা যেমন কালিদাস, তেমনি নিঃসংশয়ে তার উৎপত্তিস্থল — মহাভারত নয়, রামায়ণ। তত্রাচ, বাল্মীকি ও কালিদাসের মধ্যে পার্থক্যও স্পষ্ট ; বাল্মীকি অলংকারপ্রিয় হ'লেও ঋজুকথনে অভ্যস্ত, প্রতিটি চরণকে শিল্পিত ক'রে তোলার দিকে তাঁর আগ্রহ নেই। অযোধ্যাকাণ্ডে গঙ্গার বা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ঋতুর বর্ণনায় আমরা যেন সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই ; আর 'কুমারসম্ভবে' অকালবসন্ত বা 'রঘুবংশে' সমুদ্র-চিত্র যেন রঙ্গমঞ্চের পটের মতো বহু যত্নে সাজানো হয়েছে — আমরা তার দর্শক হ'লেও অংশভাগী হ'তে পারি না।

বাল্মীকি-পরবর্তী কাব্যসাহিত্য, আমরা দেখছি, ক্রমশই স্বাভাবিক থেকে দূরে স'রে আসছে, তাতে প্রধান হ'য়ে উঠছে সজ্জা, প্রসাধন, প্রকরণ-বিদ্যা। এই আদর্শের অবনতির দিনে সম্পূর্ণ অকবির পক্ষেও 'কাব্য' রচনা সম্ভব হয়েছে ; কেউ যমকের সাহায্যে একই রচনার মধ্যে রামায়ণ ও

* 'The *Bhagavad-Gita* is the second greatest philosophical poem in my experience—' এলিয়টের মতে প্রথমটি অবশ্য 'দি ডিভাইন কমেডি'। স্মর্তব্য, সাহিত্যিক কারণে যাঁরা বাইবেল পড়েন বা তার প্রশংসা করেন, এলিয়ট তাঁদের পক্ষপাতী নন, কিন্তু ঐশ্বরিক মহিমা থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে গীতাকে তিনি কাব্য হিশেবেই দেখেছেন ব'লে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পারি। এ-কথা বললে অল্প মাত্র অত্যুক্তি হয় যে সংস্কৃত সাহিত্যের মহত্তম মুহূর্তগুলি সে-সব গ্রন্থেই বিধৃত আছে, যারা ধর্মশাস্ত্র নামে আখ্যাত।

মহাভারতের গল্প সংশ্লিষ্ট করেছেন, কেউ বা কোনো অক্ষর বর্জন ক'রে কসরৎ দেখিয়েছেন, কেউ বা রচনা করেছেন ব্যাকরণের নিয়মাবলির ছন্দোবদ্ধ উদাহরণ। এবং যাঁকে সংস্কৃত ভাষার শেষ ভালো কবি বলা যায়, সেই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' তার অনুপ্রাস ও আদিরসের একঘেয়েমিতে আজকের দিনে অচিরেই আমাদের ক্লান্ত করে।

শিলার বলেছিলেন কবিরা দুই জাতের : 'নাঈভ' ও 'সেন্টিমেন্টল', সরল ও ভাবপ্রবণ ; হয় তাঁরা নিজেরাই প্রকৃতি, নয় তাঁদের আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির জন্য। গ্যেটে এই শব্দ দুটিকে 'ক্লাসিক' ও 'রোমান্টিক'-এর নামান্তররূপে চিহ্নিত ক'রে দেন : একদিকে তাঁরা, যাঁরা আপন মানবিক ও নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে নিবিষ্ট ও দ্বন্দ্বহীন ; অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীর দল, আধুনিক অর্থে ব্যক্তি, যাঁদের কবি-সত্তা ও সামাজিক সত্তায় প্রতিকারহীন বিরোধ ঘটেছে। আধুনিক কালের সব কবিকেই দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুর্ত করা যায় ; যাঁরা নামত 'ক্লাসিসিস্ট' (যেমন ইংরেজি ভাষায় এলিয়ট বা বাংলাদেশে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) তাঁরাও এই বিচ্ছেদের মধ্যে গৃহীত, এবং সেই অর্থে রোমান্টিক। যে-কবিরা বেদ- ও উপনিষৎ-সমূহ এবং মহাভারত ও রামায়ণ রচনা করেছিলেন, তাঁরা মাত্রাভেদ নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত 'নাঈভ', কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যাকে সংস্কৃত সাহিত্যের 'ক্লাসিকাল' যুগ ব'লে থাকেন, তার অন্তর্ভুর্ত কবিরা প্রকৃতির মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়েছেন অথচ সত্যিকার ব্যক্তিগত উক্তির জন্যও প্রস্তুত হননি। আমাদের কাছে তাঁদের ক্লাসিসিজ্‌ম-এর অর্থ — প্রথার স্বীকরণ, নিয়মের দার্ঢ্য, বুদ্ধিগত শৃঙ্খলা, পরবর্তী কালে যার পতন ঘটলো নেহাৎ গতানুগত্যে। জয়দেবের স্বভাব ছিলো রোমান্টিকের, কিন্তু তাঁর কাব্যে এমন বিশেষণ বা উৎপ্রেক্ষা বিরল যাকে কবিপ্রসিদ্ধির সন্দেহ থেকে আমরা মুক্তি দিতে পারি। এমনকি, ক্ষুদ্রাকার সুভাষিতাবলি — যেখানে আমরা হার্দ্য উচ্চারণ আশা করতে পারতাম — তাদেরও মধ্যে অধিকাংশ কৃত্রিম, নির্মিত ও পারম্পরিক পুনরুক্তির জন্য ক্লান্তিকর। কবি স্বাধীনভাবে তাঁর একান্ত নিজের গলায় কথা বলছেন — যা রোমান্টিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ — তার উদাহরণ (ধর্মগ্রন্থের বাইরে) সারা সংস্কৃত সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য।* 'যঃ কৌমার্যহরঃ' ব'লে যে-বিখ্যাত

* যদি না অমরু ও ভর্তৃহরির কতিপয় সুনির্বাচিত শ্লোক ব্যতিক্রম হিশেবে বিবেচ্য হয়। — পঞ্চম সংস্করণের টী।

কবিতার আরম্ভ, সেটি বিরলতার গুণেই বিখ্যাত ও আদৃত হয়েছে। তার লেখকের মতো খাপছাড়া মহিলা-কবি আছেন পালি ভাষায় থেরী অম্বপালী, হয়তো সংস্কৃতেও আরো দু-একজন, কিন্তু সাধারণভাবে এ-কথাই সত্য যে আমরা যাকে লিরিক বলি (আর প্রকৃতপক্ষে 'সেন্টিমেন্টল' বা ভাবপ্রবণ কবিতা লিরিক ভিন্ন হ'তে পারে না), তার প্রকাশ, সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুলতার তুলনায়, অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল।

এটা কেন হ'লো যে রসতত্ত্বের সংস্কৃত নাম অলংকারশাস্ত্র? 'অলম্' কথাটার অর্থ যথেষ্ট; 'অলংকার' মানে যথেষ্টীকরণ, যার দ্বারা কোনো জিনিশ যথেষ্ট হ'য়ে ওঠে। যা অলংকৃত নয় তা পর্যাপ্ত নয় (বা প্রকাশ্য নয়), এই মৌল ধারণা নিয়ে সংস্কৃত কাব্যবিচারের আরম্ভ। এই কাজে যাঁরা হাত দেন তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন কবিতা কী-কী উপায়ে 'যথেষ্ট' হ'য়ে ওঠে; অর্থাৎ, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো প্রকরণের বিশ্লেষণ। অলংকারের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ করেছেন তাঁরা; বহু তর্ক করেছেন যা আমাদের কানে অনেক সময় ব্যাকরণ বা আইনঘটিত কেশচ্ছেদের মতো শোনায়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি যা-কিছু উপায় কবিরা ব্যবহার করেন, আমরা সেগুলোকে অলংকার ব'লে ভাবি না, কিংবা এ-কথাও ভাবি না যে তাদের অভাব মানেই কবিতার মৃত্যু। আমরা জেনেছি, এই তথাকথিত অলংকারসমূহ বর্জন ক'রেও কবিতা হ'তে পারে রসোত্তীর্ণ, এবং ভালো কবিতায় যখনই এদের ব্যবহার হয় তখনই এরা 'অলংকার' মাত্র থাকে না, অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে ওঠে। কবিতাকে আমরা একটি অখণ্ড সত্তা ব'লে ধারণা করি; তার যেটি আদর্শ রূপ তাতে এমন-কিছুরই স্থান নেই যা তার হ'য়ে-ওঠার পক্ষেই প্রয়োজন ছিলো না, শুধু শোভাবৃদ্ধির জন্য যোগ করা হয়েছে। শোভিত বা শোভমান হওয়া কবিতার কাজ, এ-কথাও আমাদের কাছে অগ্রাহ্য।

ভারতের গরীয়ান ভাস্কর্যশালায় মিথুনমূর্তি অনেক আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ নগ্নমূর্তি—জৈন তীর্থংকরের ঋজুকঠিন ধ্যানী বিগ্রহ ছাড়া—একটিও দেখা যায় না। নগ্ন ব'লে যাদের মনে হয় তাদের নিম্নাঙ্গে থাকে বসনের আভাস, আর থাকে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে বহু প্রথাসিদ্ধ, মর্যাদাবান অলংকার। বলা বাহুল্য, এর কারণ দেহ বিষয়ে কোনো কুণ্ঠা নয়—ভারতীয় চিত্ত বিষয়ে আর যে-কথাই বলা যাক, তাকে কেউ কখনো শুচিবায়ুগ্রস্ত বলবে না—এর

পিছনেও এই ধারণা কাজ করছে যে ভূষণহীন সৌন্দর্য অসম্ভব। কিন্তু কোনারকের অপ্সরা বা অজন্তার মারকন্যার সঙ্গে তুলনীয় যে-সব মূর্তি বা ছবি য়োরোপীয় মহাদেশে রচিত হয়েছে, তারা সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও নিরাবরণ। গ্রীক শিল্প চেয়েছে বিশুদ্ধ দেহকে সুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে, কিন্তু পরবর্তীরা সুন্দরী নারীর প্রতিকৃতি আর আঁকেননি, সুন্দরকেই মূর্ত ক'রে তুলেছেন। বতিচেল্লির ভেনাসকে কোনো সুন্দরী নারী আর বলা যাবে না, কেননা ছবিটা নিজেই সুন্দর হ'য়ে উঠলো। এই শুদ্ধ নগ্নতার মধ্যে সৌন্দর্য তার স্বারাজ্য লাভ করলো, উচ্চারিত হ'লো শিল্পকলার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

সকলেই জানেন, এই ছবির জন্মক্ষণেই য়োরোপীয় চিত্তের নবজন্ম ঘটে, যার প্রভাব আজ পর্যন্ত সারা জগতে কোনো-না-কোনো ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। ভারতের নিজভূমিতে কোনো রেনেসাঁস ঘটেনি, কিন্তু ঘটলে যা হ'তে পারতো আমাদের ধ্যান-ধারণা আজকাল বহুলাংশে তা-ই; হয়তো সেটাই মূল কারণ, যেজন্যে সংস্কৃত কাব্যাদর্শের সম্মুখীন হ'লে আমরা অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করি। একটা ছোটো দৃষ্টান্ত নিলে আমার কথাটা পরিষ্কার হ'তে পারে। সংস্কৃত 'শিল্প' বা 'কলা', আর য়োরোপীয় 'আর্ট' — এই শব্দ দুটির যাত্রাস্থল একই: দুয়েরই আদি অর্থ 'ক্রাফট', কারিগরি বিদ্যা, যে-কোনো প্রকার রচনাকর্মে এবং প্রধানত হাতের কাজে দক্ষতা। 'কলার' সংখ্যা যে চৌষট্টি হ'তে পারে এ-কথা শুনেই আমরা বুঝি এর অর্থ কত ব্যাপক এবং আমাদের পক্ষে অবান্তর। ঐ তালিকা যাঁরা রচনা করেন তাঁদের কাছে ভাস্কর্য আর মাল্যরচনায় প্রভেদ ছিলো ব্যবহারগত, কিংবা হয়তো শ্রমের পরিমাণে — জাতের কোনো তফাৎ ছিলো না। যে-মহাশিল্পীরা এলিফ্যাণ্টা বা এলুরার গুহামূর্তি গড়েছিলেন তাঁরা, আমাদের অর্থে, নিজেদের 'শিল্পী' ব'লে ভাবতেই পারতেন না। তেমনি মধ্যযুগের য়োরোপেও চিত্রকরের সচেতন লক্ষ্য ছিলো — কোনো 'শিল্পকর্মে'র সৃষ্টি নয়, মন্দিরের প্রয়োজনমতো যীশু-জীবনীর দৃশ্যরচনা, যাতে ভক্তের আত্মনিবেদনের লক্ষ্যটি চোখের সামনে মূর্ত হ'য়ে থাকে। কিন্তু রেনেসাঁসের পরে 'আর্ট'-এর অর্থ একই সঙ্গে সংকুচিত ও বহুগুণে বর্ধিত হ'লো এবং তা-ই থেকে অন্য সব পরিবর্তন ঘটেছে। আর্ট: তা বিচ্ছিন্ন হ'লো মানুষের ব্যবহারিক জীবন থেকে, দেবার্চনায় সেবাদাসী হ'য়ে আর রইলো না, সিংহাসনের চামরধারিণীও নয়, সগর্বে বলতে পারলো — 'আমি কোনো কাজে লাগি না। আমি আছি।' আর্ট: তার মানে মুক্তি,

শুদ্ধতা, এক ভূষণহীন স্বদীপ্ত নগ্নতা, যার সামনে এসে জগৎবাসীরা বলতে বাধ্য হয় — 'তোমার কাছে আর-কিছু চাই না, তুমি যে আছো, হ'তে পেরেছো, তারই জন্য তুমি মূল্যবান।'

আধুনিক য়োরোপীয় চিত্তে কৃত্রিমের দিকে উন্মুখতা দেখা যায়নি তা নয়, কিন্তু তার অর্থ একেবারেই আলাদা। বোদলেয়ার-এর একটি কবিতা আছে, যার নাম 'অলংকার', বিষয় এক বিবসনা ও সালংকারা নারী। এই কবিতা পড়ার পরে সংস্কৃত কবিতার অলংকার বিষয়ে নতুন ক'রে ভাবতে হয়েছে আমাকে, কিন্তু দুই ধারণার মধ্যে কোনো সাদৃশ্যের কল্পনা থেকে নিজেকে সাবধানে বিরত করেছি। য়োরোপের যে-কবিরা, সদ্য-আগত যন্ত্রযুগে, সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ বিষয়ে প্রথম সুতীব্রভাবে সচেতন হন, তাঁদের মধ্যে প্রধান পুরুষ বোদলেয়ার; তাঁর কবিতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেলো আর্টের আধুনিক ধারণা, রূপায়িত হ'লো প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সেই দ্বন্দ্ব, শিলার যার তত্ত্বের দিক প্রকাশ করেছিলেন। আর তাই বোদলেয়ার-এর কবিতা কৃত্রিমের বন্দনায় মুখর; ভূষণের ধাতু ও রত্নদাম, বসনের রেশম ও সাটিন, সুরা, সুগন্ধ, আর স্বপ্নে-দেখা সেই প্যারিস, যেখানে সব উদ্ভিদ লুপ্ত হয়েছে, কোথাও আর তরুপল্লব নেই, চারিদিকে ছড়িয়ে আছে শুধু ধাতু, পাথর ও প্রদীপ্ত রত্নমণির কারুকার্য, জল পর্যন্ত তরলিত সোনা, আর কালোর মধ্যেও বহু বর্ণ বিচ্ছুরিত — এই সব চিত্রকল্পের সাহায্যে সবলে প্রত্যাখ্যাত হ'লো প্রকৃতি, ঘোষিত হ'লো প্রতিভার পীড়া, নিঃসঙ্গতা ও মহিমা। বোদলেয়ারের শৌখিনতা — dandyism — তাতেও আছে এমন এক জগতের আলেখ্য, যা সম্পূর্ণরূপে রচিত, স্ব-তন্ত্র ও অ-স্বাভাবিক: নারী সেখানে ঘৃণ্য, কেননা মূর্তিমতী প্রকৃতির নামই নারী, আর ঘৃণ্য সমাজসংস্কারক, যেহেতু তিনি ঘনিষ্ঠভাবে 'জীবনে'র সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এই 'জীবনে' (বা সমাজে) কবির আর স্থান নেই; একা সে, উদ্বাস্তু, স্থিতিহীন; এখন সে সার্থক হ'তে পারে শুধু নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরভাবে প্রতিভার শক্তিকে দাঁড় করিয়ে। তাই বোদলেয়ার বেশ্যা, জুয়াড়ি, ভিখিরি প্রভৃতি অন্ত্যজদের মধ্যে কবির প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন, আর তাঁর সমকালীন ও অব্যবহিত পরবর্তী ফরাশি চিত্রকলায় সার্কাসের শস্তা নটনটী যে প্রিয় হ'য়ে উঠলো, তাও এইজন্যে। সামাজিক জীবনে, শিল্পী কি তাদেরই ভাগ্যের অংশিদার নয়?

এর সঙ্গে সংস্কৃত কবিদের অবস্থার অবশ্য কিছুই সাদৃশ্য নেই। তাঁদের

পরিবেশের মধ্যে গৃহীত ছিলেন তাঁরা — শুধু গৃহীত নন, সম্মানিত। অনেকেই রাজার অনুগ্রহ পেয়েছেন, আর পেয়েছেন প্রচুর অবসর, সাংসারিক নিশ্চিতি। দশম শতকের আলংকারিক রাজশেখর কবির দৈনন্দিন জীবনের যে-বিবরণ রেখে গেছেন, তার সঙ্গে আরো অনেক পুরোনো 'কামসূত্রে' বর্ণিত নাগর বা নাগরিকের জীবন অনেক বিষয়ে মিলে যায়।

'কবি ছ-ঘণ্টা ঘুমোন, ভোরবেলা ওঠেন, প্রাতঃকৃত্য ও আহ্নিকাদি সেরে তিন ঘণ্টা পড়েন, আরো তিন ঘণ্টা লেখেন বা পূর্বদিনের রচনা সংশোধন করেন, অপরাহ্নে সাহিত্যিক বন্ধুদের সহযোগে স্বীয় রচনার সমালোচনায় লিপ্ত হন, তারপর আবার বসেন পরিশোধন করতে।' সারত তাঁর দিনগুলি রচনা, অধ্যয়ন ও সাহিত্যিক আলোচনায় পূর্ণ হ'য়ে থাকে, এবং তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে থাকেন 'রাজকন্যা, বারাঙ্গনা, এবং রাজপুরুষ ও নাগরদের বনিতাগণ।' শেষোক্ত ব্যক্তিরা — রাজশেখর জানাতে ভোলেননি — অনেক সময় বিদুষী হতেন, কবিতাও লিখতেন। আর কবিদের সম্মেলনের আয়োজন করা রাজকৃত্যের অন্যতম ছিলো। আমরা অনুমান করতে পারি, এই সমাজস্বীকৃত মসৃণ জীবন বহু শতক ধ'রে একই 'মন্দাক্রান্তা তালে' প্রবাহিত হয়েছে, কেননা ভারতে যদিও যুদ্ধ ও রাজ্য-বদল বহুবার ঘটেছে, সেই সব আন্দোলন সুদৃঢ় ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজের গঠনকে স্পর্শ করতে পারেনি; অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যুগ-যুগ ধ'রে হুবহু এক থেকে গেছে। বাৎস্যায়নের সঙ্গে রাজশেখরের কালের ব্যবধান দীর্ঘ, অথচ দু-জনে একই রকম আরাম ও নিশ্চিতির কথা লিখেছেন।

মনিয়র-উইলিয়মস 'কবি' শব্দের যে-সব অর্থ দিয়েছেন তার মধ্যে 'প্রাজ্ঞ' থেকে 'চতুর' ও 'ঋষি' থেকে 'মনীষী' পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সব স্তরই পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, এর ভাগ্য 'শিল্পী' শব্দের উল্টো। 'শিল্পে'র আরম্ভ কারুকর্মের নিম্নভূমিতে; আমরা আজকের দিনে তাকে 'art'-এর পদবিতে উন্নীত করেছি, যদিও এখনো সে 'craft'-এর সংসর্গ ছাড়তে পারেনি, এমনকি আর্টের জাতশত্রু 'industry'-র মহলেও সে মাঝে-মাঝে মুজরো খাটে। আর 'কবি'র যাত্রাস্থল ঋষিপদ, সেই উচ্চাসন থেকে তার পতন হ'লো যখন তার অর্থ দাঁড়ালো 'কবিতার লেখক'। কিংবা এটাকে পতন না-ব'লে পরিবর্তনও বলা যায়; কবির আদিপিতা যে পুরোহিত এ-কথা পৃথিবী ভ'রেই সত্য; সংস্কৃতে যাজ্ঞিক পুরোহিতের নামান্তর ছিলো 'কব্য', এতে সম্বন্ধটি আরো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

অন্ততপক্ষে কবিতা লেখা 'হাতের কাজ' নয় ; আর এই কর্মের উপায় যখন সংস্কৃত ভাষা, তখন তাতে প্রকর্ষ-লাভের জন্য শুধু সাধারণ অর্থে শিক্ষিত হ'লে চলে না, রীতিমতো পণ্ডিত হ'তে হয়। এবং সে-যুগে পণ্ডিত হবার মতো অবস্থা সাধারণত শুধু তাঁদেরই ছিলো যাঁদের জাতিগত পেশা পৌরোহিত্য। যে-সব ব্রাহ্মণ চিত্র- বা মূর্তিরচনার কাজ নিতেন তাঁদের যাজনকর্মে আর অধিকার থাকতো না, বিশেষজ্ঞরা এই রকম ব'লে থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যাঁরা কবিতা লিখেছেন — আর, অন্তত খ্যাতনামাদের মধ্যে অব্রাহ্মণ কেউ ছিলেন ব'লে ভাবা যায় না * — তাঁদের কাউকে কখনো ব্রাত্য হ'তে হয়েছে এমন কথা কোনো ঐতিহাসিক বলেননি। বরং, কাব্য ও কাব্যের আলোচনা থেকে, এর উল্টোটাকেই সত্য ব'লে ধ'রে নিতে পারি। স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতের উন্নত, দর্পিত ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণসমাজ যুগ-যুগ ধ'রে বংশপরম্পরা যে-সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন করেচেন, তারই অন্তরঙ্গ ছিলেন সংস্কৃত ভাষার প্রধান কবিরা — কাব্যের প্রকরণের দিকে থেকে, বৌদ্ধ অশ্বঘোষকেও এর ব্যতিক্রম বলা যায় না। শুধু যে তাঁরা সমাজ থেকে চ্যুত হননি তা নয়, সুপ্রতিষ্ঠ সম্মানের আসন পেয়েছেন। এই অবস্থার মধ্যে কবিতা যদি কৃত্রিমতার পথ নেয়, তাহ'লে তার বিকাশ হ'তে পারে শুধু এক ধনবান, সুখী ও ভঙ্গিপ্রধান শোভনশিল্পে — যাকে য়োরোপীয় ভাষায় বলে ডেকরেটিভ।

'ক-বোতল টানিলে মদ রঘুবংশম্ যায় গো লেখা?' অধ্যাপক বিনয়কুমার

* অধ্যাপক ডেনিয়েল ইঙ্গল্‌স-এর মতে কালিদাস ছিলেন অব্রাহ্মণ, তাঁর নামের 'দাস' অংশটুকু নাকি তাঁর শূদ্রত্ব প্রমাণ করে (*An Anthology of Sanskrit Court Poetry :* **Daniel H. H. Ingalls, Harvard University Press,** ১৯৬৫, পৃ ৬ টী)। এই অসাধারণ উক্তির সমর্থনে লেখক অন্য কোনো যুক্তি দেননি ; তাই এর যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দিহান না-হ'য়ে উপায় নেই। ভারতবর্ষীয় প্রবচন অনুসারে কালিদাস ব্রাহ্মণবংশে জ'ন্মে শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন, এক গোপের গৃহে প্রতিপালিত হ'যে অমার্জিত মূর্খ অবস্থায় দৈবাৎ বিবাহ করেন এক রাজকন্যাকে, পরে কালীর বরে মেধা ও বিদ্যা লাভ ক'রে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 'কালিদাস' নাম গ্রহণ করেন। এই কাহিনীও, লিখিত সাহিত্যে স্থান পেয়ে থাকলেও স্পষ্টতই অনৈতিহাসিক ; কালিদাসের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে কোনো সঠিক তথ্য কখনো জানা যাবে এমন আশা না-করাই ভালো। তবে তাঁর জাতিগোত্র নিয়ে আমাদের চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই, কেননা তাঁর রচনা প'ড়েই বোঝা যায় তিনি মানসতায় ও শিক্ষাদীক্ষায় ছিলেন খাঁটি ব্রাহ্মণ ; এবং তুলনীয় শিক্ষার্জন সেকালে কোনো নিম্নবর্ণ হিন্দুর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিলো ব'লে তাঁকে ব্রাহ্মণ ব'লে ধ'রে নেয়াই সংগত। — চতুর্থ সংস্করণের টী (পরিবর্ধিত)।

সরকারের এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না, তবে প্রশ্নটিকে সংগত ব'লে মানতে পারি। সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণ সরিয়ে দিলে যা বাকি থাকে, সেই অভিজাত, বিধিবদ্ধ ও পরিশীলিত কাব্যসাহিত্যে কোথায় সেই প্রেরণার স্থান, যাকে মানুষ চিরকাল প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ ব'লে মেনেছে, একমাত্র যার প্রভাবে ভাষা হ'য়ে ওঠে দৈববাণী, সার্থক হয় বিদ্যা, প্রযত্ন, পরিশ্রম? এর উত্তর লোককল্পনা অব্যর্থভাবে দিয়ে গেছে — শাস্ত্র লিখে নয়, প্রবচন রচনা ক'রে। হোমার যেমন অন্ধ, তেমনি বাল্মীকিও পূর্বজীবনে দস্যু ছিলেন; এমনকি কালিদাস, যাঁর ছত্রে-ছত্রে আত্মচেতনা ও উত্তরাধিকার-বোধ পরিকীর্ণ, সেই বিদগ্ধ উত্তরসূরিকেও বরপ্রাপ্ত জড়বুদ্ধি ব'লে রটনা করা হ'লো। কবিপ্রতিভার গভীরতম অন্তর্দেশ এই প্রবাদসমূহের লক্ষ্য। কবি — তিনি কখনো অবিকল সামাজিক বা স্বভাবী মানুষ হ'তে পারেন না — তাঁকে হ'তে হবে কোনো-না-কোনো দিক থেকে অভাবগ্রস্ত, যে-অভাবের ক্ষতিপূরণ করে 'দৈব' অথবা অবচেতনের ক্ষমতা। এই কথাটা আধুনিক মানুষের, আর এই কথাই চিরকালীন।

তবু ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এমন অধ্যায় দেখা যায়, যখন কোনো আলোকপ্রাপ্ত রাজার বা কোনো স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থার প্রভাবে, কবির সঙ্গে তাঁর পরিবেশের সামঞ্জস্য ঘটে, তিনি তাঁর শাশ্বত অশান্তি ভুলে যান, রাজসভার পার্শ্ববর্তী একটি বিদগ্ধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত হ'য়ে রচনার দ্বারা সেই গোষ্ঠীরই প্রীতিসাধন করেন। সংস্কৃতে যাকে কাব্য বলে, সন্দেহ নেই, তার প্রধান অংশ এমনি একটি অধ্যায়ের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিলো। তাই তার অলংকারবিলাস এমন অক্লান্ত, তার প্রসাধন-সাধনা তৃপ্তিহীন। কবিরা বিষয়ের চেয়ে ভঙ্গির প্রতি অধিক মনোযোগী, যে-ভঙ্গিকে নির্দিষ্ট ও নিয়মাবদ্ধ ক'রে তোলাই সমগ্র 'অলংকার' শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ফলত, যাকে ব্যক্তিগত বা প্রত্যক্ষ বলা যায়, সংস্কৃত কবিতায় তার সম্ভাবনা ছিলো ন্যূনতম। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কৃত্রিমতার সঙ্গে বোদলেয়ার-এর ব্যবধান বিরাট; দুয়ের মধ্যে যুগান্তর ছড়িয়ে আছে। বোদলেয়ার কৃত্রিমের বন্দনা করেছিলেন স্বাভাবিক ভাষায়, অর্থাৎ তাঁর যেটা স্টাইল সেটা তাঁরই ব্যক্তিগত সৃষ্টি, কোনো সামাজিক ও সাধারণ ভঙ্গি নয়, যে-আবেগে তাঁর কবিতা সংরক্ত সেটাও সম্প্রদায়গত নয়, তাঁরই নিজস্ব। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত কবিরা কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতির স্তব করেছেন; স্বাভাবিককেই ভালো

ব'লে জানতেন তাঁরা (‘শকুন্তলা’র বিখ্যাত চতুর্থ অঙ্ক স্মর্তব্য), অথচ ভূষণহীন স্বাভাবিকে তাঁদের সভাসদ-রুচির তৃপ্তি ছিলো না। নববধূ সালংকারা না-হ'লে ‘যথেষ্ট’ হয় না, এ-কথাটা বিবাহসভায় মানা যেতে পারে, কিন্তু দম্পতির মিলনের কালে সেই ভূষণদাম যে আবর্জনামাত্র, তা মানুষ চিরকাল ধ'রে জেনেছে, যদিও ভারতসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিদের আগে কেউ মুখ ফুটে বলেননি। একই রকম নিবিড় ও সম্পূর্ণ মিলন কবিতার সঙ্গেও আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু সংস্কৃত কবিতায় অলংকারের ব্যবধান ঘোচে না।

কবিতা কোন গুণে ভালো হয়? বা কবিতা হয়? ‘নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি’ — এটা ছেলেবেলায় আমাদের শেখানো হয়েছিলো, ‘রসাত্মক বাক্যে’র উদাহরণ। কেউ বলেননি যে এটা রাংতার মতোই চকচকে ও তুচ্ছ; শুকনো গাছকে ‘তরুবর’ বলা যায় না, তার প্রসঙ্গে কোনো ‘আভা’র উল্লেখ হাস্যকর। তথ্যের সঙ্গে ভাষার এখানে শোচনীয় বিসংগতি ঘটেছে। কিন্তু ‘শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে’ — এর শব্দযোজনায় ও অনুপ্রাসে তথ্যটির যথাযথ ছবি পাওয়া যায়: ‘কাষ্ঠ’ শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছে গাছটা কতদূর মৃত, নেহাৎ গদ্যভাবাপন্ন ‘তিষ্ঠতি’ ক্রিয়াপদেও রুক্ষতা প্রতিফলিত। এটা কবিতা কিনা জানি না, কিন্তু এর সফলতার প্রমাণ এই যে ‘শুষ্কং-কাষ্ঠং’ আমাদের জীবিত ভাষার অংশ হ'য়ে গেছে। রুচি দূষিত না-হ'লে এই বাক্য নিন্দনীয়ের দৃষ্টান্ত হ'তে পারতো না।

বাংলাদেশের ঘুম-পাড়ানি ছড়ার একাধিক পাঠ প্রচলিত আছে। যিনি লিখেছিলেন —

> ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি যেয়ো,
> বাটা ভ'রে পান দেবো গাল পুরে খেয়ো —

তাঁর ছিলো র‍্যাশনাল বা ন্যায়সম্মত মন, নিদ্রাদেবীকে তিনি ধারণা করেছেন একজন মাননীয়া প্রতিবেশিনী-রূপে, যাঁকে পান খাইয়ে খুশি করলে শিশুর নিদ্রারূপ বরলাভ সম্ভব হবে। এই কার্য-কারণ সম্বন্ধস্থাপনেই বোঝা যায় যে এর রচয়িত্রী সুগৃহিণী ও সুমাতা, কিন্তু কবি নন, বড়োজোর পদ্যকার। কিন্তু —

> ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো,
> খাট নেই, পালঙ্ক নেই, চোখ পেতে বোসো —

এই পদ্যে সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় নেই, কিন্তু কবিত্ব আছে। 'চোখ পেতে বোসো' — মাসিপিসি-নাম্নী অতিথির কাছে এ-রকম একটা অসম্ভব প্রস্তাব তিনি করতে পারতেন না, যদি-না তাঁর কল্পনার সাহস থাকতো। এই সেই যুক্তিহীনতা, যার সংক্রামে ভাষা হ'য়ে ওঠে ভাবনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা, কবিতা মুক্তি পায়। কিন্তু কোনো সংস্কৃত কবি কোনো মাতৃম্বসাকে শিশুর চোখের মতো অপরিসর ও বিপজ্জনক স্থানে বসতে বলতেন কিনা, আমি সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দিহান।

আজকের দিনে সকলেই স্বীকার করেন যে ভাষা দুই ভাবে কাজ করে: একদিকে সে খবর দেয়, অন্যদিকে সে জাগিয়ে তোলে। তথ্য বা জ্ঞানের জগতে আমরা চাই স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন ভাষা, যার আয়তন তার সংবাদের সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাবে। কিন্তু কবিতার ভাষায় আমরা খুঁজি প্রভাব, যা তার ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট 'অর্থ'কে অতিক্রম ক'রে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে, যার বেগে আমাদের মনের অনেক স্বপ্ন, স্মৃতি, চিন্তা ও অনুষঙ্গের যেন ঘুম ভেঙে যায়, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি, অনবরত প্রহৃত হ'তে থাকে। অলংকারশাস্ত্রে — বিশেষত 'ধ্বনি'বাদে — তুলনীয় পরিভাষা'র অভাব নেই; কিন্তু যাঁরা বলেন, কবিতায় ভাষা কী-ভাবে কাজ করে সে-বিষয়ে আধুনিক ধারণার পূর্বাভাস সেখানে পাওয়া যায়, তাঁদের কথায় আমার মন কোনো-মতেই সায় দেয় না। তত্ত্বের দিক থেকে ধ্বনিবাদীরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৈয়ায়িক অভ্যাস কাটাতে পারেননি। পারেননি, তার কারণ তাঁদের সামনে উপযোগী উদাহরণ ছিলো না, রোমান্টিক মানস বৈষ্ণব কবিদের আগে জন্ম নেয়নি, সমগ্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এক আচারনিষ্ঠ, অনুষ্ঠানধর্মী, জাতিভেদবিভক্ত কঠিন কৌলীন্যের দুর্গে বাস করেছে। আমরা তাই অবাক হ'তে পারি না, যখন বামন বলেন — 'কাব্যং গ্রাহ্যং অলংকারাৎ' বা 'সৌন্দর্যং অলংকারম্' — আমরা শুধু দুঃখিত হ'তে পারি।

ভামহ, যিনি ঐতিহাসিকের পরিচিত প্রথম আলংকারিক, তিনি স্বভাবোক্তিকে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন এই ব'লে যে তা শুধু খবর দিতে পারে, আর-কিছু পারে না। তাঁর মতে বক্রোক্তি ও অতিশয়োক্তি নিয়েই কবিতার বাণিজ্য। ব্যঙ্গ্যার্থ বিষয়েও বলা হয়েছে যে হয় সেটি কবিতার একমাত্র অর্থ হবে, নয়তো বাচ্যার্থের চেয়ে তার উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। আবার, ব্যঙ্গ্যার্থ থেকেও 'ধ্বনি' বা রসের ব্যঞ্জনাকে আলাদা করা হ'লো।

এই শেষোক্ত মতই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণযোগ্য, কিন্তু 'ধ্বনি'র বিখ্যাত উদাহরণ 'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী' — এতে আমরা দেখতে পাই, মহৎ কবিতাব নমুনা নয়, এক চারু ও সুকুমার বক্রোক্তি, যা তার ছন্দোবদ্ধতার গুণে উদ্ধৃতিযোগ্য হয়েছে। তেমনি, আমরা যখন ভামহ বা বামনের বিরোধী পক্ষের মত শুনতে পাই যে অলংকার থাকলেই কবিতা হয় না আর তা না-থাকলেও কবিতা হ'তে পারে, তখন এই তত্ত্বে আমরা উৎসাহ বোধ করি, কিন্তু দৃষ্টান্ত দেখলে নিরাশ না-হ'য়ে পারি না। 'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে...' 'কুমারসম্ভবে'র এই বিখ্যাত শ্লোকটিকে আমরা নিশ্চয়ই হৃদয়গ্রাহী বা মনোরম বলবো, কিন্তু তার বেশি বলবো না; এটি স্বভাবোক্তি হ'তে পারে, কিন্তু এর অভিপ্রায় বর্ণনামাত্র, যার আড়ালে অন্য কিছু নেই, আর যার চিহ্নসমূহ বর্ণিত বিষয়েরই তথ্য থেকে সংগৃহীত। 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র একটি গান

শুনি ক্ষণে-ক্ষণে মনে-মনে
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না', রয় না, রয় না ঘরে,
চঞ্চল প্রাণ॥

এরও বিষয় বসন্ত, বা যৌবন, বা কামোন্মাদনা, কিন্তু এতে 'বর্ণনা' নেই: বসন্ত, যৌবন বা তার সম্পৃক্ত কোনো তথ্য উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু যৌবনের বেগ অনেক বেশি তীব্রতার সঙ্গে সঞ্চালিত হয়েছে। এখানে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা যে-ভাবে পাওয়া যাচ্ছে, ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির ব্যাখ্যাতাদের তা ধারণার মধ্যে ছিলো না।

আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ প্রচুর, কিন্তু তাঁদের প্রশংসিত শ্লোক-সমূহে আমরা দেখতে পাই হয় কোনো অলংকার নয় ব্যঙ্গ্যার্থ, নয় কোনো বর্ণনার বিস্তার। এদিকে আধুনিক কালে এমন অনেক পঙক্তি বা কবিতা আমরা জেনেছি, যা নিতান্তই নিরলংকার, সরল একটি স্বভাবোক্তি মাত্র, এবং যেখানে বাচ্যার্থই অনন্য, পরম ও মহাশক্তিমান। এর অনেক উদাহরণ মনে পড়ছে, কিন্তু আমি আপাতত বৈদেশিক উদ্ধৃতি থেকে বিরত হলাম।

ফুল বলে ধন্য আমি মাটির 'পরে।

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে!

তোরা কেউ পারবি নে গো / পারবি নে ফুল ফোটাতে।

তিনটি পঙক্তিতেই ফুলের উল্লেখ আছে, 'ফুল' থেকে অন্য কোনো আভিধানিক অর্থ কিছুতেই বের করা যাবে না, তার সরল অর্থ বাতিল হচ্ছে না কোনোখানেই, অথচ এক পঙক্তি থেকে অন্যটিতে পৌঁছনোমাত্র আমরা অনুভব করি যে শব্দটির ইঙ্গিত বদলে-বদলে যাচ্ছে : কখনো তাতে মরত্বের ভাব পাচ্ছি, কখনো ব্যর্থতার, কখনো বা সৌন্দর্যের। অর্থাৎ, কবিতার এই আধুনিক নমুনায় কোনো ব্যঙ্গ্যার্থ বা অলংকার নেই, কিন্তু আছে একটি দূরস্পর্শী ও বিস্তীর্যমাণ প্রভাব। এই ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ, যাকে বিভিন্ন পাঠক (বা একই পাঠক বিভিন্ন সময়ে) ভিন্ন-ভিন্ন ভাবনায় রঞ্জিত ক'রে দেখবেন, কবিতার কাছে এটাই আমাদের প্রধান প্রার্থনা। সম্ভবত অলংকারবাদীরা এদের মধ্যেও কোনো-না-কোনো 'অলংকার' আবিষ্কার করতেন (সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম সংজ্ঞার্থরচনার ক্ষমতা তাঁদের অসীম ছিলো), কিন্তু যে-তত্ত্ব অলংকার-হীন কবিতার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তা 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' বিষয়ে নিঃসাড় ও নীরব থাকতে বাধ্য। আর সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে এই কৃশ, নগ্ন ও একান্ত বাণীর তুলনা কোথায়?

তত্ত্বের পরিচয় তার প্রয়োগে। রবীন্দ্রনাথের 'ফুল' বা 'পথ' বা 'প্রদীপ' — আমরা এদের বলতে পারি চিত্রকল্প (বা হয়তো প্রতীক), এবং এই দুই আধুনিক পরিভাষার সঙ্গে কোনো-কোনো অলংকারসূত্রের সাদৃশ্য অনুমান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যবহারগত পরীক্ষা করলেই নির্ভুলভাবে প্রভেদ ধরা পড়ে। 'চিত্রকল্প' ও 'প্রতীকে'র ব্যাখ্যা যা-ই হোক না, কার্যত তাদের এক দিকে থাকে চিত্ররচনা আর অন্য দিকে এক গভীর রহস্য যাতে জাল ফেলে আমরা তুলে আনতে পারি হয়তো শূন্যতা, হয়তো এক মুঠো শামুক, হয়তো কখনো মুক্তো বা আশ্চর্য উদ্ভিদ, আর কখনো যার স্তরে-স্তরে ডুবে গিয়ে বহু রত্ন উদ্ধার ক'রে আনি। কিন্তু রহস্য — বা যে-কোনো প্রকার অস্পষ্টতা — সংস্কৃত কবিতার ধর্মবিরোধী ; তার 'লক্ষণা' ও ব্যঙ্গ্যার্থেও নিশ্চয়তা চাই। একই শ্লোকের একাধিক অর্থ আদৃত হ'তো, কিন্তু এই গুণের উদাহরণস্বরূপ অনেক সময় যা উদ্ধৃত হয়েছে তা শুধু কথা নিয়ে খেলা, যমক বা শ্লেষের চাতুর্য।

প্রসন্নাঃ কান্তিহারিণ্যো নানাশ্লেষবিচক্ষণাঃ। ভবন্তি কস্যচিৎ পুণ্যৈর্মুখে বাচো গৃহে স্ত্রিয়ঃ ॥

মুখে বাক্ ও গৃহে স্ত্রী কোন শর্তে পুণ্যমণ্ডিত হয়, একই শ্লোকের মধ্যে তা বলা হচ্ছে। 'প্রসন্ন' : 'যার অর্থ নির্মল' অথবা 'যার মেজাজ ভালো' ;

'কান্তিহারিণী' : 'মধুর রসমণ্ডিত' বা 'যার কণ্ঠহার মনোহর' : 'নানাশ্লেষ-বিচক্ষণ' : নানা শ্লেষ (pun) বা আশ্লেষে (আলিঙ্গনে) নিপুণ। প্রত্যেকটি বিশেষণে দুটি ক'রে অর্থ পোরা আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টি বের করামাত্র সমস্তটাই ফুরিয়ে গেলো — তার বেশি আর-কিছু নেই।

আমি জানি, অনামা লেখকের এই রচনা সংস্কৃত কবিতার প্রতিভূ নয় : যদি ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই কবিতার নাম দাবি করতে পারে তাহ'লেও এটি জাতে ছোটো থেকে যাবে, এবং আলংকারিকদের মধ্যেও অন্তত ধ্বনিবাদীরা এর নিকৃষ্টতা স্বীকার করতেন। যদি এটি সংস্কৃত সাহিত্যে আকস্মিক হ'তো তাহ'লে এটি উল্লেখ্য হ'তো না। কিন্তু এর সধর্মী রচনা সুভাষিতাবলিতে অপর্যাপ্ত এবং মহাকবিরাও শব্দব্যসনের মোহ থেকে মুক্ত নন। এর বীজ লক্ষ করা যায় এমনকি বাল্মীকিতেই, যাঁকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রকৃতির দুলাল, যাঁর বর্ণনার স্বাভাবিকতার উল্লেখ আমি পূর্বে করেছিলাম। কিন্তু আমার প্রশংসিত সেই শরৎবর্ণনারই একটি শ্লোকে আমরা ভঙ্গির প্রাধান্য দেখি :

চঞ্চচন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা। অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতু স্বয়মম্বরম্॥

এখানেও এক ঢিলে দুই পাখি মরেছে — 'চন্দ্রকর' : চাঁদের কিরণ বা হাত ; 'তারকা' : আকাশের বা চোখের তারা ; 'রাগবতী' : অস্তরাগবতী বা অনুরাগবতী ; 'অম্বর' : আকাশ বা বসন। 'সন্ধ্যা, চাঁদের আলোয় হৃষ্ট হ'য়ে তারা ফুটিয়ে তুলেছে, এখন সে নিজেই আকাশ ছেড়ে চ'লে যাক' — এই সরল অর্থের সংলগ্ন হ'য়ে আছে নায়িকারূপিণী সন্ধ্যার ছবি, চাঁদের হস্তস্পর্শে যার চোখ পুলকে উন্মীল, এবং এখন যে নিজেই বসন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এই যুগ্মচিত্রের রমণীয়তা আমরা মানতে বাধ্য, তবু এই সুখ ক্ষণকাল পরেই ভেঙে যায়, যখন দেখি দুয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই, তাদের জুড়ে দেয়া হয়েছে শুধু যান্ত্রিক কৌশলে, একটি অপরটিকে কিছু দান করছে না, দুই অপরিচিতের মতো দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এই ধরনের শ্লোক রচনা না-করলে বাল্মীকির কোনো ক্ষতি ছিলো না, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা, তার সন্ধি সমাস প্রতিশব্দ নিয়ে, এই দিকে বিরাট ফাঁদ পেতে রেখেছে।

তবু, বাল্মীকি নিজে অন্তত জানতেন না যে 'রাগবতী সন্ধ্যা'য় তিনি 'সমাসোক্তি অলংকার' ব্যবহার করেছেন, আর 'বাচ্যার্থ' ও 'ব্যঙ্গ্যার্থে'রও তিনি নাম শোনেননি ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। কিন্তু একই কথা কালিদাস

বিষয়ে বলা যায় কি? তিনি যে ভামহর পূর্ববর্তী এ-বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত; কোনো লুপ্ত, প্রাচীনতর অলংকারশাস্ত্র তাঁর কালে চলিত ছিলো কিনা, সে-বিষয়ে জল্পনা ক'রে লাভ নেই। কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলী আমাদের আছে, আর আছে এই সাধারণ জ্ঞান যে ব্যাকরণ যেমন ভাষার, তেমনি কবিতার অনুগামী রসতত্ত্ব। উদাহরণ জ'মে না-উঠলে ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন ঘটে না। এ-কথাও সত্য যে দ্বাদশ শতকের মল্লিনাথ কালিদাসের কাব্যে যত বিচিত্র অলংকার খুঁজে পেয়েছেন তার অনেকগুলোই আমাদের মনে হয় কবিতার সাধারণ ভাষা, যা তার প্রকাশের পক্ষেই প্রয়োজন। কিন্তু তবু কালিদাসের উপর 'আকাদেমিকতা'র সন্দেহপাত অনিবার্য; তাঁর রচনা পড়ামাত্র বোঝা যায় যে বাল্মীকির তুলনায়, এমনকি অশ্বঘোষের তুলনায় তিনি অনেক বেশি আত্মসচেতন, বিদগ্ধ, এবং কলাকৌশলী। 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মল্লিনাথ যত অভিধান ও শাস্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, তার সবই কালিদাসের পরবর্তী ব'লে ধ'রে নেবার কারণ নেই; যদি তার কিয়দংশের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘ'টে থাকে, তাহ'লে তাঁকে আলংকারিকের ভাষায় 'শাস্ত্রকবি' ব'লে মানতে হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ দু-মুখো; যেমন আলংকারিকেরা সম্ভবত তাঁরই কাব্য থেকে তাঁদের কোনো-কোনো ধারণা আহরণ করেছিলেন, তেমনি তিনিও মাঝে-মাঝে শ্লোক লিখেছিলেন কোনো নীতি বা কামশাস্ত্রের আক্ষরিক অনুসরণে।

হ'তে পারে, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস এখনো নিশ্চিত নয়, কিন্তু নিশ্চিত হ'লেও আমি শুধু কালক্রমের উপর নির্ভর ক'রে কিছু বলতে চাই না। রচনার মধ্যে যা পাওয়া যায়, আমার আলোচনার পক্ষে তারই সাক্ষ্য জরুরি। অলংকার বিষয়ে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন উক্তি পাশাপাশি চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, কবিতা বিষয়ে আধুনিক ধারণা কত ভিন্ন। মনস্তত্ত্বের হিশেবে, কবিতা ও বনিতাকে আমরা সংযুক্তভাবে দেখতে পারি; বললে ভুল হয় না যে প্রথমটির বিষয়ে কবির যা আদর্শ, তা-ই দ্বিতীয়টিতে প্রতিফলিত হ'য়ে থাকে। এখন কালিদাস সর্বান্তঃকরণে অলংকারে বিশ্বাসী; তাঁর কাব্যের মেয়েরা দেখতে কেমন তা তিনি জানাতেও পারেন নাও জানাতে পারেন, কিন্তু বসনভূষণের উল্লেখ করতে কখনো ভোলেন না। 'মেঘদূতে' যক্ষনারীদের তিনি যে পুষ্পাভরণে সাজিয়েছেন সেটাও তাঁর উচ্চতর বৈদগ্ধ্যেরই প্রমাণ দেয়। অলকায় সোনা ও মণিরত্নের প্রাচুর্য এত বিপুল যে তার মেয়েদের

মোহিনী ক'রে দেখাতে হ'লে ফুলের গহনাই পরানো দরকার — যে-সব ফুল, ছয় ঋতুর সংকলন ব'লে, আমরা কখনো একসঙ্গে দেখবো না।

> হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
> নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
> চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
> সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

এই শ্লোক শ্রুতিমোহন ও দৃষ্টিনন্দন, এবং সেই কারণেই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এতে যা বলা আছে তা সবই প্রত্যাশিত ও সম্ভবপর, বিস্ময়ের আঘাত নেই এতে, নেই মূর্ত ও অমূর্তের মধ্যে কোনো সম্বন্ধস্থাপন, যার ফলে কবিতা শুধু অধিকৃত হবার বিষয় থাকে না আর, আবিষ্কৃত হবার দাবি জানায়।

> তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে
> কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।
> কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা,
> কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
> সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর —
> চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে।

এই পর্যন্ত কালিদাস লিখতে পারতেন, যোগ করতে পারতেন আরো কয়েকটি ললিত উপকরণ, কিন্তু তাঁর রচনায় সেখানেই সমাপ্তি ঘটতো, যা দৃশ্য ও স্পৃশ্য বস্তু নয় তার দ্বারা সখীকে সাজাবার কল্পনা কখনোই তাঁর মনে আসতো না। 'সখীরে সাজাব সখার প্রেমে / অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে' — এই সব কথা, যা না-থাকলে বাংলায় এটিকে কবিতা ব'লেই ভাবতাম না আমরা, কালিদাসে তার আভাসমাত্র নেই। 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী / হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্' — এই অতিশয়োক্তিতে যা পাওয়া গেলো তা নাগরযোগ্য চাটুকারিতা মাত্র, কিন্তু সত্যিকার প্রেমিকের স্বর আমরা শুনতে পেলাম, যখন, আদিরসের মরচে-পড়া মুখস্থ-করা বুলির মধ্যে, কৃষ্ণ হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'ত্বমসি মম ভূষণম্'।

> ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ —

সারা 'গীতগোবিন্দে' এই একবারই ভাষা হ'য়ে উঠলো কবিতার দ্বারা আক্রান্ত — আক্রান্ত, উন্নত ও রূপান্তরিত, যেন এক ঝাপটে চ'লে গেলো যুক্তিনির্ভর কার্পণ্য ছাড়িয়ে মুক্তির দিকে। 'তুমিই আমার ভূষণ' — এই একটি কথাই ব'লে দিচ্ছে যে জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন: ভারতীয়

সাহিত্যে প্রাচীনের অন্তরাগ তিনি, এবং আধুনিকের পূর্বরাগ। কবিতা যখন সংস্কৃতের বিধিবদ্ধতা থেকে একবার বেরোতে পারলো, তখনই তার মধ্যে জেগে উঠলো অপূর্বতা ও আবিষ্কারধর্ম. মানুষের প্রত্যাশার যা অতীত, জাগতিক সম্ভাবনার যা বহির্ভূত, সেই অনির্বচনীয়কে বাঁধতে গিয়ে ভাষা সব লজ্জা ভয় ত্যাগ করলো।

আমার অঙ্গের কঁচুলি কৃষ্ণকরাঙ্গুলি, করের ভূষণ সেবা,
আর কটির অলংকার কৃষ্ণচন্দ্রহার, সে-ভূষা বুঝিবে কেবা?

কে বুঝবে?' কালিদাস নিশ্চয়ই বুঝতেন না, তিনি এটাকে দেখতেন তাঁর চেনা কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বর্বরের যুদ্ধঘোষণা, সভ্যতার অবক্ষয়ের লক্ষণ। মেঘদূতে'র যক্ষ ভুলতে পারে না, আর বার-বার আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যে তার বিরহিণী প্রিয়া সব ভূষণ ত্যাগ করেছে, এত বড়ো দুঃখের মধ্যেও এ-কষ্ট তার কম নয়। কিন্তু মেঘ যেন ভুল না বোঝে, যদিও বিরহদশায় তার পত্নী এখন 'অনুরূপা'. স্বভাবত সে অতিরূপবতী, 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' ইত্যাদি। এই শ্লোক অঙ্গে-অঙ্গে যে-তিলোত্তমাকে রচনা করেছে, আমরা সেই প্রতিমাকে দূর থেকে মুগ্ধ হ'য়ে দেখি, কিন্তু —

সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো —
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো
তোমার হাসির তুলনা।

এটি পড়ামাত্র, একই মুহূর্তে এবং বিনা চেষ্টায়, নায়িকার মায়াময় রূপ ও বক্তার বিরহবেদনা আমাদের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, আমরা হ'য়ে উঠি কবির অভিজ্ঞতার অংশভাগী, তাঁর সঙ্গে একীভূত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনার বদলে এখানে যা আছে তাকে বলতে পারি ভাবনা — সব বস্তু ও তথ্যের আড়ালে নিত্য যা বিরাজমান, যার সংক্রাম থেকে মানুষের মন জড় প্রকৃতিকেও মুক্তি দেয় না। কবিতা যখন এখানে পৌঁছয় কবি তখনই বলতে পারেন — না-ব'লে তখন উপায় থাকে না — 'আমার এ-গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার'।

৪

এক খণ্ড, বিধিবদ্ধ জগৎ; পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল, প্রচলনির্ভর; ভঙ্গিপ্রধান ও বর্ণনাপ্রধান; সাবধানী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন; সদাশয়ী, সতর্ক, সৌষম্যযুক্ত;

আচারনিষ্ঠ ও প্রতিমাপূজক; অমত্ত, শিষ্টভাষী, সামাজিক ও আমাদের পক্ষে সুদূর; বিস্তারধর্মী, অলংকারমণ্ডিত, শোভমান; কল্লোলিত, প্রোজ্জ্বল ও নিস্তাপ — এমনি আমাদের মনে হ'তে পারে সংস্কৃত কবিতাকে, তার মধ্যে প্রথম যখন প্রবেশের চেষ্টা করি। কবিতার আত্মা বলতে আমরা যা বুঝি, যা যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরোধী; বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ফল ব'লেই বুদ্ধির অতীত, যাকে আর তৌল করা যায় না শুধু ধ্যান করা যায়, সেই গুণটি খুঁজে পাই না যেন তার মধ্যে; যা-কিছু তার দেবার আছে সবই আক্ষরিক, ব্যাকরণিক, নির্ভুল; বোধগম্য ও বিশ্লেষণযোগ্য। তার প্রসাধন দেখে চোখ ঝলসে যায়, কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হই আমরা, শ্রদ্ধা করি তার বিদ্যাবত্তাকে, আর সারাক্ষণ মনে-মনে বলি, 'ভালো — সবই ভালো, কিন্তু কবিতা কোথায়?' ঐ নিস্বনিত পদাবলির মধ্যে 'কবিতা'কে আবিষ্কার করতে সময় লাগে আমাদের, বহু চেষ্টার প্রয়োজন হয়। এবং সে-আবিষ্কার স্বল্পতম শ্রমে যে-কবির মধ্যে সম্ভবপর হয়, তাঁরই নাম কালিদাস; যে-কাব্যে, তা 'মেঘদূত'। কালিদাস সেই কবি, যিনি প্রমাণ করেছেন হাজার বিধিবিধান মেনে নিয়েও প্রতিভা তার সত্য স্বর শোনাতে পারে; একটি পরম কৃত্রিম আদর্শের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও কবিতা কত ভালো হ'তে পারে, তার নিদর্শন 'মেঘদূতে'র মতো বিশ্বাস্যভাবে অন্য কোনো সংস্কৃত কাব্য দিতে পারে না। আজকের দিনের সাধারণ শিক্ষিত পাঠক, ন্যূনতম ব্যাকরণ জেনে, পাণ্ডিত্য বিষয়ে অনাতঙ্কিত অবস্থায়, যে-একমাত্র সংস্কৃত কাব্য আদ্যন্ত উপভোগ করতে পারেন সেটি 'মেঘদূত'। ব্যাকরণের চাতুরী তাতে নেই তা নয়, প্রচুর আছে (প্রথম শ্লোকের দুঃসাধ্য অন্বয় প্রণিধানযোগ্য), কিন্তু কাব্যগুণ আরো বেশি ব'লে এই বাধায় পাঠকের উৎসাহ এলিয়ে পড়ে না। 'মেঘদূতে'র মস্ত একটি গুণ এই যে তা আকারে ছোটো — অন্তত সংস্কৃত কাব্যের হিশেবে তা-ই — সেটি এক বৈঠকে প'ড়ে ওঠা অসম্ভব নয়, এবং এই ব্যস্ততার যুগেও বার-বার পাঠ করাও সম্ভব। হয়তো এই আপেক্ষিক হ্রস্বতাও একটি কারণ, যে-জন্যে কালিদাসের রচনার মধ্যে শুধু 'মেঘদূত'ই সর্বাঙ্গীণভাবে অনবদ্য — এবং সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যেই গঠনশিল্পে তুলনাহীন।

তাঁর বিষয়ে কিছু প্রায় জানি না আমরা। আধুনিক কোনো-কোনো পণ্ডিত দেখাতে চেয়েছেন তাঁর জীবৎকাল খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক, কিন্তু এ-যাবৎ আমরা যা জেনেছি তারই সপক্ষে প্রমাণ এখনো প্রচুরতর ব'লে মনে

হয়। সন্দেহ করা যায় না, হিন্দু সভ্যতার কোনো উজ্জ্বলতম মুহূর্তে তিনি বেঁচে ছিলেন ও লিখেছিলেন, এবং ভারত-ইতিহাসের কোন যুগ গুপ্ত যুগের চেয়ে উজ্জ্বলতর? সেই কাল, যখন ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব ও তজ্জনিত বৈদেশিক সংস্রবের অবসান হয়নি, অথচ হিন্দুধর্মের সগৌরব পুনরুত্থান ঘটেছে, কালিদাসের ছত্রে-ছত্রে তারই বিশেষ আবহটিকে আমরা অনুভব করতে পারি। অশ্বঘোষ উপমাস্থলে হিন্দু দেবদেবীর নাম করেননি তা নয়, কিন্তু কালিদাস, অত্যন্ত বেশি উল্লেখপ্রিয় হ'য়েও, কখনোই কোনো বৌদ্ধ প্রসঙ্গকে স্থান দেননি, এর মধ্যে তাঁর সচেতন অভিপ্রায় দেখলে আমরা হয়তো ভুল করবো না। বুদ্ধপরবর্তী খ্রিষ্টপূর্ব কালে জন্মালে বুদ্ধকে তিনি কি এমনভাবে এড়াতে পারতেন, না এড়াতে চাইতেন? শিবভক্ত তিনি, যে-কোনো সূত্রে শিবের প্রসঙ্গে উপনীত হ'তে সচেষ্ট, আর সেখানে পৌঁছনোমাত্র তাঁর উৎসাহ দীপ্ত হ'য়ে ওঠে; ছন্দোবদ্ধ স্মরণীয় বাণীতে যেন মহাদেবের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করতে চান। 'মেঘদূতে' তিনি বহু দৃশ্যের বর্ণনা লিখেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে সপ্রেম ও সবিস্তার বর্ণনা আছে উজ্জয়িনী ও অলকার; এবং 'মেঘদূতে'র যে-সব শ্লোক আমরা তৃপ্তিহীনভাবে আবৃত্তি ক'রে থাকি, তার অনেকগুলো ঐ দুই অংশের মধ্যেই পাওয়া যাবে। দুই স্থলেরই অধিপতি মহাদেব; অলকার উদ্যান তাঁর ললাটজ্যোৎস্নায় প্রক্ষালিত, আর উজ্জয়িনীর মন্দিরে তিনি অরণ্যের মতো বাহু তুলে নৃত্য করেন। লক্ষণীয়, অলকা এক কাল্পনিক দেবনিবাস, আর উজ্জয়িনী এক সমকালীন বাস্তব নগর; অথচ দুয়ের সমৃদ্ধি প্রায় একই রকম মনে হয়, তাদের মধ্যে তথ্যগত সাদৃশ্যও ধরা পড়ে। উভয় স্থলই সুন্দরী নারীতে সমাকীর্ণ; উজ্জয়িনীতে তামসী রাত্রে তারা অভিসারে বেরোয়, আর অলকায় সূর্য উঠলে অভিসারিকাদের গতিবেগচ্যুত ভূষণাদি পথে-পথে দেখতে পাওয়া যায়। স্পষ্টত, উজ্জয়িনীর আদর্শেই কালিদাস তাঁর 'স্বর্গ'টিকে রচনা করেছিলেন। আর উজ্জয়িনীর প্রতি এই বিপুল প্রীতি তাঁর হ'তে পারতো না, যদি না, অতি অনুকূল অবস্থায়, রাজার পৃষ্ঠপোষিত হ'য়ে, তিনি কোনো সময়ে সেই নগরে বাস করতেন। উজ্জয়িনীকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য উপাধিও তিনি নিয়েছিলেন, আর তাঁর কালে যে চীন থেকে রোম পর্যন্ত ভারতের পার্থিব ও মানসবাণিজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছিলো, সে-বিষয়েও ঐতিহাসিকেরা নিঃসংশয়। অতএব, যাঁরা বলেন

কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন, অর্থাৎ খ্রিষ্টপরবর্তী পঞ্চম শতকের প্রথমাংশের অধিবাসী, তাঁদের কথা অবিশ্বাস করার কোনো সংগত কারণ পাওয়া যায় না। তাঁর রচনা থেকে দুটি বিষয় নিশ্চিতভাবে জানতে পারি : কাশ্মীর থেকে দক্ষিণসাগর পর্যন্ত ভারতভূমিকে তিনি জানতেন — হয় নিজে ভ্রমণ ক'রে, নয় পর্যটকদের কাহিনী শুনে ; তাঁর ভূগোলে বা উদ্ভিদবিদ্যায় ভুল নেই, এবং প্রবাদমূলক অলীকের অংশ যা আছে তা বহু পরবর্তী য়োরোপায় মার্কো পোলোর তুলনায় অকিঞ্চিৎকর — মোটের উপর, সমগ্র ভারতের একটি অখণ্ড ও বাস্তব সত্তাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এবং তাঁর কাল ছিলো ঐশ্বর্যে ও সম্ভোগে দ্যুতিময়, ইন্দ্রিয়বিলাসে ভরপুর, ছিলো বিজয়ী, শক্তিশালী, রাষ্ট্র ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রমিতিসম্পন্ন। আরো : ভারত তখনও জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েনি, তৎকালীন সমগ্র সভ্য জগতের জীবন্ত ও প্রধান একটি অংশ ছিলো, আর তিনিও নিজেকে অনুভব করেছিলেন এক বৃহৎ, বিচিত্র ও চঞ্চল বিশ্বের অধিবাসী ব'লে। সেই কাল, যখন ভারতের চিত্তের শক্তি নানা দিকে পূর্ণতেজে সক্রিয়, তার মধ্যেও অবক্ষয়ের কোনো বীজাণু প্রচ্ছন্ন ছিলো কিনা, যার পরিণাম তিনি 'রঘুবংশে'র শেষ সর্গে বর্ণনা করেছেন, এই প্রশ্ন আমি উত্থাপন মাত্র করতে পারি, উত্তর দেবার চেষ্টা আমার সাধ্যাতীত।

কালিদাসের মধ্যে ঐতিহ্যবোধ প্রবল : কোনো কোনো আধুনিক কবি নিজেকে যেমন নূতন ও অপূর্ব ব'লে ধারণা করেন ('না জানি কেন রে এত দিন পরে / জাগিয়া উঠিল প্রাণ' ; 'কেউ যাহা জানে নাই, কোনো এক বাণী — / আমি ব'হে আনি') ; তেমনি, এই রোমান্টিক মানসের বিপরীত মেরুতে, তিনি নিজেকে জানেন এক দীর্ঘ কবিবংশের উত্তরাধিকারী ব'লে, আর তাঁর রচনার মধ্যে দেখতে পান যবনিকার প্রথম উত্তোলন নয় — মহত্তর পূর্বাঙ্কসমূহের বিনয়বদ্ধ অনুগমন। 'রঘুবংশে'র সূচনায় এই কথাটা খুব স্পষ্ট ক'রে বলা আছে। যে-সব পূর্বসূরিদের তিনি সেখানে নমস্কার জানিয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই নামসুদ্ধ লুপ্ত হ'য়ে গেছে, আর কারো-কারো নামমাত্র কালস্রোতে ভাসমান ; তাঁর নিকটতর উত্তমর্ণ কারা ছিলেন, এই অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের উত্তরে ঐতিহাসিকের বেশি কিছু বলার নেই। মনিয়র-উইলিয়মস লিখেছেন, পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃতে গ্রন্থসংখ্যা বিপুলতম ; কিন্তু এও নিশ্চিত যে বহু গ্রন্থ লুপ্ত

হ’য়ে গেছে, নয়তো কালিদাসের পূর্বে অশ্বঘোষ ও ভাস ছাড়া আর-কোনো প্রধান কাব্য-রচয়িতার অস্তিত্ব নেই কেন? ঋগ্বেদ ও কালিদাসের মধ্যে ব্যবধান দু-হাজার বছরের; এমন হ’তেই পারে না যে এই দীর্ঘ কাল — যাতে অন্যান্য বেদ, উপনিষৎসমূহ, মনুসংহিতা, মহাভারত, রামায়ণ ও বিবিধ শাস্ত্র ও পুরাণগ্রন্থ উদ্‌গত হয়েছিলো — তার মধ্যে বহু কবির বহু কাব্যও রচিত হয়নি, যে-সব কাব্য কালিদাসের বিদ্যালয়ের কাজ করেছে, এবং যে-সব কবিকে স্মরণ ক’রে তিনি ‘রঘুবংশে’র বিখ্যাত শ্লোকটি রচনা করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন মাত্রই দু-তিন জন। আমাদের জানা গ্রন্থের মধ্যে কালিদাসের ‘উৎস’ বলা যায় বাৎস্যায়নের ‘কামসূত্র’কে*, ‘কুমারসম্ভব’ ও ‘রঘুবংশে’ বর্ণিত পদ্মমুখী পুরস্ত্রীরা প্রমাণ করে যে অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’ও তিনি ব্যবহার করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, মহাভারতের কাছে তাঁর প্রত্যক্ষ ঋণ অত্যল্প (কোনো-কোনো পণ্ডিতের মতে তাঁর ‘শকুন্তলা’র উৎস ‘পদ্মপুরাণ’, মহাভারত নয়), কিন্তু সবচেয়ে ব্যাপকভাবে যে-গ্রন্থের তিনি অধমর্ণ, সেটি বাল্মীকি-রামায়ণ। বাল্মীকি থেকেই উৎসারিত হয়েছে আদিরস ও করুণরস — সমগ্র সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের দুটি প্রধান সূত্র; সুন্দরকাণ্ডে রাবণের অন্তঃপুরের যে-বর্ণনা আছে তার প্রভাবে সন্ন্যাসী অশ্বঘোষও বিচলিত হয়েছেন; গৌতমের মহানিষ্ক্রমণকালে আলুলিত সুপ্ত নারীদের বিবরণে তাঁর এমন শিল্পচাতুর্য প্রকাশ পেয়েছে যে আমরা

---

* বাৎস্যায়নের জীবৎকাল খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী তৃতীয় বা চতুর্থ শতক ব’লে অনুমিত হয়, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁকে গুপ্তযুগের প্রারম্ভ, অর্থাৎ চতুর্থ শতকে স্থাপন করেছেন, তা হ’লেও তিনি কালিদাসের পুরোগামী। কিন্তু আমার বক্তব্য শুধু সাল-তারিখের অনুমানের উপর নির্ভর করছে না। হিন্দু সভ্যতার আদিযুগ থেকে রতিশাস্ত্র প্রচলিত ছিলো; অথর্ববেদে বহু যৌন প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে (কী করলে পত্নী বা প্রণয়িনীলাভ হয়, সতিন-কাঁটা উপড়ে ফেলা যায়, প্রেমিকার পরিজনকে নিদ্রামগ্ন রাখা যায়, পতি বা উপপতি একান্তভাবে আসক্ত থাকে, ইত্যাদি), এবং বাৎস্যায়ন নিজেই যৌনবিজ্ঞান বিষয়ক বহু লেখকের নাম করেছেন, যার অন্যতম আদিপুরুষ ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রখ্যাত উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু, যিনি পিতার কাছে ‘তত্ত্বমসি’র তত্ত্ব শিখেছিলেন। সে-সব প্রাচীনতম গ্রন্থ লুপ্ত হ’য়ে যায়, বাৎস্যায়ন তাদের সারসংকলন ক’রে বিখ্যাত হন; কিন্তু তাদের কোনো-কোনোটির সঙ্গে কালিদাসের পরিচয় ঘটেনি, এমন কথা প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা নেই। আসল কথা — তাঁর কাব্যসমূহই তা প্রমাণ করে — কালিদাস রতিশাস্ত্রকে তাঁর মানস-আসবাবের অংশ ক’রে নিয়েছিলেন, তা ‘কামসূত্র’ প’ড়েই হোক, বা অন্য কোনো গ্রন্থ প’ড়েই হোক।

বুদ্ধির দ্বারা সেই দেহিনীদের পরিত্যাজ্য ব'লে জানলেও রক্তের মধ্যে মোহিনী ব'লেও অনুভব করি। কালিদাস এই সূত্রটিকে বিচিত্র ও বর্ণিলভাবে নানা গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন; তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন উত্তরমেঘের অলকাচিত্র। তেমনি, বিরহব্যথার প্রথম উচ্চারণও বাল্মীকিতে; কবিতার দিক থেকে রামায়ণের একটি তীব্রতম মুহূর্ত সেটি, যখন, রাবণকর্তৃক সীতাহরণের পরে, রাম সর্বভূতে সীতার প্রতিরূপ দেখতে লাগলেন। রামের সেই আকুলতা যুগ-যুগ ধ'রে সংস্কৃত কবিতায় প্রতিধ্বনিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে; অশ্বঘোষে রাজপুত্রের বিরহকাতর পুরবাসিনীদের শোকদশায়, কালিদাসে রতি-বিলাপে, অজ-বিলাপে, ও যক্ষের বার্তারূপী স্বগতোক্তিতে। 'মেঘদূতে'র বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে মহাকাব্যের লক্ষণ নেই — তার সর্বাঙ্গীণ পাঠযোগ্যতার একটি কারণও তা-ই, অর্থাৎ নব-রসের অবতারণার চেষ্টামাত্র না-ক'রে, কবি এখানে আমাদের পূর্বোক্ত সূত্র দুটিকে বেছে নিয়েছেন। এই কাব্য আদিরস ও করুণরসের এক বহুবর্ণ সন্নিপাতরূপে আমাদের মনে প্রতিভাত হয়; যেন কামনার তপ্ত রাগ, অশ্রুর আবরণের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হ'য়ে, ইন্দ্রধনুর সিক্ত সাত রঙে বিচ্ছুরিত হ'লো। এবং এই সমন্বয়সাধনে বাল্মীকির আদর্শ কত কাজে লেগেছে, তার প্রমাণ স্তরে-স্তরে পাওয়া যায়।

ঋণের স্বীকৃতি আছে প্রথমতম শ্লোকটিতেই। বিরহী যক্ষ বাসা বাঁধলো রামগিরিতে, যার জলধারায় সীতা কোনো-এক কালে স্নান করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সেটা রাম-সীতার বনবাসের কাল, যখন সীতাহরণ আসন্ন বললে ভুল হয় না। এই একটিমাত্র ইঙ্গিতে কবি জানিয়ে দিলেন তাঁর কাব্যের বিষয়, পাঠককে আমন্ত্রণ জানালেন তুলনার ভাব মনে রাখতে — বিরহী রামের সঙ্গে যক্ষের, অপহৃতা সীতার সঙ্গে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার তুলনা। রাম হনুমানের মুখে সীতাকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন; যক্ষও কি সে-রকম কিছু পারে না? এই চিন্তার উদয় হওয়ামাত্র — কিংবা তার আগেই — আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘ দেখা দিলো। আকারে, প্রকারে ও ক্ষমতায়, এই মেঘটিকে সাগরলঙ্ঘনকারী হনুমানের অনুজ ব'লে চিনতে আমাদের দেরি হয় না। উত্তরমেঘের প্রথম শ্লোকেও বাল্মীকির প্রতিধ্বনি আছে, অলকায় দেখতে পাই লঙ্কাপুরীর একাধিক লক্ষণ; যক্ষের উন্মত্ততা দেখে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের রামকে মনে পড়ে, তার পত্নীকে দেখে সুন্দরকাণ্ডের সীতাকে। পদে-পদে আমরা তুলনা করতে বাধ্য হই; আর তুলনার ফলে

আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি কালিদাস কোথায় বড়ো, আর কোথায় তাঁর দুর্বলতা*।

বাল্মীকির সঙ্গে বর্ষা ও বিরহের সম্বন্ধ আরো একভাবে আমরা বুঝতে পারি। 'মেঘদূতে'র বাইরে কালিদাসের উল্লেখযোগ্য বর্ষাবর্ণনা আছে — 'ঋতুসংহারে' নয়, 'রঘুবংশে (১৩ : ২৬-৩৩), যেখানে, পুষ্পকরথে সীতাকে নিয়ে ফেরার সময়, মাল্যবান পর্বতের কাছে এসে রামের মনে প'ড়ে গেলো তাঁর বিরহকালীন বর্ষার বেদনা। এই আটটি শ্লোকের মধ্যে 'মেঘদূতে'র বহু তথ্য আমরা খুঁজে পাই, উভয় অংশই স্মৃতিরাগে রঞ্জিত ও বিরহব্যথায় আর্দ্র — প্রভেদ এই যে রাম পুনর্মিলনের পরে প্রেয়সীর কাছেই সব বলছেন, আর যক্ষের উক্তির প্রেরণা পুনর্মিলনের আশা। এ-দুয়ের মধ্যে কোনটি আগেকার লেখা তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না, কিন্তু এটা আমরা বুঝি যে দুটোই বাল্মীকি থেকে প্রবাহিত।

'মেঘদূত' প'ড়ে প্রতীতি জন্মে যে কালিদাস, রচনায় হাত দেবার আগে, মনে-মনে পুরো কাব্যটির পরিকল্পনা ক'রে নিয়েছিলেন ; একেবারে সঠিকভাবে বুঝেছিলেন কী তিনি করতে যাচ্ছেন, কতখানি এই কাব্যের বিস্তার, কী-কী প্রসঙ্গ আসবে তার মধ্যে, আর সে-সব প্রসঙ্গের বিতরণের মাত্রাই বা কেমন হবে। আমরা যে-কাব্যটি পডছি তা আরম্ভ বা শেষ করার

* বস্তুত, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আটাশ-সংখ্যক সর্গটির সঙ্গে (রামের বর্ষাবর্ণনা) পূর্বমেঘের অনুপুঙ্খগত বহু সাদৃশ্য দেখা যায় : আম্র, জম্বু, কদম্ব ; হরিণ ময়ূর ও গর্ভাধানহৃষ্ট বলাকা ; বিষ্ণুর নিদ্রা ; শস্যপূর্ণ পৃথিবী ; মিলনলিপ্সু পথিক-পতিরা ; হস্তী, নদী, পর্বত — সবই ব্যবহার করেছেন বাল্মীকি, এমনকি শ্লোক : ৫৫-তে আষাঢ মাসেরও উল্লেখ আছে। রামও বর্ষাঋতুকে বলেছেন 'মন্মথবতাং হিতাং', 'কামসন্দীপন' ; তাঁর বর্ণনাতেও স্থান পেয়েছে রমণরত পশুপক্ষী ও সুরতমর্দনে স্খলিত স্বর্গাঙ্গনাদের মুক্তাহার ; তিনিও দেখছেন প্রকৃতিতে সেই রমণলীলা, যা থেকে বর্তমানে তিনি নিজে বঞ্চিত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রামের চরিত্রে ও রামায়ণকাব্যে এই কল্পনাবিলাস একটি মাত্র মুহূর্ত অধিকার ক'রে আছে, আর 'মেঘদূতে' এটাই সর্বস্ব — এবং সেখানেই কালিদাসের মৌলিকতা ও সিদ্ধি। আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে শুধুমাত্র যৌন প্রণয়কে অবলম্বন ক'রে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর দীর্ঘ কবিতা পৃথিবীতে আর রচিত হয়নি — ভর্তৃহরির রমণীয় 'শৃঙ্গারশতক'টিও, ঘটনাসূত্র ও নাটকীয়তার অভাবে, শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিকর হ'য়ে পড়ে — এবং সেটি এ ক টি কবিতাও নয়।

আমি টীকার অংশে বাল্মীকি-কালিদাসের কয়েকটি তুলনাবিন্দু উল্লেখ করলাম। পঞ্চম সংস্করণের ৮।

আগে কতবার তিনি নকশা বা খশড়া করেছিলেন, কিছু করেছিলেন কিনা, ভূরিপরিমাণ রচনা থেকে ঐ স্বল্পাধিক একশত শ্লোক কি ছেঁকে তুলেছিলেন, বর্জন করেছিলেন কতখানি, পরিবর্তন, পরিশোধন, পুনর্লিখনের পরিশ্রমে কত তালপাতা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলো — এই সবই আমাদের অজানা থাকবে চিরকাল। যে-সব পাঠান্তরের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি অতিশয় গৌণ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পষ্টত বর্জনীয় — তারা লিপিকারপ্রমাদও হতে পারে, হ'তে পারে কোনো পরবর্তী কাব্যাস্ক সম্পাদকের 'সংশোধন' — তাদের সাহায্যে কালিদাসের কারখানায় উঁকি দেবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু কাব্যটির বিষয়ে অগভীরভাবে চিন্তা করলেও তার মিতাচারে মুগ্ধ হ'তে হয়, সংস্কৃত কাব্যের প্রধান অভিশাপ যে-বাগ্‌বাহুল্য তা থেকে এটি লক্ষণীয়ভাবে মুক্ত; একটি গর্বিত সক্ষম নৌকোর মতো নিটোল ও নিখুঁত এর গড়ন, কোথাও এতটুকু বাহুল্য বা আতিশয্য নেই, সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিটি অংশ সুষমভাবে বিধৃত হ'য়ে আছে। কাব্যের সূচনামাত্রেই গতির বেগ লক্ষ করা যায় — নৌকো তার ঘাট থেকে যাত্রা করলো; — প্রথম শ্লোকে যক্ষের বর্তমান (ও প্রাক্তন) অবস্থা জানিয়ে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না-ক'রে, দ্বিতীয় শ্লোকেই মেঘটিকে আবির্ভূত করা হ'লো; তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে যথাক্রমে আমরা জানতে পেলাম মেঘ দেখে কী মনে হ'লো যক্ষের, কী ভাবলো সে, কী স্থির করলো। বেদনা, চিন্তা ও সংকল্প, এই তিনটি স্তর মাত্র তিন শ্লোকে প্রকাশ ক'রে ষষ্ঠ শ্লোক থেকেই কবি যক্ষের আবেদন শুরু ক'রে দিলেন — তার সংকল্প ও কার্যের মধ্যে অন্য কোনো প্রসঙ্গ স্থান পেলো না; এবং যক্ষের ভাষণ পূর্বমেঘের এই ষষ্ঠ শ্লোকে আরম্ভ হ'য়ে শেষ হ'লো একেবারে উত্তরমেঘের শেষ শ্লোকে; কবি তাঁর নিজের জবানিতে আর একবারও কথা বললেন না। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে, অলকা দেখে, যক্ষপ্রিয়াকে অবলোকন ক'রে, তাকে যক্ষের অভিজ্ঞানসমেত বার্তা শুনিয়ে, মেঘ তার কর্তব্য যখন শেষ করলো, তখন যক্ষ আর তিনটিমাত্র শ্লোকে আবার তার আবেদন জানালো (তার শিল্পগত প্রয়োজন ছিলো), একটি সংহত ও বিষয়সম্মত স্বস্তিবাচনের সঙ্গে কাব্য সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ হ'লো। আমরা অবাক হ'য়ে যাই যে একটি কথা বেশি বলা হ'লো না, খুব লোভনীয় প্রসঙ্গে এসেও কবির বাণী ফেনিল হ'লো না মুহূর্তের জন্য। আমরা অবাক হ'য়ে যাই যে শ্লোকগুলি পরস্পরে সম্পৃক্ত; অর্থাৎ, পরেরটিকে উপভোগ করতে

হ'লে আগেরটিকেও জেনে নিতে হয়, কোনো-কোনো শ্লোক বিচ্ছিন্নভাবে স্মরণীয় ও উপভোগ্য হ'লেও পুরো কাব্যটির অভিঘাত ধারাবাহিক পাঠ-সাপেক্ষ। কালিদাসের দীর্ঘতম কাব্যসমূহে এই ঐক্য আমরা দেখতে পাই না: সূচনার সঙ্গে সমাপ্তির সংগতি, এবং বিভিন্ন শ্লোকের পারম্পর্যনির্ভর সম্বন্ধ — এগুলো সংস্কৃত কাব্যের সাধারণ লক্ষণ নয়। হরগৌরীর পরিণয়-অনুষ্ঠানেই 'কুমারসম্ভবে'র সীমা টানা যায়*, 'রঘুবংশে'র বিভিন্ন সর্গের ও অংশের মধ্যে সমতা নেই, সব সময় আন্তরিক সম্বন্ধও পাওয়া যায় না — নির্বাচনযোগ্য অংশের গুণেই এই দুই কাব্য আদরণীয়। কিন্তু 'মেঘদূতে'র আবেদন তার সমগ্রতায়: যে-সব শ্লোক স্পষ্টত প্রক্ষিপ্ত তাদের বাদ দিয়ে, তার প্রায় কিছুই আমরা হারাতে রাজি নই, এবং পুরো কাব্যটি থেকে দুটিমাত্র শ্লোক আমরা দেখাতে পারি যেখানে আমাদের উৎসাহ নিস্তেজ হ'য়ে আসে — তার মধ্যে একটির বিষয় কার্তিক, অন্যটির রন্তিদেব। যে-গুণে 'মেঘদূত' আমাদের আদ্যন্ত ধ'রে রাখে আমি তার নাম দিতে চাই গতি; কাব্যে উক্ত মেঘটিকে যে-অনুকূল বায়ু ধীরে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, তা আমাদের এই সুন্দর তরণীটিরও সহায়। মেঘ চলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও চলেছি: কিন্তু মেঘ মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্য থামলেও কাব্যের তরী, ছন্দের ঢেউয়ে স্বনিত হ'তে-হ'তে, হেলে-দুলে এগিয়েই চলে। তার গতি অত্বর ও সমলয়সম্পন্ন, প্রথম থেকে সে জানে তার গন্তব্য কোথায়, সেখানে পৌঁছবার আগে অন্য কোথাও একবারও ঠেকে যায় না, আর পৌঁছনোমাত্র, দাঁড়দড়ার আর্তনাদ না-তুলে, বিনম্রভাবে থেমে যায়। আমরা তার আরোহী হ'য়ে পথে পথে আলোচনার অবকাশ পাই, কিন্তু ক্লান্তি বা অন্যমনস্কতা সম্ভব হয় না।

সংস্কৃত সমালোচকেরা 'মেঘদূত'কে খণ্ডকাব্য বলেছেন, তাতে তার আকারের পরিচয় আছে, প্রকৃতির নয়। য়োরোপীয় পরিভাষার মধ্যে কোনোটির সঙ্গেই এর সঠিক মিল নেই — এই কাব্য ড্রামাটিক নয়, ন্যারেটিভ না, লিরিকও একে বলা যাবে না। অথচ এই তিনেরই লক্ষণ এর মধ্যে

* আমি অবহিত আছি যে 'কুমারসম্ভবে'র শোচনীয় সমাপ্তির জন্য কালিদাসকে দায়ী করা অন্যায় হবে, কেননা নবম থেকে সপ্তদশ পর্যন্ত শেষ নয়টি সর্গ প্রায় নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু অষ্টম সর্গের একানব্বুইটি শ্লোক জুড়ে হরগৌরীর শৃঙ্গারবিলাস যে-ভাবে বর্ণিত হয়েছে তাও আতিশয্যদোষে ক্লান্তিকর। —পঞ্চম সংস্করণের টী।

বিদ্যমান ; কাহিনীর একটি সূত্র আছে, মাঝে-মাঝে (উত্তরমেঘে) লিরিকের আভাস, আর আছে একটি নাটকীয় বিন্যাস, যা কাব্যটিকে নম্য ও বন্ধুর ক'রে তুলেছে ; — নৌকোটি একই ছন্দে চলেছে, কিন্তু ছোটো বা বড়ো ঢেউয়ের সংঘাতজনিত লয়ের প্রভেদও আমরা অনুভব করি। আমাদের মনে প'ড়ে যায়, সংস্কৃত ভাষায় নাটকেও কালিদাস শ্রেষ্ঠ, আর তাঁর নাট্যবোধে তাঁর কাব্যসমূহ জীবন্ত। একদিক থেকে বলা যায়, 'মেঘদূত' কোনো আধুনিক উপন্যাসের মতো, যাতে প্লট ব'লে কিছু নেই, কিংবা যেটুকু আছে তার পরিণাম গ্রন্থারম্ভেই ব'লে দিয়ে লেখক আমাদের ধ'রে রাখেন শুধু শিল্পিতার চাতুরীতে ; অথবা এটিকে একটি রসান্বিত ভ্রমণকাহিনী বললেও ভুল হয় না। আবার অন্য দিক থেকে নাটকীয়তাও স্পষ্ট, কেননা এর মূলে আছে একজন বক্তা ও একজন শ্রোতা, এবং সেই মূল ব্যবস্থারই মধ্যে উত্তরমেঘে পাত্রপাত্রীর কিছু বদল হ'লো — কিছুক্ষণ মেঘ বক্তা ও যক্ষপ্রিয়া শ্রোতা, আর তারপর, যবনিকা নেমে আসার পূর্বক্ষণে, যক্ষ সোজাসুজি তার পত্নীকে তার বার্তা শোনালো, সেটি শেষ হওয়ামাত্র দৃশ্য বদল হ'লো আবার অলকা থেকে রামগিরিতে। এই বৈচিত্র্য — যা যুগপৎ দৃশ্যগত ও ভাবগত — তারই জন্যে কাব্যটি কখনো ক্লান্ত করে না আমাদের। অস্বীকার করার উপায় নেই যে কালিদাস বর্ণনাপ্রধান কবি — যা এ-যুগে আমরা কেউ হ'তে চাই না ; কিন্তু নাটকীয়তার গুণে তাঁর বর্ণনা স্থাবরতার অভিশাপ থেকে রক্ষা পেয়েছে। কবি যখন যক্ষপ্রিয়াকে রঙ্গমঞ্চে আনলেন সেই মুহূর্তটি ভেবে দেখা যাক। সংস্কৃত ভাষায় এমন কাব্য আছে যাতে শুধু পার্বতীর স্তনযুগলের বর্ণনায় পঞ্চাশ শ্লোক ব্যয়িত হয়েছে — ভাবতে আতঙ্ক হয় আমাদের ; ও রকম কোনো প্রচেষ্টা কালিদাসের হাত থেকেও আমরা সহ্য করতাম না। যক্ষ-প্রিয়াকে উৎসর্গিত শ্লোকের সংখ্যা সত্তেরো (উ ৮৫-১০১), আর তার মধ্যে একটি আরোহমান নিবিড়তা আছে ; কবি আমাদের উত্তেজনাকে অক্ষত রেখেছেন নায়িকাকে নানা ভাবে দেখিয়ে — দিনের কাজে, রাত্রির অনিদ্রায় ও নিদ্রায়, ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চে মূক অভিনয় দেখছি আমরা, মেঘের দিকে সে কেমন ক'রে তাকাবে, কেমন মন দিয়ে শুনবে তার কথা, সেই শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কাব্যের গতির সঙ্গে তার সংযোগ অক্ষুণ্ণ। বর্ণনার অন্তরালে এখানে আছে নাটকীয় ক্রিয়া, 'রঘুবংশে'র স্বয়ংবর-সভায় ইন্দুমতীকে যা জীবন্ত করেছে, আর যার অভাবে 'কুমারসম্ভবে' যুবতী পার্বতীর রূপচিত্রটি অমন নিষ্প্রাণ।

প্রথমে মনে হ'তে পারে 'মেঘদূতে' যক্ষের বিরহ একটি অছিলামাত্র; কবির আসল উদ্দেশ্য তাঁর প্রিয় কয়েকটি ভূদৃশ্যের আর তারপর তাঁর ভূস্বর্গের চিত্ররচনা। পূর্বমেঘে যে সব নদী, নগর ও পর্বত আমরা পর-পর দেখে যাচ্ছি তারা সকলেই সুন্দর, তবু তারাও সুন্দরতমের ভূমিকাস্বরূপ কাজ করছে (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন 'স্বর্গের সিঁড়ি'); এই পার্থিব সৌন্দর্যের শেষ প্রান্তে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে অলকা, এলদোরাদো, সব-পেয়েছির দেশ, এবং এক তিলোত্তমা নারী, কবির মানসপ্রতিমা, যাকে উদ্ঘাটন করার জন্য — আমরা দেখামাত্র বুঝতে পারি — কবি এতক্ষণ ধ'রে আয়োজন করছিলেন। কাব্যটির গড়ন যেন পিরামিডের মতো, তার পাদদেশে ভৌগোলিক বিবরণ, মধ্যভাগে অলকা, আর তার চূড়ায় অধিষ্ঠিত এক নারীমূর্তি। আর, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এক চিত্রশালা অতিক্রম ক'রে যাই আমরা; ভারতীয় চিত্রকলায় যা দেখতে পাই না সেই ভূদৃশ্য পর-পর এগিয়ে আসছে ও স'রে যাচ্ছে — কোনো ক্রমশ-উন্মোচিত চৈনিক পট-চিত্রের মতো যেন — তারপর দেখি যক্ষপ্রিয়ার আশিরচরণ পূর্ণ প্রতিকৃতি: বর্ণনা, শুধু বর্ণনার উপর নির্ভর ক'রে এমন স্মরণীয় কাব্য পৃথিবীতে বোধহয় আর লেখা হয়নি। তা-ই মনে হয় আমাদের, প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চম বার কাব্যটি যখন পাঠ করি। মনে হয়, কবির সত্যিকার উৎসাহ যক্ষের বিরহের দিকে নয়, পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলির দিকে।

যক্ষ তার পত্নীবিরহে সত্যি খুব কাতর হয়েছে, এ-বিষয়ে — কবি যা-ই বলুন — কাব্যের আরম্ভে আমরা ঠিক নিশ্চিত হ'তে পারি না। সে রোগা হ'য়ে গেছে, তার মাথার ঠিক নেই — এ-সবই তথ্য হিশেবে বলা হ'লো আমাদের — কিন্তু তার বাক্যে বা ব্যবহারে অপ্রকৃতিস্থতার নামগন্ধ পাই না, বরং পাই একটি বিচক্ষণ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, এমনকি প্রায় হিশেবি মনের পরিচয়, যে-মন কোনো প্রয়োজনীয় ছোটো তথ্য ভোলে না, তথ্যগুলিতে গাণিতিক যাথার্থ্য দিতে চায়, এবং যা শিষ্টাচার বিষয়ে অবহিত, আর কিসে নিজের সুবিধে হবে সে-বিষয়েও সর্বদা সচেতন। প্রেমিক বলতে আমরা যা বুঝি, রেনেসাঁস-পরবর্তী য়োরোপীয় সাহিত্য আর আমাদের বৈষ্ণব ও আধুনিকতর কাব্য থেকে এ-বিষয়ে যে-ধারণা আমাদের মনে নিবিষ্ট হ'য়ে আছে, তার সঙ্গে এই যক্ষের কিছুই মিল নেই; সে পদে-পদে যুক্তি ও প্রথা মেনে চলে, কাণ্ডজ্ঞান হারায় না, লজিকে ভুল করে না, 'লাখ-লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে

বাখলু তব হিয়ে জুড়ন না গেল'— এ-রকম একটা অসম্ভব কথা তার পক্ষে বলা অসম্ভব। সে যে মেঘকে বার্তাবহ ক'রে পাঠাতে চাইলো এতে আমরা দেখতে পাই তার কবিস্বভাব, কিন্তু কালিদাসের কাছে এটাই তার অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ, তাই তিনি তখনই মন্তব্য করেন — 'কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।' এই জবাবদিহিটা কবির, আর সেইজন্যেই আমাদের কাছে গ্রাহ্য, — আরো বেশি : এই মন্তব্যের মধ্যে যক্ষের অবস্থার কারুণ্যের স্পর্শ পাওয়া গেলো। কিন্তু, আমরা সন্দেহ করি, এই মন্তব্য যক্ষ নিজেও করতে পারতো, কেননা আসলে সে কবির উক্ত বিহ্বলতা থেকে আশাতীতভাবে মুক্ত, তার কথা শুনে তাকে আমাদের মনে হয় — প্রেমিক নয়, রাজপারিষদ, উন্মাদ নয়, সংসারধর্মী। অর্থ ও কাম, এই দুই বর্গে সে সিদ্ধপুরুষ, মেঘের উদ্দেশে যে-আবেদন সে উচ্চারণ করছে তাতে রোমিওশোভন প্রলাপের লেশ নেই, আছে চাটুবাক্য, নীতিবাক্য, অনুনয়, প্রলোভন, বিবেচনা, আর পুঙ্খানুপুঙ্খ পথনির্দেশ। যক্ষ খুব সুচিন্তিতভাবে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হচ্ছে ; প্রথমে সে কুড়চি ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে মেঘকে সম্ভাষণ করলো, তারপর থেকে তার সম্পূর্ণ বক্তৃতাটিতে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

পূর্বমেঘ

১। চাটুবাক্য (শ্লোক ৬। যক্ষের ভাষণের প্রথম শ্লোক।)

২। গন্তব্যের উল্লেখ (শ্লোক ৭। কোথায় যেতে হবে, যক্ষ তা প্রথমেই জানিয়ে দিলো, তারপর ধীরে-ধীরে পথের বিবরণ দেবে।)

৩। প্রলোভন (শ্লোক ৮, ৯, ১১। মেঘকে একেবারে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে না, পথে-পথে তার লভ্য বস্তু অনেক আছে : বনিতাদের দৃষ্টি, বলাকার সেবা, রাজহংসের সঙ্গ, ইত্যাদি।)

৪। সদ্বিবেচনা (শ্লোক ১৩। শ্লোক ১২-তে মেঘকে বিদায় নিতে বলা হ'লো। কিন্তু মেঘ যেন শ্রান্তির ভয় না করে, কেননা পথে-পথে তার বিশ্রাম ও জলপানের ব্যবস্থা আছে।)

৫। দিক নির্ণয় (শ্লোক ১৪। মেঘকে উত্তর দিকে যেতে হবে।)

৬। পথনির্দেশ বা ভৌগোলিক বিবরণ (শ্লোক ১৬ থেকে শেষ পর্যন্ত।)

উত্তরমেঘ

৭। অলকার বর্ণনা (শ্লোক ৬৫-৭৭।)

৮। যক্ষের ভবন (শ্লোক ৭৮-৮৩। তোরণ, মন্দারবৃক্ষ, সরোবর, প্রমোদশৈল, মাধবীবিতান, ময়ূরদণ্ড, শঙ্খপদ্মের চিত্র — এই সব লক্ষণ দেখে মেঘ যাতে চিনতে পারে।)

৯। যক্ষপ্রিয়া (তার স্বভাবী রূপ : শ্লোক ৮৫।)

১০। যক্ষপ্রিয়া (তার বর্তমান বিরহক্লিষ্ট রূপ : শ্লোক ৮৬-১০০।)

১১। মেঘের আত্মঘোষণা (শ্লোক ১০২, ১০৪-৬ : সে কে, কার দূত হ'য়ে এসেছে, তার প্রেরক কী অবস্থায় আছে, এই জরুরি খবরগুলো প্রথমেই জানানো হ'লো।)

১২। যক্ষের বার্তা (শ্লোক ১০৭-১১৩)

১৩। যক্ষের অভিজ্ঞান (শ্লোক ১১৪-১৫।)

১৪। পুনশ্চ অনুনয় (শ্লোক ১১৬।)

১৫। অন্তিম চাটুবাক্য ও নীতিবাক্য (শ্লোক ১১৭)

১৬। আশীর্বচন (শ্লোক ১১৮।)

পূর্বমেঘের যে-অংশকে পথনির্দেশ নাম দিয়েছি, তার মধ্যেও প্রলোভনের মাত্রা কম নয় ; হয় মেঘ রমণীয় বস্তুসমূহ দেখবে, নয় অন্যের দ্বারা রমণীয় রূপে দৃষ্ট হবে : শুধু সুন্দরীদের কটাক্ষপাতে প্রীত হবে না সে, শুধু দেবদম্পতির নয়নভোগ্য হবে না, কার্তিকের সেবক হবার সুযোগ পাবে ও স্বয়ং শিবের আরতিকালে পটহের মতো ধ্বনিত হ'য়ে পুণ্যার্জন করবে। পথে পথে অনেক সুকৃতির অবকাশ রয়েছে তার : দাবাগ্নি নেবানো, ফল পাকানো, কৃষির জন্য ভূমিকে প্রস্তুত করা, পুষ্পচায়িকাদের মুখে ছায়া ফেলা, নদীকে পূর্ণতাদান, পশুপাখির আনন্দসাধন। অর্থাৎ, তার সামনে যে-সব প্রলোভন ধরা হচ্ছে সেগুলো শুধু ভোগের নয়, সদাচারজনিত পুণ্যফলেরও বটে। ('আমার অনুনয়ে, নিজেরও লাভহেতু ...' উ ১০৪।) অন্য দিকেও যক্ষের বিবেচনা প্রখর : মেঘের বিশ্রামের ব্যবস্থা উল্লিখিত আছে পাঁচ বার — আম্রকূট পর্বতে, নীচৈ পর্বতে, উজ্জয়িনীর ভবন-বলভিতে, কনখলের সমীপবর্তী হিমাচলে, ও কৈলাসে, তাছাড়া পূ ২৩ অনুসারে পথবর্তী প্রতি পর্বতেই মেঘের কিছু দেরি হবে , এবং তার পুষ্টিসাধন ও বিনোদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে —

কিছুটা পুনরুক্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও — আটটি নদী ও জলাশয় : রেবা, বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, গম্ভীরা, চর্মণ্বতী, সরস্বতী, জাহ্নবী ও মানস সরোবর। এই সুবুদ্ধি ও সাবধানতা উত্তরমেঘেও কিছু কম নেই : মেঘ কোন জায়গা থেকে প্রথম যক্ষপ্রিয়াকে দেখবে, কেমন ক'রে তাকাবে, কথা বলার আগে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে, কেমন ক'রে মানিনীর ঘুম ভাঙাবে, কী সম্ভাষণ করবে, প্রথম কথাটি কী উচ্চারণ করবে — যক্ষ এই সমস্তই স্পষ্টভাবে নির্দেশ ক'রে দিয়েছে, কোনো-একটি ধাপও টপকে পেরিয়ে যায়নি। সেনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ধের আয়োজন, তেমনি যক্ষের কাছেও এই বার্তাপ্রেরণ গণিতনির্ভর ব্যবস্থাসাপেক্ষ।

এ কেমন বিরহী, আমরা মনে-মনে প্রশ্ন না-ক'রে পারি না, যে তার লক্ষ্যের প্রতি তন্ময় হ'য়ে নেই, দূতকে তাড়া না-দিয়ে যে উল্টে তাকে বার-বার বিরাম নিতে বলে, বলে ঘুরে যেতে, নদীতে পাহাড়ে সুখভোগ করতে, উজ্জয়িনীতে রাত কাটাতে, কৈলাসে — অলকার অত কাছে এসে! — নানা প্রমোদে মেতে উঠতে? আমরা জানি, এই আপত্তি তুললে 'মেঘদূত' কাব্যের অস্তিত্বের হেতুটাকেই অস্বীকার করা হয়, কিন্তু এই প্রশ্ন আজকের দিনের পাঠকের মনে জাগতে বাধ্য। আরো : এই বিরহের প্রকৃতি বিষয়েই শেষ পর্যন্ত আমাদের একটি সন্দেহ ঘোচে না। যক্ষের কাছে — এবং দুঃখের বিষয় কবির কাছেও — নারী ভোগ্য সামগ্রীমাত্র, ইন্দ্রিয়বিলাসের প্রধান উপাদান; পত্নী ও উপপত্নীদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে, গীতধ্বনিত রম্যভবনে মদ্যপান ও রতিসম্ভোগ ভিন্ন অলকাবাসীর আর-কোনো কৃত্য আছে ব'লে আমরা জানতে পারি না; অতএব যক্ষ যদি কাতর হ'য়ে থাকে, তার একমাত্র কারণ, আমাদের সন্দেহ হয়, সাংবৎসর অনৈচ্ছিক ইন্দ্রিয়দমন। হয়তো, যদি দৈবাৎ রামগিরিতে একটি মনোরম সঙ্গিনী জুটে যেতো, তাহ'লেই এই নির্বাসন সহনীয় হ'তো তার কাছে। কিন্তু আসলে, যক্ষের কাতরতা কবির বর্ণনায় যতটা আছে তার কথায় বা ব্যবহারে ততটা নেই; কাব্যটিতে কিছুদূর অগ্রসর হ'লেই আমরা লক্ষ করি যে তার আকুলতা তার নিজের জন্য নয়, তার পত্নীর জন্য; অর্থাৎ, সে নিজে কষ্টে আছে ব'লে তার দুঃখ নয়, স্ত্রী পাছে বিরহদুঃখে প্রাণত্যাগ করে, এই তার আশঙ্কা। 'তার কাছে আমার খবর নিয়ে যাও, বোলো আমি বেঁচে আছি —' এর উপরেই বার-বার জোর দিচ্ছে সে; 'আমাকে তার খবর এনে দাও,' এ-কথা, উত্তরমেঘের অন্তিম অংশে (শ্লোক ১১৬), একবারমাত্র উল্লিখিত আছে। নারী অবলা ব'লে

তার প্রতি অধিক সমবেদনা সাধু ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই অনুভব ক'রে থাকেন, কিন্তু নারী যখন স্বীয় প্রেয়সী তখন বিরহীর কাছে এতখানি পরোপকারবৃত্তি আশা করা যায় না*। এ কেমন প্রেম যা স্বার্থপর নয়, নিজের আবেগ ছাড়া অন্য সব বিষয়ে অন্ধ নয়?

আমরা যাকে প্রেম ব'লে থাকি কাম তার শিকড় তাতে সন্দেহ নেই, যে-কাম, নানা বিচিত্র রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, আমাদের দেহে-মনে অনবরত কাজ ক'রে যাচ্ছে। যাতে কামগন্ধ নেই তাকে (অন্তত মানবিক অর্থে) প্রেম ব'লে আমরা মানতে পারি না, কিন্তু এও আমাদের কাছে অগ্রাহ্য যে প্রেম বস্তুটি রিরংসারই নামান্তর। এইখানে সংস্কৃত কবিদের সঙ্গে আমাদের একটি মস্ত ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁদের প্রণয়বিবরণ প'ড়ে আমরা যে সম্পূর্ণ সুখী হ'তে পারি না, তার কারণ যৌনবৃত্তির অকপট উল্লেখ নয়, হার্দ্য আবেদনের অভাব। মনে পড়ছে ছাত্রবয়সে প্রথম যখন 'শকুন্তলা' পড়েছিলাম, আমি রীতিমতো পীড়িত হয়েছিলাম নায়িকার কামজ্বরের বর্ণনা শুনে; চন্দন, পদ্মপাতা প্রভৃতি দৈহিক প্রলেপের সাহায্যে সেই তাপ প্রশমনের প্রয়াসটাকে পিচ্ছিল ব'লে অনুভব করেছিলাম — আমি তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে 'অশ্লীলতা'র উদীয়মান প্রতিভূ। পরবর্তী কালে এই বিকর্ষণের ভাব চেষ্টার দ্বারা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি; এখন আমি সংস্কৃত কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারি; বুঝতে পারি, আমরা যাকে প্রেমে পড়া বলি তাকেই তাঁরা কামজ্বর বলতেন, কিন্তু ও-দুই অবস্থাকে অবিকল এক ব'লে ভাবতে আমি এখনও পারি না। এখনও আমার অবাক লাগে যে কালিদাসের মতো মহাকবি শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের দৃশ্যে, হারেমবিলাসী দুষ্মন্তর উদ্দেশে কারো মুখেই কোনো নিন্দে বসালেন না, মহাভারতের তেজস্বিনী শকুন্তলাকে পরিণত করলেন প্রায় বাংলা সিনেমার নিশ্চরিত্র সতীলক্ষ্মীতে†; অবাক লাগে,

---

* যক্ষের এই মনোভাবের দু-রকম অর্থ হ'তে পারে: হয় সে ঔদার্যবশত নিজের দুঃখের চাইতে স্ত্রীর দুঃখকে বড়ো ক'রে দেখছে, নয় তো স্ত্রীর তুলনায় প্রধান ক'রে ভাবছে নিজেকে — অর্থাৎ, ধ'রে নিচ্ছে যে এই বিরহক্লেশ তার নিজের চাইতে পত্নীর পক্ষে বেশি তীব্র। উভয় অর্থই প্রেমিকবৃত্তির বিরোধী।

† এই উক্তির সংশোধন প্রয়োজন, কেননা সম্প্রতি আমার প্রত্যয় জন্মেছে যে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর উৎস মহাভারত নয়, পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের অন্তর্ভূত শকুন্তলা-উপাখ্যান। এ-বিষয়ে সব প্রধান তথ্য বিহারীলাল সরকার-প্রণীত 'শকুন্তলা-রহস্য' পুস্তকে (কলকাতা, বঙ্গাব্দ

তৎকালীন সমাজে নারী যে-একটিমাত্র কারণে আদৃতা ছিলো, তাঁর কবিদৃষ্টি তা অতিক্রম ক'রে অন্য কোনো সংসর্গে পৌঁছতে পারেনি। গৃহিণী, সচিব, সখী সবই ভালো — কিন্তু নারী যে শয্যাসঙ্গিনী ও মাতা, সে-কথাটাই সবচেয়ে জরুরি। জরুরি : তা বাস্তব ব'লে স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই. কিন্তু তার সম্পূর্ণ সফলতার শর্তই এই যে উভয়পক্ষে সমান অধিকার থাকবে। গ্রীক

১৩০৩) যে-ভাবে সংকলিত আছে তা প্রমাণ হিশেবে পর্যাপ্ত। লেখক দেখিয়েছেন যা-কিছু মহাভারতে নেই এবং যা-কিছু নিয়ে কালিদাস তাঁর প্লট সাজিয়েছেন — সখীদ্বয়, কণ্বশিষ্য শারদ্বত ও শার্ঙ্গরব, বৃদ্ধা গৌতমী, দুর্বাসার ভবিতব্যময় অভিশাপ, দুষ্মন্তর বিরহদুঃখ ও যুদ্ধযাত্রা, শেষ দৃশ্যে সিংহশাবকের সঙ্গে ক্রীড়মান বালকটি, এবং সেই বিশ্ববিখ্যাত অভিজ্ঞান-অঙ্গুরি ও অঙ্গুরিগ্রাসী মৎস্য ও মৎস্য-উদ্ধারকারী ধীবর — এমনকি মৃগয়াদৃশ্যে 'আশ্রমমৃগো ন হন্তব্যঃ' উক্তিটি পর্যন্ত — সবই আছে পদ্মপুরাণোক্ত উপাখ্যানে। অনুপুঙ্খগত সাদৃশ্যও অনেক : মহাভারতে পূর্বরাগ-দৃশ্যে শকুন্তলা স্বমুখে তাঁর জন্মকথা বলেছেন, কিন্তু পদ্মপুরাণে তা সখী-কর্তৃক কথিত হ'লো, মহাভারতে শকুন্তলা পতিগৃহে যান ছ-বছরবয়স্ক বলবান পুত্রকে নিয়ে, আর পদ্মপুরাণে গর্ভিণী অবস্থায়, প্রত্যাখ্যান দৃশ্যের শেষ অংশে মহাভারতে আছে অদেহী দৈববাণী, আর পদ্মপুরাণে জ্যোতিঃরূপিণী মেনকা তাঁর অবমানিতা কন্যাকে নিয়ে আকাশ-পথে অন্তর্হিত হলেন। কালিদাস এর প্রতিটি সূত্র ব্যবহার করেছেন — ষষ্ঠ অঙ্কে জলমগ্ন বণিক সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ঘটনাটুকু শুদ্ধু পদ্মপুরাণের। অবশ্য আমাদের রসানুভূতির বিচারে 'শকুন্তলা' নাটকটি কালিদাসেরই নিজস্ব, কিন্তু যে-উপাদানসমূহে তিনি নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন তার আকর পদ্মপুরাণ সন্দেহ নেই — যদি না পদ্মপুরাণেরও কোনো পূর্বলেখ থেকে থাকে যা কালিদাস পড়েছিলেন কিন্তু পরে লুপ্ত হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, আধুনিক ভারতে এই তথ্যটি এত স্বল্প-প্রচারিত; 'শকুন্তলা-তত্ত্বে'র লেখক চন্দ্রনাথ বসুও মহাভারতকেই কালিদাসের উৎস ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। একমাত্র তর্ক উঠতে পারে কালক্রম নিয়ে; উইলসন ভেবেছিলেন পদ্মপুরাণের উপাখ্যান কালিদাস থেকে আহৃত, কিন্তু ভিণ্টারনিৎস-প্রমুখ আধুনিক গবেষকদের মতে কালিদাসই অধমর্ণ। স্বর্গখণ্ডটি পদ্মপুরাণের একটি প্রাচীনতর অংশ ব'লে অনুমিত হ'য়ে থাকে — আর তাছাড়া, পুরাণই সেই কাঁচামাল যা শিল্পিত কাব্যে রূপান্তরিত হয়, একবার কাব্যরূপে দানা বাঁধলে তা থেকে পুরাণের উৎপত্তি প্রায় অসম্ভব; অতএব পুরাণটিকেই আদিলেখন ব'লে মনে করা সংগত।

কিন্তু মহাভারত স্থলে পদ্মপুরাণ পড়লেও আমার মূল বক্তব্য অপ্রতিষ্ঠ হ'যে যায় না, কেননা পদ্মপুরাণের নায়িকাও তেজস্বিনী ও দৃঢ়ভাষিণী — বস্তুত, তাঁকে মহাভারত থেকেই সশরীরে তুলে আনা হয়েছে। আমি মিলিয়ে দেখলাম, আশ্রম-দৃশ্যে ও প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার দীর্ঘায়িত সংলাপের অংশে শ্লোকের পর শ্লোক ও শ্লোকার্ধ, কখনো ব্যুৎক্রম ও কখনো গৌণ শব্দভেদ নিয়ে, মহাভারত থেকে আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে পদ্মপুরাণে। এই ঋণগ্রহণ 'শকুন্তলা-রহস্যে'র লেখক উল্লেখ করেননি। — পঞ্চম সংস্করণের টী।

সভ্যতায় নারীর সামাজিক অবস্থা ছিলো প্রাচীন ভারতেরই অনুরূপ, কুলবধূরা বরং আরো বেশি পরাধীন ছিলেন ; তবু একটি তফাৎ এই দেখা যায় যে গ্রীক পুরাণ বহুচারিণী স্ত্রীকে কল্পনা করতে পেরেছে, নাট্যসাহিত্যে উদ্গতবিষাণ নায়কেরা বিরল নন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে যে-মেয়েরা বহুচারিণী তারা অব্যতীতভাবে বেশ্যা — ঐ শব্দ সম্ভ্রান্ত ছিলো সেকালে, বৃত্তিটিও তা-ই — আর বেশ্যার সঙ্গে পুরাঙ্গনাদের সামাজিক মেলামেশা সম্ভব হ'লেও, কোনো কুলবধূর পক্ষে বহুগমন ছিলো কল্পনার পরপারে। অবশ্য বাস্তব জীবনে ব্যতিক্রম যে বিরল ছিলো না তার নিদর্শন আছে 'কথাসরিৎসাগরে' ও বহু ভাসমান লৌকিক গল্পে, কিন্তু সেগুলি সবই সমকালীন চিত্র ; সমগ্র পুরাণ-ভিত্তিক সংস্কৃত সাহিত্যে কোনো স্বামীঘাতিনী ক্লিতেমনেস্ত্রা বা সন্তানহন্ত্রী মেদেইয়া নেই, এমনকি কোনো পেনেলোপেও না, যাকে সতী অবস্থায় টিকে থাকার জন্য কৌশলের সাহায্য নিতে হয়*। 'মেঘদূতে' যে-সব চিত্তহারিণী অভিসারিকাদের দেখতে পাচ্ছি, তাদের সকলকেই বারবনিতা ব'লে ধ'রে নিতে হবে — বিবাহিতা স্ত্রী সতী থাকবে এটা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে উল্লেখেরও প্রয়োজন নেই। এইজন্যে যক্ষের মনে মুহূর্তের জন্যও এ-চিন্তার উদয় হয় না — 'সে এই এক বছর আমার প্রতি একান্ত থাকবে তো ? ইতিমধ্যে অন্য কারো সঙ্গে প্রণয় হবে না তো তার ?' — বরং সে নিশ্চিন্তে বলতে পারে যে তার অনুপস্থিতিতে তার গৃহ, 'সূর্যবিহনে পদ্মের মতো', হতশ্রী হয়েছে। তার এই আত্মতৃপ্তি দেখে কৌতুক জাগে আমাদের মনে, তার প্রতি শ্রদ্ধা ক'মে

* য়োরোপ ও তার অদূরবর্তী প্রাচী এক মায়াত্মক মোহিনীর লীলাভূমি। পুরাণে ও ইতিহাসে তার নাম কখনো মেডুসা বা কির্কে, কখনো লিলিথ বা ডেলায়লা, কখনো সেমিরেমিস বা সালোমে ; কখনো সে নীল-সর্পিণী ক্লেওপাত্রা, আর কখনো বা আরব্যোপন্যাসের শাহজাদী। যুগে যুগে কবিরা তাকে বলেছেন ডাইনি, পিশাচী, কালান্তকা, নিষ্করুণা ; মূর্তিমতী অবিদ্যা সে, তাই তার আকর্ষণ অবোধ্য। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও শিল্পকলায়, আদি থেকে আজ পর্যন্ত, এই মূর্তি নানা নামে ও রূপে নিরন্তর দেখা দিয়েছে — কখনো নগ্ন ও উদ্ধতভাবে, আর কখনো এক আধ্যাত্মিক আদর্শের মধ্যে বিধৃত হ'য়ে। কিন্তু ভারতীয় পুরাণে বা সাহিত্যে এই সর্বনাশিনীর চিহ্নমাত্র, আভাসমাত্র, ইঙ্গিতমাত্র নেই। যারা প্রেমিকদের বধ করে বা পশু বানিয়ে দেয়, বা বিবিধ যৌন অনাচারে লিপ্ত হয় তাদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি ; সাধারণ অর্থে দুষ্ট বলা যায় এমন একটি নারীও রামায়ণে বা মহাভারতে পাওয়া যায় না। স্বর্গে শচীদেবী থেকে আরম্ভ ক'রে রাক্ষসপত্নী মন্দোদরী পর্যন্ত সকলেই সতী ও কল্যাণী, রম্ভা মেনকাদি স্বর্বেশ্যারা মুনিদের তপোভঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো অনিষ্টসাধন করে

যায়। উপরন্তু, তার অবস্থার সঙ্গে তার কবিকথিত কাতরতার সংগতি আছে ব'লেও মনে হয় না আমাদের। কী হয়েছে? কোনো মৃত্যু নয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদ নয়, প্রাচীন চীনে কবির মতো সর্প-ব্যাধি-বর্বর-সংকুল মফস্বলে বদলি হ'তে হয়নি, লাতিন কবি ওভিদের মতো যাবজ্জীবন নির্বাসন হয়নি সভ্যলোক থেকে। এমন নয় যে প্রেয়সীকে আর চোখে দেখারও সম্ভাবনা নেই, ত্রিস্তানের ইসোল্‌ডের মতো তার প্রেয়সী পরস্ত্রীও নয়, যাকে সমাজের হাত অমোঘভাবে ছিনিয়ে নিতে পারে। যক্ষের অবস্থার মধ্যে দুঃখের তীব্রতার কোনো কারণ নেই, ব্যাপ্তিরও না। মাত্রই এক বছরের বিচ্ছেদ, তার মধ্যে আট মাস কেটেই গেছে, অবশিষ্ট চার মাসের পর পুনর্মিলনও নিশ্চিত। তার বর্তমান আশ্রয় যে-রামগিরি, তা তার অনভ্যস্ত হ'লেও ছায়াস্নিগ্ধ ও বাসযোগ্য। নিঃসঙ্গতায় বা সভ্য সংসর্গের অভাবে সে কষ্ট পাচ্ছে, এমন কোনো ইঙ্গিত কবি দেননি। তার দুঃখের একমাত্র উল্লিখিত কারণ পত্নী-বিরহ। এ-অবস্থায় আমরা তাকে অপৌরুষেয় ব'লে অশ্রদ্ধা করতে পারতাম, কিন্তু যক্ষ অন্তত 'মেয়েলিপনা'র অভিযোগ থেকে মুক্ত

না। তারার মতো অনার্যা বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ সম্ভব হ'লেও সেও তার বর্তমান ভর্তায় একনিষ্ঠ; কৈকেয়ীর মধ্যে ঈর্ষা যদি বা দেখা গেলো তাও অন্যের প্ররোচনায় ও পুত্রের কারণে, পতির কারণে নয়, দারান্তর গ্রহণ ক'রে যাসোন বা হেরাক্লেস তাঁদের প্রথমাদের হাতে যে-রকম শাস্তি পেয়েছিলেন তা বেদব্যাসের কল্পনার মধ্যে ছিলো না। অথচ নারীর প্রলয়ংকরী মূর্তি একটি সর্বজনীন সত্য,— সেই ভীষণ রূপটি 'কথাসরিৎসাগরে'র হাস্যরসান্বিত ব্যভিচারিণীদের মধ্যেও দেখা যায় না;— এমন কি হ'তে পারে ভারতীয় পুরাসাহিত্যে তার যথাযোগ্য প্রকাশ কখনোই ঘটেনি? এই প্রশ্নের উত্তর, আমার মনে হয়, বিধৃত আছে আমাদের কালী বা চণ্ডীর ইতিহাসে —সেই দেবী, যিনি আক্ষরিক অর্থে কালান্তকা— কালো, বিবসনা, নৃমুণ্ডমালিনী, স্বামীর দেহে পা রেখে যিনি প্রপঞ্চকে আহার করছেন — হয়তো তাঁরই মধ্যে হিন্দু মানস মূর্ত ক'রে তুলেছে ধ্বংসের উন্মাদনা, যা অন্য কোথাও প্রকাশের পথ পায়নি; পূর্বোক্ত মহা-নারীদের একটি সংহত সমন্বয়ের নামই হয়তো মহামায়া। কিন্তু এই মহামায়া আবার ভগবতী বা অন্নপূর্ণারই নামান্তর; শিব একাধারে ধ্বংসের ও ধ্যানের দেবতা, তিনিই দিওনিসস ও পশুপতি প্যান, আবার তিনিই ধ্রুপদকর্তা আপোলো, আর পাশ্চাত্ত্য খৃস্টে শয়তানেরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে পিশাচ থেকে প্রমথর পদে উন্নীত হ'লো — তারাও আর অশুভ রইলো না। সারা পৃথিবী ভারতীয় ও অভারতীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত, যামিনী রায়ের এই কথাটা আমি মানতে পারি না; কিন্তু নানা দিক থেকে বোঝা যায় ভারতীয় মন দুবারভাবে হাঁ-ধর্মী, সব রকম 'না'কে শেষ পর্যন্ত একটা সদর্থে রূপান্তরিত না-ক'রে তার তৃপ্তি নেই, এবং এখানে দ্বন্দ্বনির্ভর পাশ্চাত্ত্য জাতিবর্গের সঙ্গে তার দুস্তর প্রভেদ ঘ'টে গেছে।

হয়েছে নিজের উপরে স্ত্রীকে স্থান দিয়ে, সর্ববিষয়ে সর্ববুদ্ধির পরিচয় দিয়ে, এবং সত্যিকার কোনো কাতরতাও পরিহার ক'রে। এ দিক থেকে দেখলে, অষ্টম মাসে তার ব্যাকুলতার সমর্থন পাওয়া যায় না তাও নয়—তার স্ত্রী এতদিনও হয়তো কষ্টেসৃষ্টে টিকে ছিলো, কিন্তু এর পরেও সে সইতে পারবে তো ?*

বর্ষা ও বিরহ — এই বিষয় দুটি ভারতীয় কাব্যে আজ পর্যন্ত প্রধান হ'য়ে আছে ; তার একটি মুখ্য কারণ, সন্দেহ নেই, 'মেঘদূতে'র আবহমান প্রতিপত্তি। উৎসস্থল বাল্মীকি নিশ্চয়ই, কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বিরহী রাম বর্ষা পেরিয়ে শরৎঋতুতেও বেদনাবিহ্বল ; বিরহের সঙ্গে বিশেষভাবে বর্ষাঋতুকে সংশ্লিষ্ট করেন কালিদাসই প্রথম। লক্ষণীয়, 'মেঘদূত' প্রচারিত হবার পরে দূত-কাব্যের যে-হরিলুঠ প'ড়ে গিয়েছিলো তার নির্ভর ছিলো দৌত্যের সূত্রটি ; সেগুলির অনুকারক-লেখকবৃন্দ বিরহ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিরা বর্ষা-বিরহ সমন্বয়টিতেই অর্পণ করলেন তাঁদের মুগ্ধতা ও সৃষ্টিকল্পনা — কেমন আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে, তা আমরা সকলেই জানি। জয়দেব যখন তাঁর 'গীতগোবিন্দ'র প্রথম পঙক্তিটি লিখেছিলেন, — 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ'— তখন তাঁর মনে কি এই ইচ্ছেটি কাজ করছিলো না যে তাঁর শ্লোক 'মেঘদূতে'র প্রতিদ্বন্দ্বী হবে ? বৈষ্ণব কবিদের রাধিকা, উজ্জয়িনীর মেয়েদের মতোই, বর্ষার রাত্রে অভিসারে বেরোন ; আকাশে মেঘ উঠলে নায়ক-নায়িকার সঙ্গলিপ্সা বর্ধিত হয় ; চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, বর্ষার সঙ্গে প্রেম ও বিরহের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে গেছে। এই যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য যুগ-যুগ

* যক্ষ অমর না-হ'লেও অর্ধদেবতা ; তার আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ ব'লে ধ'রে নেয়া যায়, চার মাস বা এক বৎসর সময় তার কাছে নগণ্য। এটা তার বিরুদ্ধে একটা কঠিন যুক্তি হ'তে পারতো, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে সে এখন 'অস্তংগমিতমহিমা', এক বছরের জন্য দেবপদ থেকে নরজন্মে ও অলকা থেকে মরলোকে অবনীত। এবং তার প্রতি প্রযুক্ত শাপ তার পত্নীকেও স্পর্শ করেছে ; সে ও তার স্ত্রী — বা অন্তত তার স্ত্রী — যে-কোনো সাধারণ মানুষের মতোই দুঃখের সেই দশায় আবদ্ধ, যখন ক্ষণকালকেও দুঃসহরকম দীর্ঘ মনে হয়। 'মেঘদূতে'র বিপুল আবেদনের অন্যতম কারণ আমি দেখতে পাই এতে — যক্ষের এই মনুষ্যধর্মিতায়, স্বভাবত দুঃখভোগী পাঠকদের সঙ্গে সমবেদনার যোগস্থাপনে। 'কুমারসম্ভবে'র নায়ক-নায়িকা দেবতা, 'রঘুবংশ' বীরসিংহদের কাহিনী ; কিন্তু 'মেঘদূতে'র যক্ষদম্পতি আপাতত নিতান্তই মানুষ হ'য়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে আমরা মৃত্যুভয়াতুর স্বজাতির ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পাই ব'লে এই কাব্যের প্রীতিসাধনশক্তি দুর্বার।

ধ'রে গ'ড়ে উঠলো, তার মধ্যে 'মেঘদূতে'র প্রভাব অনস্বীকার্য, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণসমূহের উল্লেখ ক'রে বলতে পারি, এই কাব্যে সত্যিকার বিরহের স্বাদ নেই, বর্ষার আবেগও এতে সঞ্চারিত হয়নি। একটিমাত্র মুহূর্তে বৈষ্ণব কবি বা রবীন্দ্রনাথ যা পেরেছেন, শতোত্তর মন্দাক্রান্তা শ্লোক তাতে সফল হ'তে পারেনি :

এ-ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

সঘন গহন রাত্রি,
ঝরিছে শ্রাবণধারা —
অন্ধ বিভাবরী
সঙ্গপরশহারা।

প্রেম, বিরহ ও বর্ষায় এই ক্ষুদ্র অংশগুলি যেমন ভরপুর, এদের অন্তর্নিহিত আবেগ যেমন পাত্র ছাপিয়ে পাঠকের বা শ্রোতার মনে উপচে পড়ে, ঠিক সেই ধরনের প্রত্যক্ষ আঘাত বর্ণনাপ্রধান 'মেঘদূতে' আমরা কখনোই পাই না — না তার সমগ্রতায়, না কোনো অংশে। বিরহ, প্রেম, বর্ষা — এই তিনটি সূত্র স্বতন্ত্রভাবে মাঝে-মাঝে দেখা দেয়, বিবিধ চিত্রাবলিতে বর্ণ-যোজনার কাজ করে যেন, কিন্তু তিনটি বিষয় একই মুহূর্তে একত্র ও একীভূত হ'য়ে অসীমের দিকে জানালা খুলে দেয় না। 'এ-ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর' — বলামাত্র সারা আকাশ বেদনায় ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে, আদিগন্ত বিরহের উপর বৃষ্টির ধারা ব'য়ে যায়। এই বেদনা শুধু কোনো নির্দিষ্ট দয়িতের জন্য নয় — 'যে এলে আমার মন্দির পূর্ণ হবে আমি তাকে চিনি না,' এর মধ্যে এ-কথাও বলা আছে।

'মেঘদূত' যেখানে আমাদের সবচেয়ে নিরাশ করে, সেটি তার বিরহ-প্রসঙ্গ। বাল্মীকিতে সীতাহরণের পর রাম যখন ফুল, জন্তু, নদী, প্রস্রবণ, বায়ু ও আদিত্যের কাছে সীতার সন্ধান ক'রে-ক'রে নানা দিকে ধাবিত হচ্ছেন, তখন রোষ ও পরিতাপের মিশ্রণে তাঁর দুঃখ যেন আগুনের মতো দীপ্ত হ'য়ে উঠছে — কাউকে ব'লে দিতে হয় না সে-দুঃখ কত গভীর, কত দুঃসহ। পক্ষান্তরে, উত্তরমেঘের শেষাংশে (শ্লোক ১০২-১১৫) যক্ষ যে-কথাগুলি

বলছে, তার মধ্য দিয়ে তাকে একটি ভোগবঞ্চিত বিলাসী নাগর-রূপে দেখতে পাই, পুরো উক্তিটি একটি সযত্নসাধিত ও সুগন্ধি প্রেমপত্রের মতো শোনায়। কথাটাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য কোনো-কোনো আধুনিক কবির সঙ্গে কালিদাসের তুলনা করবো। জীবনানন্দ দাশ 'আকাশলীনা' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার প্রথম স্তবক—

> সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি,
> বোলো নাকো কথা ঐ যুবকের সাথে;
> ফিরে এসো, সুরঞ্জনা:
> নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে।

ষোলো লাইনের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি প'ড়ে আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, এর নায়িকা মৃতা না বিশ্বাসঘাতিনী, না কি কবিরই অপগত যৌবনের বেদনা এতে ধ্বনিত হচ্ছে—তা বোঝার প্রয়োজনও করে না, কেননা ঐ 'ফিরে এসো' আহ্বানের মধ্যেই অভাবের শুদ্ধ বেদনা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রেমের কবিতায় চণ্ডীদাসের বা জীবনানন্দের অস্পষ্টতা নেই, তাঁর নায়িকা সুস্পষ্টভাবে শরীর নিয়ে উপস্থিত, কিন্তু তিনি যে-বিরহের কথা বলেন তাও তার তীব্রতার চাপেই দেহের সীমা অতিক্রম ক'রে যায়:

> চাই, চাই, আজো চাই তোমারে কেবলি।
> আজো বলি,
> জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি আজো বলি—
> অভাবে তোমার
> অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
> কাম্য শুধু স্থবির মরণ। ···
> আমার জাগর স্বপ্নলোকে
> একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারি স্মরণ।

এই রকম 'অতিরঞ্জিত' ও অযৌক্তিক কথা যক্ষ কখনো বলতে পারে না; সে বলে: 'কল্পনায় আমি তোমার সঙ্গে নিজের দেহকে মেলাই', 'যে-হাওয়া তোমাকে স্পর্শ করেছে তাকে আমি আলিঙ্গন করি,' 'শিলায় তোমার ছবি এঁকে নিজেকে তার পায়ে লোটাতে চাই'—অর্থাৎ, তার বিরহের অভিব্যক্তিও বাস্তব সম্ভবপরতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। আধুনিক কবিদের এক-একটি রচনা হ'লো শূন্যতার হাহাকার, আর যক্ষের উক্তি একটি অভিরাম কারুকর্ম, যাতে বিরহদশার কৃত্যসমূহ প্রথামতো সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'লো

—জড় বস্তুতে প্রিয়ার প্রতিরূপ দর্শন। এরও পূর্বাভাস বাল্মীকিতে আছে, পম্পাতীরবর্তী শোভা দেখে রাম সীতার সৌন্দর্য স্মরণ করছেন, কিন্তু বাল্মীকিতে যা একটি সাধারণ অনুভাবের মতো কাজ করছে, বিদগ্ধ কালিদাস তাকে কয়েকটি বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত ক'রে নিয়েছেন :

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥ (উ ১০৭)

(দেখি প্রিয়ঙ্গুতে তোমার তনুলতা, বদন বিম্বিত চন্দ্রে,
ময়ূরপুচ্ছের পুঞ্জে কেশভার, চকিত হরিণীতে ঈক্ষণ,
শীর্ণ তটিনীর ঢেউয়ের ভঙ্গিতে ভুরুর বিলসিত পতাকা,
কিন্তু, হায়, নেই তোমার উপমান কোথাও একযোগে, চণ্ডী!)

এর পাশাপাশি পড়া যাক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের :

ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি ;
দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম ;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে-ঘাসে ;
পুনরাবৃত্ত রসনার প্রিয়তম ;
আজ সে কেবল আর কাবে ভালোবাসে।

দুটি অংশেরই শেষ পঙক্তিতে একটি 'কিন্তু' প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সেই প্রতিতুলনার জন্যেই এরা বিশেষভাবে ফলদ ; নয়তো কয়েকটি কবিপ্রসিদ্ধির মাল্যরচনার বেশি হ'তো না। কিন্তু যক্ষের আক্ষেপের কারণ শুধু এই যে তার প্রিয়ার সাদৃশ্য একসঙ্গে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, আর আধুনিক কবির দুঃখ এই যে তাঁর প্রাক্তন প্রিয়া এখন অন্য কাউকে ভালোবাসছে। দুয়ের মধ্যে কোন দুঃখ দারুণতর তা না-বললেও চলে ; যক্ষ যা বলছে তাতে, সত্যি বলতে, দুঃখের কোনো কারণই নেই, আমরা তাতে মনোহর একটি ভাবচ্ছবি শুধু দেখতে পাই, যাকে ইংরেজিতে বলে ফ্যান্সি। এই দুই অংশের উপকরণগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও এরা জাতে আলাদা—আর তার কারণ কবিত্বশক্তির তারতম্য নয়, আমরা এক জগৎ ছেড়ে আর-এক জগতে চ'লে এসেছি।

আসল কথা, সারা 'মেঘদূতে' কোনো ব্যর্থতাবোধ নেই — যক্ষের অবস্থায় তা থাকতেও পারে না — সেইজন্য তাতে বিরহবেদনা এত দুর্বল। রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' ('দূরে বহুদূরে') কবিতাটি 'মেঘদূতে'র সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে আমরা আবিষ্কার করি যে ঐ কবিতার বিষয়, প্রতিটি স্বতন্ত্র তথ্য, এমনকি বহু ভাষাবিন্যাস 'মেঘদূত' থেকে সরাসরি তুলে নেয়া হয়েছে — তাকে বহুলাংশে কালিদাসের অনুলিখন বললে ভুল হয় না — অথচ তাতে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা কালিদাস বলতে চাননি, বলতে পারেননি, বলতে পারতেন না। নায়িকার 'বাসস্থল' উজ্জয়িনী, তার প্রসাধন অলকার নারীদের অনুরূপ, তার ভবন যক্ষভবনের অনুকার, আর 'মিলনে'র কাল আরতিমুখর সন্ধ্যালগ্ন। লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম, মহাকাল-মন্দিরে সন্ধ্যারতি, দ্বারপার্শ্বে পুত্রবৎ-লালিত শিশু তরু ও শঙ্খপদ্ম চিহ্ন, কপোত, ময়ূর, চন্দন ও কেশধূপ — আবহরচনার সামগ্রীসমূহ সবই কালিদাসের। পড়তে-পড়তে আমরা যেখানে থমকে দাঁড়াই, আধুনিক কবির ব্যক্তিস্বরূপের বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভব করি, তা এইখানে —

> মোরে হেরি প্রিয়া
> ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
> আইল সম্মুখে — মোর হস্তে হস্ত রাখি
> নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
> 'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?'

কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম চমক কেটে যাবার পর আমাদের মনে পড়ে যে — 'হে বন্ধু, আছ তো ভালো'-র আশ্চর্য হৃৎস্পন্দন — এর মধ্যেও 'মেঘদূতে'র প্রতিধ্বনি আছে। যক্ষ মেঘের মুখ দিয়ে বলছে:

> তোমার সহচর, যদিও বিরহিত, জীবিত আছে রামগিরিতে।
> অবলা, তোমাকে সে কুশল জিজ্ঞাসে, প্রথমকৃত্য এ-প্রশ্ন,
> কেননা প্রাণীদের জীবন অস্থির, বিপদ ঘটে অতি সহজে। (উ ১০৪)

কথাটাকে সরল বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় — 'ভালো আছো তো?' একই প্রশ্ন: তবু দুয়ের মধ্যে কত বড়ো প্রভেদ, কী যুগান্তরব্যাপী ব্যবধান। যক্ষের প্রশ্ন একজন নীতিজ্ঞ জড়বাদীর: তার প্রিয়া যে ম'রে যায়নি, শারীরিক কুশলে আছে, শুধু এটুকু জানতে চাচ্ছে সে; আর রবীন্দ্রনাথের নায়িকার প্রশ্নে ধ্বনিত হচ্ছে এক জন্ম-জন্মান্তরের বেদনা, যা হৃদয়ের মধ্যে

অনবরত উত্থিত হয় কিন্তু কোথাও যার উত্তর নেই। 'বলো, বলো তোমার কুশল শুনি / তোমার কুশলে কুশল মানি' — এই দ্বিতীয় পঙক্তিটি যক্ষের পক্ষে অচিন্তনীয়, অথচ ওটি না-থাকলে আমরা একে কবিতাই বলতাম না। পরিচিত ব্যক্তিরা পথে দেখা হ'লে কুশলপ্রশ্ন করেন, প্রেমিকেরাও প্রত্যহ তা করতে পারেন ; কিন্তু যে-গুণে দ্বিতীয়টিকে আমরা প্রেমের ভাষা ব'লে চিনতে পারি তার বাণীরূপ আমরা দেখতে পাই — কালিদাসে নয়, এই বৈষ্ণব কবিতায়। 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার ভাষা ব্যবহার ক'রে বলতে পারি, যক্ষের মুখে যা ছিলো তর্ক, বৈষ্ণব কবিতায় তা হ'য়ে উঠলো গান। আর রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নটি গানের চেয়েও বেশি — তা একটি পরম ব্যর্থতাবোধের নগ্ন উচ্চারণ।

লক্ষণীয়, প্রশ্নটি উক্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে 'স্বপ্ন' কবিতার নায়ক-নায়িকা দু-জনেই ভাষা ভুলে গেলো — 'সেই ভাষা', যাতে, আমরা অনুমান করতে পারি, কোনো-এক কালে তারা পরস্পরকে প্রিয় নামে ডাকতো ; বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা ক'রেও পরস্পরের নাম পর্যন্ত মনে আনতে পারলো না তারা। একবার শুধু হাতের স্পর্শ, নিশ্বাসের সংমিশ্রণ, তারপর —

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

একটি নিঃশেষ শূন্যতার মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের মতো মিলিয়ে গেলো কবিতাটি, আমাদের মনে প'ড়ে গেলো যে কবিতাটির নাম 'স্বপ্ন' — স্বপ্ন, বাস্তব নয়, কিন্তু পরাবাস্তব, যে-স্বপ্ন থেকে কোনদিনই আমরা সম্পূর্ণভাবে জেগে উঠতে পারবো না। এই 'অন্ধকার' শুধু রাত্রির নয় — বিরহের, বিস্মরণের, এক অনাদি ও অনন্ত বিরহের। এই তৃষ্ণা এমন যা কোনোদিন মিটবে না, এই প্রিয়া এমন যে স্পর্শমাত্রে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। কবিতার এই শেষ অংশেই রবীন্দ্রনাথের চরিত্র প্রকাশ পেলো, ঘোষিত হ'লো রোমান্টিক আর্টের বিজয়গৌরব।

৫

মানতেই হয়, 'মেঘদূতে'র যক্ষ একজন লিবিডোভারাতুর জীব, তার প্রেমের ধারণা শৃঙ্গারবাসনায় সীমাবদ্ধ। তাকে প্রেমিকরূপে, বিরহীরূপে, উপস্থাপিত করার চেষ্টা আজকের দিনে কিছুতেই সার্থক হবে না, বরং তার কামাতুরতা স্বীকার ক'রে নিলেই কাব্যটিকে আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারবো। এই স্বীকৃতি মনে রেখে, আমরা যখন গভীরভাবে বার-বার 'মেঘদূত' পড়ি, তখন কাব্যটির আর-একটি দিক আস্তে-আস্তে খুলে যেতে থাকে ; আমরা দেখতে পাই, কালিদাস যক্ষের মুখে যা-কিছু কথা বসিয়েছেন তার প্রায় প্রত্যেকটি তার রুদ্ধ রতির ব্যঞ্জনা দিচ্ছে। আটমাসব্যাপী সম্ভোগের অভাবে, সে এখন যে-দশা প্রাপ্ত হয়েছে তার নাম দেয়া যায় নিখিলকামুকত্ব ; সব চিন্তা, সব স্মৃতি তার মনে যৌন চিত্রকল্প জাগিয়ে তুলছে ; তার কাম, যথাযথ পাত্র থেকে বঞ্চিত হ'য়ে, নিসর্গে ছড়িয়ে পড়লো। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের পর' কবিতারও এ-ই বিষয় ; তার শেষ স্তবকে 'মেঘদূতে'র অবদান সুস্পষ্ট, এবং প্রথমে দুই পঙক্তি কুমার : ৪ : ২৭-এর পুনর্লিখন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুভব ভিন্ন, মদন বিষয়ে তাঁর ধারণাও আলাদা। আধুনিক কবি যাকে বায়বীয় নির্যাসে পরিণত করেছেন, কালিদাসে আমরা পাই তার রক্তমাংসনির্ভর আকার ও আকৃতি। 'মেঘদূতে' যৌনতার উল্লেখ যে এত বেশি, তার কারণ দেখাতে হ'লে শুধু আদিরসের প্রতি সংস্কৃত কবিদের সাধারণ দুর্বলতার উল্লেখ করলে চলবে না, এ-কথাও মনে রাখা চাই যে যক্ষ তার রমণতৃষ্ণায় সর্বভূতে ঈপ্সিতকে বিম্বিত ক'রে তুলছে। অর্থাৎ, 'মেঘদূতে' যৌনতা একটি বিষয়গত সার্থকতা পেয়েছে, কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে তা সম্পৃক্ত ; মেঘ যে এখানে যক্ষেরই প্রতিভূ বা দ্বিতীয় সত্তা, তার পুরুষত্ব ও কামুকত্বের প্রতি পৌনঃপুনিক ও বিচিত্র উল্লেখে তার প্রমাণ পাই। পূর্ব-মেঘের ভূগোল ও উত্তরমেঘের অলকা — সবই যক্ষের কামনায় অনুরঞ্জিত, যে-সব দৃশ্য আমরা দেখছি তাদেরও মধ্যে তার অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে বা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। পথে-পথে প্রতিটি পর্বতচূড়ায় মেঘের জন্য বিশ্রামের নির্দেশ আছে ; সেই পর্বতসমূহ যে নারীর স্তনের প্রতিরূপ, তা প্রথম সুযোগেই ব'লে দিতে কবি ভোলেননি :

প্রান্ত ছেয়ে আছে আম্রবনরাজি, ঝলক দেয় তাতে পক্ব ফল,

> স্বর্ণে চিক্কণ বেণীর মতো তুমি আরূঢ় হ'লে সেই শৃঙ্গে —
> দৃশ্য হবে যেন ধরার স্তনতট, অমরমিথুনের ভোগ্য,
> গর্ভসূচনায় মধ্যে কালো আর প্রান্তে পাণ্ডুর ছড়ানো। (পৃ ১৮)

'গর্ভিণীর স্তন'* ব'লে ব্যাপারটিকে আরো বিশদ করা হ'লো — এরও আগে বকপঙ্ক্তির গর্ভাধানের উল্লেখ আছে (পৃ ৯), আছে শিলীন্ধ্রবতী পৃথিবীর উর্বরতার কথা (পৃ ১১), এবং 'মেঘদূতে' অন্য যে-সব পশুপক্ষী দেখা যায় তাদের প্রায় সকলেরই মৈথুনঋতু বর্ষা, কাকাদির নীড়নির্মাণ ও হস্তীর মদস্রাবেও যক্ষের কামনা প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন পর্বতে বিশ্রাম, তেমনি মেঘ পথে-পথে নদীসমূহে অবতরণ করবে ; তার এই কর্মে খুবই স্পষ্টভাবে রতিক্রিয়ার ছবি আঁকা হ'লো — একবার নয়, বার-বার — মেঘ নায়করূপে এই ভিন্নপ্রকৃতি নদীনায়িকাদের তৃপ্তিসাধন ক'রে নিজেও পরিতৃপ্ত হচ্ছে। কোনো নদীর ঢেউ রূপসীর ভ্রূভঙ্গির মতো, কোনো নদী তার ঘূর্ণিরূপ নাভি দেখাচ্ছে, কেউ বিরহে কৃশ, কারো বায়ু মিলনোৎসুক প্রিয়ের মতো চাটুকার, কারো বায়ুতে যুবতীর জলকেলির সৌরভ ভেসে আসছে, আর কারো বা

> বসন ধ'রে আছে শিথিল হাতে যেন, তেমনি ঝুঁকে আছে বেতের শাখা,
> মুক্ত কোরো, সখা, তটনিতম্বেরে সরিয়ে দিয়ে নীল-সলিল-বাস ;
> সহজে প্রস্থান হবে না সম্ভব, তুমি যে তার 'পরে লম্বমান,
> বিবৃতজঘনার স্বাদেক পেলে স্বাদ কে আর পারে, বলো, ছাড়াতে ! (পৃ ৪২)

'লম্বমান' কথাটি মূলেই আছে — এখানে কালিদাসের রচনা চিত্রকল্পের সীমা পেরিয়ে একেবারে বাস্তব আলেখ্য হ'য়ে উঠলো। যেখানে-যেখানে প্রসঙ্গ ভিন্ন তেমন অনেক স্থলেও মল্লিনাথ আদিরসাত্মক ধ্বনি আবিষ্কার করেছেন, তাছাড়া আমরা শাদা চোখেও দেখতে পাই যে 'মেঘদূত' কাব্যটি যৌনধর্মের প্রভাবে একেবারে পূর্ণ ও পরিস্ফীত ; কী পূর্বমেঘে, কী উত্তরমেঘে, নারী ও রতিপ্রসঙ্গের উল্লেখ বহুলপরিমাণে অত্যধিক ; বনবধূ, গ্রামবধূ, পুষ্পচায়িকা, পুরস্ত্রী, বারাঙ্গনা, নর্তকী, যক্ষনারী, দেবকন্যা, কাউকে কবি বাদ দেননি — কোথাও শিলাগৃহে বেশ্যাবিলাসীদের মত্ত যৌবন ব্যক্ত হচ্ছে, কোথাও স্নানার্থিনী স্বর্গযুবতীরা মেঘকে বাহুবেষ্টনে ধ'রে রাখতে চায়,

---

* মূলে শুধু বলা হয়েছে 'পৃথিবীর স্তনের মতো' (স্তন ইব ভুবঃ), কিন্তু 'মধ্যে শ্যামঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ' — এই বর্ণনায় গর্ভিণীর স্তনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ব'লে আমি অনুবাদে 'গর্ভ-সূচনায়' শব্দটি যোগ ক'রে দিয়েছি। — চতুর্থ সংস্করণের পাদটীকা।

কোথাও গঙ্গা স্খলিত হচ্ছে অরুণায়িনী প্রণয়িনীর বসনের মতো, আর কোথাও বা মেঘ অগোচরে প্রবেশ ক'রে অন্তঃপুরিকাদের 'মঙ্গলকণিকা'য় দূষিত ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে। আর যে-সব স্থলে অভিসার, প্রমোদ, রতি-ক্রিয়া ও উত্তরক্লান্তি প্রত্যক্ষভাবে চিত্রিত হয়েছে তাদের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত, সমগ্র 'মেঘদূতে' এমন শ্লোকের সংখ্যা অল্পই, যাদের বিষয় সম্পূর্ণরূপে অযৌন। এর ফলে কাব্যটি ক্লান্তিকর হ'তে পারতো — তা যে হয়নি তাতেই বোঝা যায় কালিদাসের রচনা কত পরাক্রান্ত। পূর্বে বলেছি যক্ষ কামুকমাত্র ; এখন যোগ করবো যে তার কাম এমন পরিশীলিত, বহুমুখী ও দ্যুতিময় যে তা-ই, শুধু তা-ই অবলম্বন ক'রে একটি মহৎ কাব্যের সৃষ্টি হ'তে পারলো। এই অতিশয় পরিমিত বিষয়টির মধ্যে কালিদাস যেমন বৈচিত্র্য ও সরসতার সঞ্চার করেছেন, যেমনভাবে বহুক্ষণ ধ'রে আমাদের মনোযোগ নিবিষ্ট রাখতে পেরেছেন, বিশ্বসাহিত্যে তার কোনো তুলনা আমার জানা নেই। কালিদাসের নিজেরই কাব্যের মধ্যে 'ঋতুসংহার', 'কুমারসম্ভব' অষ্টম সর্গ ও 'রঘুবংশ' শেষ সর্গ প্রধানত বা সম্পূর্ণত আদিরসাত্মক (তিনটিকেই তাঁর রচনা ব'লে ধ'রে নেয়া যাক), কিন্তু এর একটিও আমরা দ্বিতীয়বার পড়বার জন্য অত্যন্ত বেশি উৎসাহ বোধ করি না। অথচ 'মেঘদূতে'র সঙ্গে আমরা যত বেশি ঘনিষ্ঠ হ'তে পারি, তত বেশি আনন্দ পাই। তার একটি কারণ এই যে কাম এখানে রোমান্টিক বেদনায় রূপান্তরিত না-হ'লেও বিশ্বের পটভূমিকায় বিন্যস্ত হয়েছে, যক্ষের মানসরমণে অংশ নিচ্ছে রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত সমস্ত জড় ও জীবজগৎ। কামের এই বিশ্বরূপ পৃথিবীর অন্য কোনো কাব্য আমাদের দেখাতে পারেনি।

কালিদাস কোন উপলক্ষে কোন অবস্থায় 'মেঘদূত' লিখেছিলেন, এর পিছনে কোনো ব্যক্তিগত বেদনা তাঁর ছিলো কিনা — কোনো বিচ্ছেদ, কোনো নির্বাসন, কোনো প্রতিপালক রাজার বিরূপতা — সে-সব আমরা জানি না এবং জানবো না কোনোদিন। কিন্তু আমরা লক্ষ করি যে এই কাব্যের কাহিনীর সূত্রটি তাঁর নিজেরই উদ্ভাবিত — কোনো পুরাণ বা ইতিহাস থেকে আহৃত নয় — এবং শুধু তাঁর রচনার মধ্যেই নয়, সারা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেই এই ধরনের মৌলিক রচনা বিরল। এবং 'মেঘদূত', ভূগোল ও প্রাণীলোক থেকে অজস্র উপাদান আহরণ ক'রেও, শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে একটি ব্যক্তিগত আবেদন সংক্রমিত করে, সংস্কৃত ভাষায় যতটা সম্ভব ততটাই। সেইজন্যেই

যক্ষের বেদনা আমাদের প্রগল্‌ভ ব'লে মনে হয় না, উত্তরমেঘের শেষাংশে আমাদের প্রতীতি জন্মে যে যক্ষ সত্যি-সত্যি কষ্ট পাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ অনেক : সে তার প্রিয়াকে 'একপত্নী' বা সাধ্বী ব'লে ঘোষণা করলেও নিজেকে মুখ ফুটে কখনো অনন্যমুখী বলছে না (যদি না উ ১১৫-র সে-রকম অর্থ করা যায়) ; তার মনে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার চেয়ে করুণার ভাবই প্রবল ; আত্মকরুণাকে সে প্রশ্রয় দেয় মাঝে-মাঝে, তার নির্বাসনের দুঃখকে কোনো বৃহত্তর অর্থে মণ্ডিত করতে পারে না। কিন্তু তবু, অলকায় আসার পর থেকে কাব্যটি যেন ধীরে-ধীরে মর্মস্পর্শী হ'য়ে ওঠে ; আমরা ক্রমশ অনুভব করি যে যক্ষের বিলাপের মধ্যে শুধু অলংকার- ও রতিশাস্ত্রের নিয়মরক্ষা করা হয়নি, একটি অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। হ'তে পারে সে-অভিজ্ঞতা আর-কিছু নয়, ইন্দ্রিয়দমনের ক্লেশ — কিন্তু কালিদাস তাকেই দুঃখের মর্যাদা দিতে পেরেছেন, তাতে অর্পণ করেছেন একটি স্নিগ্ধগম্ভীর সৌন্দর্য ও কারুণ্যের উদ্ভাস। ইতিপূর্বে 'মেঘদূত' বিষয়ে 'সমলয়সম্পন্ন' বিশেষণটি প্রয়োগ করেছি — অর্থাৎ তার গতি কোথাও দ্রুততর হয় না, কোন বিষয়ে কতটুকু বলা হবে কবি তা ঠিকমতো মেপে নিয়েছেন — অথচ, যক্ষের নিজ ভবনের প্রসঙ্গ থেকে শুরু ক'রে আমরা যেন মনে-মনে অন্য একটি সুর শুনতে পাই, একটি গাঢ়তর নিস্বন, কবিতার আন্তরিক ছন্দ বদলে গেলো যেন, হ'য়ে উঠলো — ঐ কৃত্রিম ভঙ্গির সব দাবি মিটিয়ে দিয়েও — বিশেষ কোনো মুহূর্তে কোনো-এ ক জ ন মানুষের উচ্চারণের মতো। একই মন্দাক্রান্তার কাঠামোর মধ্যে এই ধরনের স্বরভেদ আগেও দু-একবার লক্ষ করেছি — যেমন উজ্জয়িনীর নারী বা শিবমন্দির, বা অলকার প্রসঙ্গে — কিন্তু অন্য কোথাও যক্ষের ব্যক্তিত্বকে এমন স্পষ্টভাবে আমরা উপলব্ধি করি না, যেমন যক্ষপ্রিয়ার অবতারণার পরে। দ্বারপার্শ্বে শিশু মন্দার, সরোবর, প্রমোদশৈল, ময়ূর ও সারিকা — আমাদের পূর্বপরিচিত বিলাসদ্রব্যসমূহ এই প্রথম বার স্মৃতি ও বেদনার সংযোগে তৃতীয় আয়তন লাভ করলো। যক্ষ তার পত্নীর কথা ভেবেই অধিকতর ব্যাকুল হচ্ছে ; কিন্তু পত্নীর শোচনীয় দশা দেখে আমাদের মনে যক্ষেরই প্রতি অনুকম্পা জাগে, তার 'জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্'-এর গাঢ় কণ্ঠস্বরকে আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না ; আর তারপর তার বার্তা, তার আশ্বাসবাক্য, তার হৃদয়গ্রাহী অভিজ্ঞান — সবই আমাদের বাধ্য করে তার কামনার প্রতি সশ্রদ্ধ হ'তে ; যে-শুভানুধ্যায়ী বন্ধুতা মেঘের

কাছে সে প্রার্থনা করছে তা আমরা তাকে দেবার জন্ত উৎসুক হই। ততক্ষণে মেঘের সঙ্গে আমরা একাত্ম হ'য়ে গিয়েছি (পূর্বমেঘে মেঘ আমাদের দ্রষ্টব্যের বেশি কিছু নয়) — প্রমোদশৈলের সানুদেশ থেকে যক্ষপ্রিয়াকে লক্ষ করি আমরাই, আমরাই অতি মৃদুভাবে ঘুম ভাঙাই তার, ধীরে-ধীরে যক্ষের কথা নিবেদন করি তার কাছে। কিন্তু এই দীর্ঘ ব্যাপারের পরে, উপান্ত্য শ্লোকে যক্ষের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এলো — যে-মেঘের মুখ দিয়ে এত কথা সে বলিয়ে নিলো, সেই মেঘ তার কথার কোনো উত্তর দিলো না। কেমন ক'রে দেবে? সে যে জড় বস্তু। যক্ষ মুখে বলছে বটে — 'উত্তর না-পেলেও আপনার ধীরতায় সন্দিহান হবো না'— কিন্তু মনে-মনে সে জানে — আর আমাদেরও বুঝতে দেয় — যে এতক্ষণ ধ'রে সে শুধু একটি নাটকের অভিনয় করলো, আসলে ব্যাপার কিছু নয়, বিশুদ্ধ মায়া, আত্মসম্মোহন। আমরা অনিচ্ছুকভাবে উপলব্ধি করি যে যক্ষ পয়লা আষাঢ় তারিখে রামগিরিতে দাঁড়িয়ে এই শতাধিক শ্লোক আবৃত্তি ক'রে গেলো হয়তো মেঘের উদ্দেশে, কিন্তু আসলে তার আপন মনে — তার একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি এটি, এ থেকে অন্য কিছুতে পৌঁছনো যাবে না, আর-কিছুই থাকতে পারে না এর পরে। আর তৎসত্ত্বেও, কাব্যের প্রভাব এত প্রবল যে মেঘের এই কল্পিত অভিযান — আসলে যা যক্ষেরই একটি স্বরচিত স্বপ্নমাত্র — তাকেই আমরা 'সত্য' ব'লে অনুভব করি।

৬

আশাতীতের নিরন্তর প্রত্যাশা— এই হ'লো রোমান্টিক আর্টের সারাৎসার। আশাতীত মানে আজগুবি নয়, ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্ন নয়; আশাতীত মানে সেই সব গোপন সম্বন্ধ যা সাধারণ বুদ্ধির ধারণার মধ্যে আসে না, কিন্তু কবির কাছে যার সম্ভবপরতা তর্কাতীত। রোমান্টিকতার দাবি এই যে কবিতা হবে সন্ধানধর্মী, আবিষ্কারপ্রবণ; বিশ্বের আপাতবিদৃশ বস্তুরাশি — আমাদের ব্যবহারিক জীবনে চিরকাল যারা পরস্পরের সুদূর ও অপরিচিত হ'য়ে থাকে — তাদের মধ্যে স্থাপন করবে একটি ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্বন্ধ। এ-ভাবে দেখলে, রোমান্টিকতা শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন আর থাকে না; তা হ'য়ে ওঠে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের একটি চিরকালীন ধারা, যার লক্ষণ আমরা বৈদিক স্তোত্রেও দেখতে পাই মাঝে-মাঝে, কিন্তু কালিদাসের স্বভাবধর্মী

মানস যাকে দৃপ্তভাবে অস্বীকার করে। কোলরিজ তাঁর 'কুবলা খান' কবিতায় যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সাযুজ্য নেই ; 'stately pleasure-dome', 'caverns measureless to man', 'woman wailing for her demon-lover', 'ancestral voices prophesying war' — এগুলোর মধ্যে কোনো কার্যকারণঘটিত যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই না : কিংবা, কবিতার শেষে, কোলরিজ এ-কথাও কবুল করেননি যে এটি স্বপ্নমাত্র, এই অসম্ভব সমাবেশরচনার জন্য তাঁর একতিল জবাবদিহি নেই। অথচ আমাদের মনের কাছে যা ধরা পড়ে তা শুধু সমাবেশ নয়, একটি গভীর সমন্বয়, যুক্তির অতীত কোনো শৃঙ্খলার বলে এই স্বভাব-বিশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ এমন একটি একতায় আবদ্ধ হয় যে কবিতাটির একটি কথাও হারাতে, সরাতে বা বাড়াতে আমরা রাজি হই না। আমরা ইতিহাস প'ড়ে জেনেছি যে কবিতাটি অসমাপ্ত, কিন্তু তাকে অসম্পূর্ণ ব'লে অনুভব করি না ; বরং 'দি এনশেন্ট ম্যারিনার'-এর খেদজনক সমাপ্তি* স্মরণ ক'রে, ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করি 'কুবলা খান'-এর রচনা আর অগ্রসর হয়নি ব'লে।

পক্ষান্তরে, 'মেঘদূতে' যে-একটিমাত্র স্বভাববিরোধী তথ্য আছে, তার জন্য কালিদাস আমাদের বুদ্ধির কাছে ওকালতি করেছেন ; স্পষ্ট বলেছেন যে মেঘকে সচেতন ব'লে কল্পনা করাটা যক্ষের ভ্রান্তিমাত্র, আর যক্ষ নিজেও যে তার প্রার্থনাকে 'অনুচিত' বলে জানে তা কাব্যের অন্তিম শ্লোকে স্পষ্ট বলা আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যক্ষ তার স্বপ্ন বিষয়ে সংশয়ী, আর 'কুবলা খান'-এ কোলরিজ (যেমন 'স্বপ্ন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ) তাঁর স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান। কবিতার দুই ভিন্ন জাতের চরম নমুনা ব'লে এ-দুটিকে স্বীকার ক'রে নিতে পারি আমরা ; 'কুবলা খান' যেমন কোনোখানেই লজিকনির্ভর যুক্তিকে স্বীকার করে না, তেমনি 'মেঘদূতে' এমন কিছু নেই যা লজিকের বশবর্তী নয়। কথাটা আরো পরিষ্কার হবে 'মেঘদূতে'র উপমা ও উৎপ্রেক্ষা ভালোভাবে পরীক্ষা করলে। কালিদাসের উপমার মধ্যে — তার আবহমান খ্যাতি সত্ত্বেও — আমরা প্রধানত দেখতে পাই — কবির স্বকীয় কোনো দৃষ্টি নয়, কবিপ্রসিদ্ধির বিশিষ্ট ব্যবহার।

* এই কথাটা লিখে না রাখলে আমি নিজের প্রতি অবিচার করবো যে উক্ত কবিতার সমাপ্তি আমার এখন আর খেদজনক বলে মনে হয় না। — পঞ্চম সংস্করণের টী।

চকিত হরিণীর মতো দৃষ্টি, ভ্রমরপঙক্তির মতো কটাক্ষ, বিম্বফলের মতো অধর, কদলীকাণ্ডের মতো উরু, পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকের মতো স্তন — এই সবই পুনরুক্তির ফলে মুখস্থ-করা বুলির মতো হ'য়ে গেছে, কিন্তু কালিদাস এই চিহ্নিত পুঁজির বাইরে দৃষ্টিপাত করতে রাজি নন। অথচ এমনও বলা যায় না যে এ-সব উপমার নির্বিশেষ চরিত্র বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন ; অন্তত এক স্থলে মনে হয় যেন কবিপ্রসিদ্ধির পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ক্লান্ত হ'য়ে, তিনি নিজেই নিজের অভ্যাসকে সূক্ষ্মভাবে বিদ্রূপ করেছেন। 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সর্গে তরুণী উমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথারীতি বর্ণনা দিতে-দিতে, কবি হঠাৎ যেন থমকে গিয়ে বলছেন :

> নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদেকান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ।
> লব্ধাপি লোকে পরিণাহি রূপং জাতাস্তদূর্বোরুপমানবাহ্যাঃ॥ (১ : ৩৬)

অর্থাৎ — হাতির শুঁড় কর্কশ, কলাগাছ ঠাণ্ডা ; অতএব এরা লোকসম্মত হ'লেও উমার উরুর উপমান হ'তে পারে না (কেননা তা স্পর্শে কোমল ও কবোষ্ণ)। কিন্তু এই উপলব্ধির ফলে নতুন কোনো উপমা তিনি যে ব্যবহার করেননি এতে বোঝা যায় সমকালীন কাব্যাদর্শের তিনি কতদূর অধীন ছিলেন, কতদূর ইতিহ্যনির্ভর, প্রচলবিশ্বাসী।

অবশ্য আমরা সঠিকভাবে জানি না, কালিদাসের উপমাদির কতটা অংশ তাঁরই সময়ে কবিপ্রসিদ্ধি ব'লে গণ্য ছিলো, আর কতটা অংশ (যদি তেমন কিছু থাকে) তাঁর রচনার প্রভাবেই কবিপ্রসিদ্ধিতে দাঁড়িয়ে যায়। বাল্মীকিতে ও অশ্বঘোষে এমন অনেক উপমা ও বাক্যাংশ আছে যা কালিদাস নানা ভাবে নানা স্থলে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রতিটি উপমাই পূর্বসূরিদের ভাণ্ডার থেকে চয়িত কিনা, এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমার জানা নেই*। হয়তো তা-ই, হয়তো বা তা নয় ; হয়তো অনেক উপমা, পরে যা ধরা বুলিতে পরিণত হয়, তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেন — কিন্তু এই সম্ভাবনাকে স্বীকার ক'রে নিয়েও বলতে হয় যে তাঁর কোনো উপমায় এমন কিছু নেই যা প্রথাসিদ্ধ নয়, আকস্মিক নয়, অলংকারধর্মী নয়। বস্তুর সঙ্গে ভাবনার, পরিচিতের সঙ্গে দূরবর্তীর, মূর্তের সঙ্গে অমূর্তের তিনি তুলনা করেন না ; যে-সব বস্তু কোনো-

* অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ত্রয়ী' গ্রন্থে ও অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাল্মীকি ও কালিদাস' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬) দেখিয়েছেন, উপমাদি বিষয়ে বাল্মীকির কাছে কালিদাসের ঋণ অগণ্য।

না-কোনো স্বাভাবিক লক্ষণগুণে পরস্পরের অনুরূপ, শুধু তাদেরই একসূত্রে বাঁধেন; বিশ্বের মধ্যে লুকানো কোনো সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন না, যা প্রতীয়মান তাকেই মনোরম ক'রে তোলেন। 'মেঘদূতে'র যে-সব উপমা বিশেষভাবে মনোমুগ্ধকর তাদের বলা যায় চিত্রধর্মী সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ছবি হিশেবে তারা ভোলবার নয়, কিন্তু তারা কোনো অপ্রত্যাশিতের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে না।

মহান তার চূড়া ব্যাপ্ত করে নভে শুভ্র কুমুদের কান্তি,
নিত্য-জ'মে-ওঠা অট্টহাসি যেন রাশীকৃত করেছেন ত্র্যম্বক। (পূ ৫৯)

স্বল্পবিলসিত আভাসে মেতে, জ্বলে যেমন জোনাকির পুঞ্জ,
তেমনি বিজলির স্ফুরিত দৃষ্টিতে তাকাবে ভবনের মধ্যে। (উ ৮৪)

বিরহশয্যায় শুয়েছে একপাশে, শীর্ণ তনু মনোকষ্টে,
পূর্বাকাশে যেন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের শেষ কলা উদিত — (উ ৯২)

মেঘলা দিনে যেন মলিন কমলিনী, জেগেও নেই, নেই ঘুমিয়ে। (উ ৯৩)

স্রস্ত কুন্তলে রুদ্ধ বিস্তার, স্নিগ্ধকজ্জলশূন্য,
সুরার পরিহারে ভুলেছে ভ্রূবিলাস, এমন বাম আঁখি মৃগাক্ষীর —
তোমার আগমনে ঊর্ধ্ব কম্পনে যে-শোভা করি তার অনুমান,
তুলনা সে-রূপের ক্ষুব্ধ মৎস্যের আঘাতে চঞ্চল কুবলয়। (উ ৯৮)

এর প্রতি ক্ষেত্রে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে একটি দৃশ্যমান সাদৃশ্য রয়েছে; তুষার শুভ্রবর্ণ, সংস্কৃত প্রথানুসারে হাস্যও তা-ই; তাছাড়া মহাদেব কৈলাস-বাসী, তাঁর অট্টহাসি কল্পনা করতে গেলে আমাদের মনে বিরাটের ভাব জেগে ওঠে; কৈলাসের তুঙ্গ ও ধবল চূড়া তাঁর সঙ্গে একাধিক অনুষঙ্গে জড়িত। তেমনি, জোনাকি ও বিদ্যুতের চমক, বিরহিণী ও শীর্ণ চাঁদ, দুঃখিনী ও মেঘলা দিনের পদ্ম, ক্ষুব্ধ নীলপদ্ম ও কালো চোখের চঞ্চলতা — এই যুগলসমূহ একই ধরনে করুণ বা প্রিয়দর্শন, এদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা ভাবগত দূরত্ব নেই। দান্তের উপমা ফিরিয়ে এলিয়ট যা বলেছেন এদের বিষয়ে তা-ই বললে হয়তো ভুল হয় না; এদেরও উদ্দেশ্য দৃশ্যগুলিকে আমাদের মনের সামনে আরো সুনির্দিষ্ট ক'রে তোলা, আরো স্পষ্ট ক'রে আমাদের দেখানো। কিন্তু দান্তের যে-উপমাটি এলিয়টকে (আর তাঁর আগে ম্যাথু আর্নল্ডকে) মুগ্ধ

করেছিলো, সেটিকে কালিদাসের সধর্মী বলা যায় না। নরকের ঘোলাটে আলোয় পাপীর দল আগন্তুক দু-জনের দিকে তাকাচ্ছে—

Knitting up their brows they squinnied at us
Like an old tailor at the needle's eye.

(ইনফের্নো : ১৫। পেঙ্গুইন অনুবাদ।)

এর অব্যবহিত পূর্বে, একই বিষয়ে, আর-একটি উপমা পাওয়া যায় :

Hurrying close to the bank, a troop of shades
Met us, who eyed us much as passers-by
Eye one another when the daylight fades
To dusk and a new moon is in the sky—

কোথায় নরকের পাপীর মিটমিটে চোখ, আর কোথায় বুড়ো দরজির ছুঁচে সুতো পরানো! সন্ধ্যায় যখন প্রতিপদের চাঁদ উঠেছে, সেই স্বল্প আলোয় আমরা হয়তো পরিচিতকেও হঠাৎ ঠিক চিনতে পারি না, কিন্তু এই দৃশ্যের মধ্যে এমন কোনো বীভৎস বা ভীতিকর ভাব নেই, যাতে নরকের কথা আমাদের মনে পড়তে পারে। কর্মিষ্ঠ বুড়ো দরজি আমাদের শ্রদ্ধা ও করুণা জাগায়, আর সান্ধ্যলগ্নটিকে আমরা রমণীয় ব'লেও অনুভব করতে পারি; নরকবর্ণনায় এ-দুটি প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে দান্তে যে-সব তথ্যের মধ্যে যোগসাধন করেছেন, তাঁর কাব্য রচিত হবার আগে সেগুলোকে একত্র ক'রে বা সম্পৃক্তভাবে কেউ কোনোদিন দেখতে পায়নি, বা দেখতে পাওয়া সম্ভব ছিলো না। এই উপমা দুটিতে শুধু যে বর্ণিতব্য বিষয় স্পষ্ট হয়েছে তা নয়, মানুষের অনুভূতির সীমান্ত প্রসারিত হ'লো।

Full fathom five thy father lies :
Of his bones are coral made ;
Those are pearls that were his eyes ;

এই কাব্যাংশের আবেদন কোন গুণে এমন অন্তহীন ও বিচিত্র? একে ছবির গুণে সমৃদ্ধ বলা যায় না (যা কালিদাসের শ্রেষ্ঠ উপমাকে সর্বদাই বলতে পারি); মৃত মানুষের হাড়ের সঙ্গে প্রবালের, বা চোখের সঙ্গে মুক্তোর আকৃতি- বা বর্ণগত সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট নয় (প্রেয়সীর অধরের সঙ্গে প্রবালের ও দাঁতের সঙ্গে মুক্তোর তুলনাই শেক্সপিয়রের সমকালীন কাব্যে চলিত ছিলো)। কিন্তু এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যে-প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে তার ফলে এই ক্ষুদ্র গীতিকাটি প্রাণধর্মে বেগবান হ'য়ে উঠেছে : প্রবাল

ও মুক্তো সামুদ্রিক বস্তু ব'লে জলমগ্ন নাবিকের সহবাসী : উভয় বস্তুই প্রাণীর দেহনির্গত ক্ষরণ, মৃত্যুর উপজাতক — অথচ দুটোকেই, বর্ণ, আকৃতি ও দুষ্প্রাপ্যতার গুণে, মানুষ মূল্যবান ব'লে জ্ঞান করে। ফলত, 'coral' ও 'pearl' শব্দ দুটিতে আমরা যখন মৃত্যুর প্রতিধ্বনি শুনছি, তখনই তারা আমাদের মনকে প্রস্তুত ক'রে তোলে পরবর্তী 'rich and strange' বিশ্লেষণ দুটির অভিঘাতের জন্য — ফ্রেমে-বাঁধানো পরিষ্কার কোনো ছবি পাচ্ছি না, কিন্তু মগ্ন নাবিকের এই আশ্চর্য 'সিন্ধু-রূপান্তর', স্বল্প কয়েকটি ইঙ্গিতে, আমাদের মনে ক্রমবর্ধমান বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

নারীদেহের বর্ণনায় সংস্কৃত কবিরা অক্লান্ত, তার কোনো-কোনো অংশের প্রশংসাতেও ভারতীয় সমালোচকেরা ক্লান্তিহীন। কিন্তু এই প্রসঙ্গেও — পূর্বেই বলেছি — উপমাদি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও পরিমিত ; প্রতি অঙ্গের জন্য, কয়েকটি বাঁধা-ধরা উপমান আছে, সেগুলোকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করতে কালিদাসও লজ্জাবোধ করেন না।

> আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো-বসানা তরুণার্করাগম্।
> পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনীলতেব॥ (কুমার : ৩ : ৫৪)

যাঁরা অল্পস্বল্প সংস্কৃত কবিতা পড়েছেন, তাঁরাও এই বিখ্যাত শ্লোকে দেখতে পাবেন — একটি পুনরাবৃত্তি মাত্র, যা পদলালিত্যের গুণে চমৎকারিত্ব পেয়েছে ; অল্প একটু চেষ্টা করলেই এই একই চিত্ররূপের বহু ভিন্ন-ভিন্ন প্রকরণ অন্যান্য কবির ও কালিদাসের নিজের রচনা থেকে উদ্ধার করা যায়। (মাত্র কয়েক শ্লোক আগে [কুমার : ৩ : ৩৯] এই লতার প্রসঙ্গেই 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ' পাওয়া যায়, এবং 'রঘুবংশ' ১৩ ৩২-এও অশোকলতাকে বলা হচ্ছে 'তন্বীং স্তনাভিরাম স্তবকাভিনম্রাম্'।) কোনো উপমাই এমন নয় যাতে আমরা ভাষার পিছনে ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যাতে কালিদাসের স্বকীয় বা অনন্য কোনো দৃষ্টি ধরা পড়ে। সে-রকম দৃষ্টি থাকলে, নারীদেহের মতো 'ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত' প্রসঙ্গেও কল্পনার কত বড়ো ব্যাপ্তি ধরা দিতে পারে, তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

> দুটি জানু, চাঁদের মতো, শঙ্খ বেয়ে উঠলো উপরে,
> উরুর সীমান্ত-মেঘে ডুব দিলো ;
> জঙ্ঘার কৃশ ছায়াটি হঠলো পিছনে,
> পা দুটি এলো এগিয়ে, উদ্ভাসিত,

আর দেহের সব ক-টি সন্ধি জীবন্ত হ'য়ে উঠলো
সুরাপায়ীদের কণ্ঠের মতো।

*   *   *

তারপর এই শরীরের অস্পষ্ট উন্মেষের মধ্যে
ঢুকে পড়লো প্রথম গা'ঢ নিশ্বাস, যেন প্রভাতী বায়ু।
শিরাবৃক্ষের কোমলতম ডালে-ডালে জাগলো গুঞ্জন,
আর তারপর আরম্ভ হ'লো
গভীরতর স্থানগুলিতে শোণিতের মর্মর।
আর এই বাতাস, প্রবল হ'তে-হ'তে, নিশ্বাসের সবটুকু ক্ষমতায়
তীব্র ঝাপটে ভ'রে তুললো সদ্যতন স্তন দুটিকে,
নিজেকে দিলো প্রবিষ্ট ক'রে তাদের মধ্যে, আর তারা
দিগন্তে-ভ'রে-ওঠা স্ফীত পালের মতো
হালকা মেয়েটিকে তীরে নিয়ে এলো ঠেলে।

('ভেনাসের জন্ম' : রাইনের মারিয়া রিলকে)

মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমা-ঘন এক পঁ চনে।

('সুন্দর জাহাজ' শার্ল বোদলেয়ার)

এরই পাশাপাশি উদ্ধৃত করি আমাদের অতিপরিচিত

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

'চাঁদের মতো মুখ'-এর চাইতে 'চাঁদের মতো জানু' অনেক বেশি সার্থক মনে হয় আমাদের কাছে, আর তার কারণ শুধু নূতনত্বের চমক ব'লেও মানতে পারি না। দেবী সমুদ্র থেকে উঠছেন (বতিচেল্লির চিত্র স্মরণীয়), জানুর অস্থি গোলাকৃতি, দিগন্তে যেমন চাঁদের উদয় পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবও তেমনি ; কিন্তু এই চাক্ষুষ সাদৃশ্যই এখানে সব কথা নয় ; জানুর প্রতি এই মনোযোগের কারণ, ঐ অঙ্গ চালনা ক'রেই তিনি তীরে উঠবেন, সকাল ভ'রে ফুটিয়ে তুলবেন 'ফুল আর ঘাস, উষ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত, / যেন আলিঙ্গন থেকে উঠে-আসা।'

এই গতির ভাবটিকেই ক্রমশ সোচ্চার ক'রে তোলা হচ্ছে: দেবীর জঙ্ঘা 'সুরাপায়ীদের কণ্ঠের মতো জীবন্ত', আর 'দিগন্তে-ভ'রে-ওঠা ভরা পালের মতো' তাঁর নূতন স্তন দুটি। একই রকম অযৌক্তিকের সাধনায় বোদলেয়ার এক তরুণীর জঙ্ঘাকে দুটি ডাকিনী ব'লে ভাবতে পেরেছিলেন, যাদের আন্দোলনে তীব্র কাম উদ্‌গীর্ণ হচ্ছে; জীবনানন্দ দেখতে পেয়েছিলেন এমন চোখ, যা নীড়ের মতো স্নেহে ও আশ্রয়ে পরিপূর্ণ। বিদিশার রাত্রির মতো চুল, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো মুখ, বা — আরো আশ্চর্য — 'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা' — কালিদাসের কাব্যাদর্শ অনুসারে এ-সব উপমার কোনো অর্থই করা যাবে না, কিন্তু আমাদের কাছে এদের অর্থ সব-কিছু। শ্রাবস্তী ও বিদিশা বিষয়ে তবু বলা যায় যে এই দুই নগর যেমন লুপ্ত, সুদূর, স্মৃতিভারাক্রান্ত, তেমনি কবির জীবনে বনলতা সেন নাম্নী নারী, কিংবা তিনি মানবীও নয়, এক স্বপ্নচারিণী, যাকে কখনো পাওয়াও যাবে না, ভোলাও যাবে না। কিন্তু উটের গ্রীবার সঙ্গে নিস্তব্ধতার সম্বন্ধ কী? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা যখন ভাষা খুঁজে পাই না, তখনও আমরা উপমাটিকে অত্যন্ত সংগত ব'লে অনুভব করি; এই উপমা আমাদের চিত্তবৃত্তিকে জাগ্রত ও কর্মিষ্ঠ ক'রে তোলে, তার প্রেরণায় বিশ্বের দুই সুদূরপরাহত বস্তুর মধ্যে সেতুবন্ধন সহজ হ'য়ে যায়।

> এই কথা বলেছিল তারে
> চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে — অদ্ভুত আঁধারে
> যেন তার জানালা'র ধারে
> উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।
>
> ('আট বছর আগের একদিন')।

বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে অনর্থক মনে হ'তে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতাটি যাঁর জানা আছে তিনি বুঝতে চাইলেই বুঝতে পারবেন যে 'উটের গ্রীবা' অদ্ভুত ব'লেই আশ্চর্যরকম সার্থক। মৃত ব্যক্তিকে আত্মহত্যার পরামর্শ দিয়েছিলো এই নিস্তব্ধতা; উটের চিত্রকল্পটিতে তারই ভয়াবহতা সূচিত হয়েছে, আত্মহত্যার প্রাক্‌কালে নৈশ স্তব্ধতার রোমহর্ষণ। আসলে, উটের গ্রীবার উপমেয় এখানে ঠিক নিস্তব্ধতা নয়, মৃত্যু — মৃত্যুই তার ভীষণ গ্রীবা বাড়িয়ে দিলো জানলা দিয়ে, পূর্ব-পঙক্তির 'অদ্ভুত' বিশেষণও কোনো-এক অজানার ইঙ্গিত দিচ্ছে। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে উট অচেনা জন্তু, উটের বাসস্থল মরুভূমি,

আকার বৃহৎ ও আকৃতি অসুন্দর—এই তথ্যগুলিতে, পুরো কবিতাটি প'ড়ে ওঠার পর, আমরা লক্ষ করি এক গম্ভীর ও অশুভ ইঙ্গিত, যা কবিতাটির মূল ভাবনাকে প্রগাঢ় ক'রে তোলে। যে-সাধর্ম্য আমরা কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশে খুঁজে পাই না, তার সামগ্রিক প্রভাবে আবিষ্ট হ'তে হয়।

ইঙ্গিতময় উপমার একটি শর্ত হ'লো এই যে উপমেয় ও উপমানে কোনো যান্ত্রিক যোগ থাকবে না, একটি তির্যকভাবে অন্যটির প্রান্ত ছুঁয়ে চ'লে যাবে। অবশ্য কোনো উপমাতেই দুই অংশে কোষ-তরবারি সম্বন্ধ থাকতে পারে না। 'চাঁদমুখ' বললে চাঁদের মনোহারিত্ব শুধু মনে পড়ে আমাদের, তার শৈত্য, গোলত্ব বা মৃত অবস্থা নয়; কিন্তু রোমান্টিক কবিতায় উল্লিখিত প্রসঙ্গেই কথা ফুরোয় না, তাকে আস্তে সরিয়ে দিয়ে উপমার অভিপ্রায় আরো দূরে উত্তীর্ণ হয়।

কুঁকড়ে আছে তারা, একটু নড়ে না,
নিশ্বাস নেয় লাল ঘুলঘুলিতে—
স্তনের মতো উষ্ণ।

র‍্যাঁবোর এই স্তবকে আমরা দেখতে পাই, উপমেয়ের স্থানচ্যুতির ফলে উপমা কত বেশি' বলতে পারে। কবিতাটির নাম 'উদ্‌ভ্রান্তেরা', বিষয় পাঁচটি দরিদ্রসন্তান, যারা রুটিওলার দোকানের বাইরে বুভুক্ষুভাবে দাঁড়িয়ে আছে, শীতের রাত্রে, কনকনে হাওয়ায়। ভিতরে সারি-সারি রুটি সেঁকা হচ্ছে, চুল্লির লাল ঘুলঘুলির দিকে মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে আছে তারা। সেই ঘুলঘুলিকে কবি বলছেন স্তনের মতো উষ্ণ। স্তনের মতো কেন? আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে চুল্লির ফোকরটা এখানে একটা ধাপ মাত্র, সেই ফোকরে তৈরি-হ'তে-থাকা রুটিগুলোই উপমানের আসল লক্ষ্য। উষ্ণ, নরম, টাটকা রুটিকে অনেক বিষয়েই 'স্তনের মতো' বলা যায়—এবং উভয় বস্তুই খিদে মেটায়, পুষ্টি দেয়, যা এই ক্ষুধিত শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো কথা।

রোমান্টিক আর্ট আমাদের শিখিয়েছে বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি দাসভাব থেকে মুক্ত হ'তে; তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূদের রচনায় আমরা দেখেছি, কেমন ক'রে কবির চিত্তে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমান্তরেখা ভেঙে যায়, সব বিপরীত অন্বিষ্ট হ'য়ে ওঠে, কবি আমাদের জন্য জয় ক'রে আনেন অজানাকে—যে-জয়ের উল্লাসে বোদলেয়ার অনুভব করেছিলেন এমন সব গন্ধ, যার

কোনোটি 'শিশুর মাংসের মতো (দেহের মতো, স্পর্শের মতো) তাজা', কোনোটি 'মুরজনিস্বনের মতো কোমল', কোনোটি বা 'প্রেইরির মতো সবুজ', আর এমন সব প্রতিধ্বনি যা 'রাত্রি ও স্বচ্ছতার মতো' সবুজ ও বিশাল। বোদলেয়ার-এর এই কবিতা লেখা না-হলে বালক-র‍্যাঁবো বলতে পারতেন না যে কবির পক্ষে দ্রষ্টা হবার উপায়ই হ'লো 'ইন্দ্রিয়সমূহের সুচিন্তিত বিশৃঙ্খলাসাধন', কিংবা রিলকে অফিয়ুসের গীতধ্বনিতে এমন এক বৃক্ষের 'দেখা' পেতেন না, যা কানের মধ্যে আরোহণকারী। কালিদাস থেকে, কালিদাসের জগৎ থেকে বহু দূরে চ'লে এসেছি আমরা। বহু দূরে, কিন্তু আমাদের এই পর্যটন ব্যর্থ হয়নি। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলির সাহায্যে আমরা এখন আরো জোর দিয়ে বলতে পারি যে কবি যেখানে সবচেয়ে বড়ো সেখানে তিনি আবিষ্কারক, অনুসন্ধানী, সেতুনির্মাতা; আমাদের মানসজগতে নতুন-নতুন রাজ্য তিনি যোজনা করেন; দূর ও নিকট, দৃশ্য ও অদৃশ্য, অতীত ও বর্তমান — এই সব প্রথাসিদ্ধ ভেদ ঘুচিয়ে দেন। কিন্তু কালিদাস বিষয়ে উচ্চতম কথা যা বলা যায়, তা এই যে তিনি একটি ঐতিহ্যকে তার পূর্ণতম পরিণতি দান করেছেন, তাকে নিয়ে গেছেন সমৃদ্ধির চরমে।

৭

এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে ক্লাসিক সাহিত্যের পূর্ণপ্রতিভূ য়োরোপে যেমন হোমার নন, ভার্জিল, ভারতে তেমনি বাল্মীকি নন, কালিদাস। রাষ্ট্রে, ধর্মে, সমাজে — অতএব রচনারীতিতে — প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ স্বীকৃতিকে আমরা বলতে পারি ক্লাসিক মানসের একটি প্রধান লক্ষণ; অতএব ক্লাসিক সাহিত্যের প্রধান একটি লক্ষণ হ'লো — দুর্বোধ্যতার অভাব। অন্য শব্দের অভাবে 'দুর্বোধ্যতা' লিখলাম; যে-গুণটি আমি বোঝাতে চাচ্ছি, ইংরেজি 'obscurity' শব্দের আক্ষরিক অর্থে তার ইঙ্গিত আছে। কবিতার কাছে আমাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা এই যে তার একটি অংশ হবে অন্ধকার — 'obscure'— যাকে আমরা কখনো 'বুঝে উঠতে' পারবো না ব'লেই যাতে আমাদের আনন্দ কখনো নিঃশেষ হবে না। এবং আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন সেই কবিরাই যাঁরা কোনো-না-কোনো অর্থে বিদ্রোহী — যাঁদের তালিকা দীর্ঘ ও বহুযুগব্যাপী এবং যাঁদের মধ্যে আছেন শেক্সপিয়র, ব্লেক, হ্যেল্ডার্লিন, বোদলেয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটস-এর মতো আপাতপ্রাঞ্জল

কবিগণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলিতে, প্রাঞ্জল হ'লেও দুর্বোধ: 'প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে' ব্যাকরণের হিশেবে অতিশয় সরল; কিন্তু এর অর্থ কী বা কতখানি, আমরা যেন সারা জীবন চিন্তা ক'রেও তার কূল পাবো না। 'আণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা' নাটকে মরণোন্মুখ নায়িকা যখন বলে, 'Dost thou not see my baby at my breast / That sucks the nurse asleep?'— তখন এই বহুচারিণী মোহিনী, যাকে সন্তানের মতো ব'লে জানলেও মাতা ব'লে ধারণা করা আমদের পক্ষে সহজ নয়, তার মুখে 'my baby' প্রথমে একটি বিস্ময় জাগায়, তারপর অনেকগুলো সংলগ্ন তথ্যের স্মারকের মতো কাজ করে: ক্লেওপাত্রার বক্ষোলগ্ন বিষধর পতঙ্গ, তার হৃদয়ে অ্যাণ্টনির (এবং হয়তো বা সীজার ও অন্যান্য প্রণয়ীদের) স্মৃতি, তার অনির্বাণ ও আত্মঘাতী প্রেমতৃষ্ণা — এই সবই একসূত্রে গাঁথা হ'য়ে যায়। 'O rose, thou art sick!' 'That dolphin-torn, that gong-tormented sea', 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো / বিরহানলে আলো রে তারে আলো' — এই ধরনের বহু পঙক্তি বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো যায় যে কবিতার 'অর্থ' কৌটোর মধ্যে মুক্তোর মতো একটি নিশ্চল ও নির্দিষ্ট পদার্থ নয়, তা একটা বেগ, গতির বেগ, যা শব্দগুলোকে দূরে কাছে নিশেনের মতো উড়িয়ে দেয়, যাদের ইশারায় মন তার শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে দূর থেকে দূরতরের দিকে চলতে থাকে। অনেক রাত্রে ঠাণ্ডা আকাশে যখন খণ্ড চাঁদ ওঠে — কিংবা যখন ঝোড়ো শ্রাবণ পূর্ণিমাকে মেঘে ঢেকে দেয় — তখনকার সেই ছায়াভরা জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর নগর, প্রান্তর ও কানন যেমন রূপান্তরিত হয়, চেনাকে মনে হয় অচেনা, দূরকে মনে হয় সংলগ্ন, গহ্বর, শিখর ও নীলিমা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় — এই সব কবিদের রচনাও তেমনি ক'রেই ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত ও অনির্বচনীয়কে ধারণ করে; এই আলো-আঁধারিকেই আমরা আধুনিক কালে কবিতার প্রধান গুণ ব'লে জেনেছি — এটাই আসল, এটাই সব — এই গুণটি থাকলে কবির হাতে কবিতা শেষ হ'লেও পাঠকের পক্ষে তা নিঃশেষ হয় না।

আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের আনন্দের সম্বন্ধটি একটু অদ্ভুত। যা আমরা একেবারেই বুঝি না তাতে আমরা আনন্দ পাই না; যা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝে ফেলি তাতেও আমরা আনন্দ পাই না। এখন কালিদাসের

কবিতা দুরূহ হ'তে পারে, কিন্তু দুর্বোধ নয়; তাঁর অনুশীলন শ্রমসাপেক্ষ হ'তে পারে, কিন্তু সেই শ্রম এক জায়গায় এসে থামতে বাধ্য। শেক্সপিয়র বা অন্য কোনো রোমান্টিকের কাব্য বিষয়ে সমালোচকেরা যা লিখেছেন, তা পাঠ করলে আমরা সেই-সেই কাব্য কিছুটা, হয়তো অনেকটা ভালোভাবে বুঝতে পারি; তবু শেষ পর্যন্ত কিছু বাকি থেকে যায় — কীটস-কথিত সেই 'fine excess' — যার মুখে ছায়ার ঘোমটা মাঝে-মাঝে ন'ড়ে উঠলেও কখনোই একেবারে স'রে যায় না। কিন্তু 'মেঘদূত' কাব্যটিকে, মল্লিনাথের ও অন্যান্য টীকার সাহায্যে, আমরা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারি, একটি কণাও বাইরে প'ড়ে থাকে না, অর্থ ও ব্যঞ্জনার শেষ বিন্দুটুকু নিংড়ে নিতে পারি তা থেকে। একটি শ্লোকে একাধিক অর্থ যদি থাকে, তার প্রতিটি অর্থই সুনির্ণেয়: তার মধ্যে এমন কিছু নেই, যা বহু অস্পষ্ট সম্ভাবনার সূত্রে আমাদের মনকে ক্ষণে-ক্ষণে উত্তেজিত ক'রে তুলতে পারে। এদিক থেকে 'মেঘদূতে'র — এবং সাধারণভাবে সংস্কৃত কবিতার — সীমাবদ্ধ চরিত্র স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই।

অথচ — পূর্বেই বলেছি — 'মেঘদূত' সংস্কৃত ভাষার সেই একটি কাব্য যা আমরা পৌনঃপুনিকভাবে পাঠ করতে প্রস্তুত ও উৎসুক, যার বহু অংশকে আমরা স্মরণের অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়েছি, এবং যাতে — নতুন আবিষ্কারের অবকাশ না-থাকলেও — আমরা বার-বার নতুন ক'রে আনন্দ পাই। তার মানে, 'মেঘদূতে'র অর্থ আমাদের করতলগত হ'লেও তার মধ্যে অন্য দিক থেকে কিছু-একটা উদ্বৃত্ত থাকে, যার আকর্ষণ অফুরন্ত। এই উদ্বৃত্ত অংশটি 'মেঘদূতে'র ভাবনা নয় — ভাবনায় একে গভীর বলা যায় না; তার দূরস্পর্শী ইঙ্গিত নয় — সে-রকম ইঙ্গিত নেই এতে; এমনকি তার চিত্ররূপময় বর্ণনাও নয়, কেননা এই বর্ণনা গদ্যে লেখা হ'লে আমাদের ক্লান্তি আসতো। 'মেঘদূতে'র ছন্দ, ধ্বনি, আমাদের শ্রবণে ও স্নায়ুতন্ত্রীতে তার আবেদন, এবং তার গতিধর্ম, আভ্যন্তরিক নাটকীয় ক্রিয়া, যা নিয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি — এই দুটি লক্ষণকে আমি উদ্বৃত্ত ব'লে অভিহিত করবো, যা কাব্যটিকে অক্ষয়-ভাবে নতুন ক'রে রেখেছে। ছন্দের গম্ভীর আন্দোলন, হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের সুনিয়ন্ত্রিত কল্লোল, অনুপ্রাসের অপ্রকট সৌষম্য, দীর্ঘ সমাসের বিরলতা — এই লক্ষণগুলিতে 'মেঘদূত' হ'য়ে আছে আবৃত্তিযোগ্য, পুনরাবৃত্তিযোগ্য, উচ্চারণের পক্ষে পরম অনুকূল। এর প্রতিদ্বন্দ্বী অংশ 'রঘুবংশে' বা 'কুমার-সম্ভবে' পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কালিদাস অন্য কোথাও মন্দাক্রান্তা ব্যবহার

করেননি, কিংবা অন্য কোনো সংস্কৃত কাব্য, শুধুমাত্র তার ধ্বনির দ্বারা, এমন আবেগের সৃষ্টি করতে পারে না। আমি জানি, ধ্বনি প্রকৃতপক্ষে অর্থের প্রতিধ্বনি হ'তে পারে না, আমাদের অজানা ভাষায় কবিতায় ধ্বনিবিন্যাসে যত চাতুরী থাক তা থেকে কোনো সংবাদই নিতে পারবো না আমরা, এবং কাব্যের দিক থেকে নিছক শ্রবণসুভগতার কোনো মূল্য নেই। কিন্তু 'মেঘদূতে' আরো কিছু বেশি পাওয়া যায়; ঢেউয়ের পর ঢেউ, তার মন্দাক্রান্তা যখন আমাদের কান ও মনের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, তখন আমরা ধীরে-ধীরে আক্ষরিক অর্থে মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি — কবিতা আর মন্ত্র যখন অভিন্ন ছিলো, যখন ডাইনি-পুরুতের অর্থহীন ও ছন্দোবদ্ধ প্রলাপই ছিলো কবিতা — সেই অতি দূর অতীতের স্মৃতি অবচেতনায় হানা দেয় যেন। 'মেঘদূত' অর্থহীন নয়, কিন্তু তার যে-সব শ্লোক আমরা স্মরণীয় ব'লে স্বীকার করি, অনেক সময় তাদের অর্থ অতি সাধারণ — এমনকি তুচ্ছ। তুচ্ছকে গম্ভীরভাবে প্রকাশ করলে, ফল সাধারণত হাস্যকর বা হাস্যজনক হয়; কিন্তু 'মেঘদূতে' উল্টোটা দেখতে পাই; সেখানে ধ্বনির গৌরবে তুচ্ছ হ'য়ে ওঠে শ্লাঘনীয়।

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী (পৃ ৪)
বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ (পৃ ৩০)
দীর্ঘীকুর্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং (পৃ ৩২)
বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ (উ ৬৫)

— এরা এক-একটি পদ বা পঙক্তি হ'লেও বাক্য নয়, কোনোটিতেই সম্পূর্ণ কোনো অর্থ বা চিত্র নেই, এবং সমগ্র শ্লোকসমূহে যা বলা হয়েছে তাও আমাদের ভাবনায় বা কল্পনায় কোনো উত্তেজনা এনে দেয় না। অথচ এই পঙক্তি, এবং শ্লোকসমূহ — সমগ্রভাবে 'শ্রোত্ররপেয়' 'মেঘদূতে'র মধ্যেও — বিশিষ্টভাবে দাবি করে, শুধু আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়কে নয়, আমাদের স্নায়ুতন্ত্রী-সমন্বিত চৈতন্যকে। এ যেন সেই পঙক্তি, যা আমাদের দেহকে রোমাঞ্চিত ক'রেই চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে পারে, যার কোনো জ্ঞাধেয়বস্তুর আর প্রয়োজন নেই — সেই পঙক্তি, যাকে হয়তো আমরা মালার্মের ভাষায় বলতে পারি 'শূন্য, একতাল ও ধ্বনিময়'।

অনুবাদকের বক্তব্য

এই গ্রন্থের ভূমিকারূপে যে-প্রবন্ধটি মুদ্রিত হলো, তাতে আমি সংস্কৃত কবিতার সঙ্গে আধুনিক জীবনের ব্যবধান বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। ব্যবধান ঘটেছে তা মানতেই হয়, কিন্তু এ-কথা ভাবলে ভুল হবে যে তা অনতিক্রম্য। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের কয়েকটি উপায় আমাদের জানা আছে: তার মধ্যে অনুবাদ এক দিক থেকে সবচেয়ে কার্যকরী। লেখক ও তাঁর ভাষা যখন প্রাচীন, তখন তাঁকে সমকালীন জীবনের মধ্যে সংকলিত করার কাজটি অনুবাদকের ব'লে স্বীকার্য— পণ্ডিত বা পুরাবিদের নয়। অনুবাদই সেই ঘটক, যার প্ররোচনায় আমরা বুঝতে পারি যে প্রাচীন সাহিত্য একটা বৃহদায়তন স্থাবর সম্পত্তি নয়, যুগে-যুগে তা বাণিজ্যের যোগ্য ব'লেই আমরা তাকে 'ক্লাসিক' নাম দিয়েছি, এবং আমাদের আজকের দিনের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশেও তার সংলগ্নতা হারিয়ে যায়নি। অর্থাৎ, অনুবাদ সেই প্রাচীনকে সজীব ও সমকালীন সাহিত্যের অংশ ক'রে তোলে। আর সেইজন্যেই যুগে-যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন ঘটে। যেহেতু ভাষা একটি নিত্যসচল ও পরিবর্তমান পদার্থ, এবং ভাষাই সাহিত্যের বাহন, তাই কোনো-একটি অনুবাদ, উৎকৃষ্ট হ'লেও, চিরকাল পর্যাপ্ত থাকে না; প্রতি যুগ ভাষায় যে-বিশেষ ভঙ্গিকে জন্ম দেয়, তার সঙ্গে মিলনের দ্বারাই পুরাতনের পুনরুজ্জীবন ঘ'টে থাকে। লেখক প্রাচীন ব'লে তাঁকে বেদীতে বসিয়ে যদি শুধু পূজো করতে থাকি তবে তো তাঁকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেয়া হ'লো; তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে আমাদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসিয়ে আমাদেরই ভাষায় কথা বলাতে হবে। য়োরোপের আধুনিক ভাষাগুলিতে গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের প্রচুর ও বিচিত্র অনুবাদ প্রতি যুগে নির্দিষ্ট ফসলের মতো উদ্গত হ'য়ে আসছে; সেটা নিশ্চয়ই একটা কারণ, যার জন্য আধুনিক য়োরোপের প্রাণস্রোতে তার খ্রিষ্টপূর্ব উত্তরাধিকার নিরন্তর প্রবহমান। য়োরোপের সঙ্গে গ্রীক ও লাতিনের যা সম্বন্ধ, সংস্কৃতের সঙ্গে আমাদের ঠিক তা-ই; এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছুটা পেছিয়ে থাকলেও, বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতি কিছু কাজ হয়নি তাও নয়। প্রবোধেন্দুনাথের 'কাদম্বরী' ও রথীন্দ্রনাথের 'বুদ্ধচরিতে' সংস্কৃতের জটিল ও মন্দ্র-মন্থর

বাচনভঙ্গি পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য একজন লেখকের রচনায় সংস্কৃত ভাষা, তার শালীনতা না হারিয়ে, আয়ত্ত করেছে চলতি বাংলার সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য। যেমন আজকের দিনের ইংরেজিভাষীর পক্ষে ঈ. ভি. রীউর হোমার, তেমনি আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির উপযোগী গ্রন্থ রাজশেখর বসুর রামায়ণ ও মহাভারত; আজকের দিনে, যখন শিশুরা আর কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাস পড়ে না, এবং বয়স্করা তাতে ক্লান্তিবোধ করেন, এবং যখন কালীপ্রসন্নর মহাভারত বহুকাল ধ'রে অপ্রাপ্য হ'য়ে রয়েছে, তখন ঐ রকম দুটি সুখপাঠ্য সরল অনুবাদ সম্পাদিত না-হ'লে দেশের লোকের রামায়ণ-মহাভারত ভুলে যাবার আশঙ্কা ছিলো — অন্তত, আমাদের উত্তরপুরুষের পুরাণ-জ্ঞান শিশুপাঠ্য সংস্করণ ছাড়িয়ে এগোতে পারতো না। সন্দেহ নেই, রাজশেখর বসুর অনুবাদের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাঙালির জীবনে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের নতুন ক'রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'লো। এ-কথা ব'লে আমি মূলের মহিমা হ্রাস করতে চাচ্ছি না — সেটা অসম্ভব; আমার বক্তব্য এই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচনামাত্রই অনুবাদের মুখাপেক্ষী। যাঁরা ব'লে থাকেন যে অনুবাদ রচনা ও পাঠ করা সময়ের অপব্যয় মাত্র, তাঁদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে শেক্সপিয়র ও কীটস অনুবাদে ভিন্ন গ্রীক বা লাতিন সাহিত্য জানেননি, এবং ভারতীয় মানসে যে-দুটি গ্রন্থ সবচেয়ে প্রতিপত্তিশীল, সেই মহাভারত ও রামায়ণ সর্বভারতে বহু শতক ধ'রে অনুবাদে বা অনুলিখনে প্রচারিত হচ্ছে। ইংরেজি ভাষার যে-বাইবেল পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচারিত গ্রন্থ, সেটি অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ — কিন্তু তার পাঠকদের মধ্যে ক-জনের তা মনে পড়ে, বা মনে পড়লেও কী এসে যায়? উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে, রুশ উপন্যাস সমগ্র প্রতীচীর ধ্যানধারণায় প্রবিষ্ট হয়েছে, প্রধানত ফরাশি ও ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে। দান্নুৎসিয়ো, যাঁর রচনাকে বলা হয় 'সুইনবার্নের একটি কাব্যসংকলন', তিনি ইংরেজি জানতেন না; ফরাশি ভাষায় সুইনবার্নের অনুবাদ প'ড়ে তিনি নিজেকে ঐ কবির মধ্যে আবিষ্কার করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে মূল পড়া সম্ভব হয় না ব'লে অনুবাদের প্রয়োজন আছে, শুধু এটুকু বললে ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বেশি সরল করা হয়; এক-এক সময়ে এক-একটি অনুবাদ বা অনুবাদগুচ্ছ এক-এক দেশের বা মহাদেশের সাহিত্যের ধারা বদলে দিয়েছে, এবং যাঁরা মূলের সঙ্গে পরিচিত তাঁরাও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদ প'ড়ে লাভবান হ'তে পারেন —

কেননা ভালো অনুবাদ শুধু মূল রচনার প্রতিনিধিত্ব করে না, তার যুগের ও অনুবাদকের ব্যক্তিত্বেরও স্বাদ দেয়। চ্যাপম্যান-এর, পোপ-এর এবং কোনো আধুনিক লেখকের হোমার-অনুবাদ পাশাপাশি রাখলে আমরা বুঝতে পারি বিগত সার্ধ তিন শতকের মধ্যে ইংরেজের ভাষা ও মানস কী-ভাবে ও কতদূর পর্যন্ত বদলেছে।

'মেঘদূত'-অনুবাদে আমি কিছুটা আকস্মিকভাবে হাত দিয়েছিলাম ; এর জন্য বিশেষ-কোনো প্রস্তুতি ছিলো না, বা মনে-মনে এর পরিকল্পনাও করিনি। এক অচিরস্থায়ী অসুস্থতায় সময়যাপনের উপায়রূপে এর আরম্ভ ; তারপর, অন্য নানা ব্যাপারের ফাঁকে-ফাঁকে, প্রায় এক বছর ধ'রে, এটিকে আমার সাধ্যানুযায়ী সানুষঙ্গ সম্পূর্ণতা দিয়েছিলাম। 'মেঘদূতে'র অনুবাদকের পক্ষে যেটি প্রথমতম প্রশ্ন—'কোন ছন্দে লিখবো ?'—তার উত্তরের জন্য আমাকে ভাবতে হয়নি, কেননা সে-উত্তর অনেক আগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়ে গেছেন। মন্দাক্রান্তার প্রত্যেক চরণে চার পর্ব, মাত্রার সংখ্যা সাতাশ — ৮।৭।৭।৫ :

৮	৭	৭	৫
কশ্চিৎকান্তা-	বিরহগুরুণা	স্বাধিকার-	প্রমত্তঃ

এর অনুকরণে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন :

৮	৭	৬	৫
পিঙ্গল বিহ্বল	ব্যথিত নভতল	কই গো কই মেঘ	উদয় হও

বাংলা ঠিক সংস্কৃতের মতো আওয়াজ দিতে পারে না, কিন্তু বাংলায় যতটা সম্ভব এই ছন্দে মন্দাক্রান্তার চরিত্র ততটাই প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কাঠামোর উপর আমি দুটি গৌণ পরিবর্তন করেছি : আমার চরণের প্রথম পর্বে সাত, এবং শেষ পর্বে আছে পাঁচ, চার বা তিন মাত্রা :

৭	৭	৭	৫
জনেক যক্ষের	কর্মে অবহেলা	ঘটলো ব'লে শাপ	দিলেন প্রভু
৭	৭	৭	৩
এবং জলধারা	জনকতনয়ার	স্নানের স্মৃতি মেখে	পুণ্য
৭	৭	৭	৪
যখন আট মাস	কাটলো সে-পাহাড়ে	কান্তাবিরহিত	কামুকের

এই পরিবর্তন আমি সচেতনভাবে করিনি ; রচনাকালে প্রথম পাঁচ পঙক্তির মধ্যেই শেষ পর্বের ত্রিবিধ বৈচিত্র্য যখন দেখা গেলো, আর আমার কানে

সেটা খারাপ লাগলো না, তখন সাহস পেয়ে এই বৈচিত্র্যটাকেই নিয়ম ক'রে নিলাম। এবং কিছু দূর অগ্রসর হ'য়েই বুঝলাম যে প্রথম পর্বের সাত মাত্রাও, আমার প্রয়োজনের পক্ষে, বেশি উপযোগী হয়েছে। 'যক্ষের নিবেদনে' দেখা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম পর্বে যুক্তবর্ণের আঘাত দিয়ে, দ্বিতীয় পর্বটিকে, সংস্কৃতের অনুকরণে, যুক্তবর্ণবর্জিত তরলতায় গড়িয়ে দিয়েছেন :

> পিঙ্গল বিহ্বল | ব্যথিত নভতল, | কই গো কই মেঘ | উদয় হও,
> সন্ধ্যার তন্দ্রার | মূরতি ধরি' আজ | মন্দ্র-মন্থর | বচন কও :
> সূর্যের রক্তিম | নয়নে তুমি, মেঘ ! | দাও হে কজ্জল, | পাড়াও ঘুম,
> বৃষ্টির চুম্বন | বিথারি' চ'লে যাও — | অঙ্গে হর্ষের | পড়ুক ধুম।

প্রথম পর্বে আট মাত্রার পরে দ্বিতীয় পর্বের সাত মাত্রাকে সুশ্রাব্য করতে হ'লে যুক্তবর্ণের ঠিক এই রকম বিতরণ প্রয়োজন, এবং প্রয়োজন পর্বশেষে হসন্ত অক্ষর বা অর্ধস্বর ; আর এই ব্যবস্থা কতিপয় শ্লোকে রক্ষা করা সম্ভব হ'লেও, দীর্ঘ রচনায় চেষ্টা করতে গেলে কবিতার আসল জায়গায় জখম হওয়া অনিবার্য। 'যক্ষের নিবেদনে' শ্লোকের সংখ্যা আট (এবং সেটি অনুবাদও নয়); আমাকে, যথাসম্ভব মূলের অনুগামী থেকে, একশো আঠারো শ্লোক রচনা করতে হ'লো ; আর এই দীর্ঘায়িত শ্রম আমি যে শেষ ক'রে উঠতে পেরেছি তার একটি কারণ, এখন আমার মনে হয়, চরণের প্রথম পর্বে সাত মাত্রার বিন্যাস। এই ব্যবস্থার ফলে আমি হসন্ত ও স্বরান্ত শব্দ থেকে স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পেরেছি ; আমার ব্যবহারযোগ্য শব্দের সংখ্যা বেড়ে গেছে ; মূলের বার্তাকে নানা ভিন্ন-ভিন্নভাবে আক্রমণ করতে পেরেছি, যাতে বাংলায় চার পঙ্‌ক্তির মধ্যে ধরানো যায়। কালিদাসের অনুবাদে অন্ত্য মিল ব্যবহার করা আমার পক্ষে অচিন্তনীয় — যে-কোনো অনুবাদেই আমি রূপকল্পগত অবিকল সাদৃশ্যের পক্ষপাতী ; — উপরন্তু, যে-ছন্দ স্বভাবত প্রবহমান নয়, তাতে ৪৭২ পঙ্‌ক্তির একটি অ-নাটকীয় কাব্যে অন্ত্য মিল দিতে গেলে একঘেয়েমি এড়ানো অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, শেষ পর্বের মাত্রা-বৈচিত্র্য এ-দিক থেকে এই অনুবাদের সহায় হয়েছে : যেখানে সংস্কৃত ছন্দের গাম্ভীর্য ও আন্দোলন নেই, সেখানে বহুক্ষণ ধ'রে একই সুর শুনতে-শুনতে, পাঠকের ঝিমুনি আসতে পারে ; শেষ পর্বগুলির ধ্বনিগত তারতম্যে, অন্তত পক্ষে নিদ্রালুতা কেটে যাওয়া সম্ভব।

যেমন মৌলিক রচনায়, তেমনি অনুবাদে, একটি জরুরি প্রশ্ন হ'লো ভাষার

ভঙ্গি বা স্টাইল। বাংলা ভাষায় লেখকের পক্ষে সমস্তাটিকে এ-ভাবে দাঁড় করানো যায় : লেখার মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের মাত্রাবিতরণ কী-রকম হবে, এবং 'কাব্যিক' রীতি বা পুরোনো ভাষা প্রশ্রয় পাবে কোন পর্যন্ত? যখন সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে, তখন এই প্রশ্নের যথাসম্ভব সঠিক উত্তর মনে-মনে তৈরি ক'রে নিতে হয়। কিন্তু এখানেও আমাকে উত্তরের জন্য নানা দিকে হাৎড়াতে হয়নি ; আমার নিজস্ব অভ্যাসের মধ্যেই আমি তা সহজে পেয়ে গিয়েছি। এ-কথা না-বললেও চলতে পারে, কিন্তু বলাও দরকার, যে আমরা আজকাল পুরোপুরি বাংলা ভাষাতেই লিখে থাকি — রবীন্দ্রনাথের মতো (বা যুবাবস্থায় আমাদেরই মতো) কখনো-কখনো আধা-সংস্কৃতে নয় — সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ আধুনিক বাংলায় উল্লেখ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, অনেক বেশী বিস্তৃত হয়েছে যতিচিহ্নের প্রয়োগ, দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার প্রায় লুপ্ত, এবং শব্দব্যবহারে সংস্কৃত ও দেশজের মিশ্রণ অনেক বেশি ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত। কালিদাসের বক্তব্যকে বিশ্লেষধর্মী বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা — অনুবাদকালে এই ছিলো আমার প্রধান লক্ষ্য : অর্থাৎ আমি চেয়েছি রচনার ভাষা যতদূর সম্ভব বাংলা হোক, এবং আধুনিক বাংলা। সেই সঙ্গে, এটাতে সংস্কৃতের স্বাদও কিছু রাখতে চেয়েছি ; সেইজন্য 'অম্বু', 'অম্ভোজ', 'বলভি', 'দ্বিরদ', 'করভ' প্রভৃতি শব্দ — আধুনিক বাংলায় যা অপ্রচলিত — তাদের ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত করিনি ; এবং মাঝে-মাঝে যখন দীর্ঘ সমাস ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি ('যুবতী-জল-কেলি-সৌরভ', 'মন্দাকিনী-বারি-স্পৃষ্ট') তখনও — রুচির দিক থেকে না হোক, ঔচিত্যের দিক থেকে সমর্থন পেয়েছি। 'যবে', 'পুন', 'যেথা' প্রভৃতি 'কাব্যিক' শব্দকেও স্থান দিয়েছি তাদের পুরাতনী সৌরভের জন্য ; এবং যে-সব স্থলে বহু প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছি ('অঙ্গনা', 'ললনা', 'প্রমদা' ; 'জলদ', 'পয়োদ', 'জলধর' ; 'অদ্রি', 'শৈল', 'গিরি' ইত্যাদি) বা যেখানে কামনা অর্থে 'কাম' বা কামী অর্থে 'কামুক' লিখেছি, সেখানেও আমি চেয়েছি মূলের রচনাভঙ্গীর পরিচয় দিতে। মোটের উপর, খাঁটি বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও ভঙ্গির মিশ্রণ এখানে এমনভাবে ও এতদূর পর্যন্ত ঘটেছে, যা আধুনিক বাংলা কবিতার অভ্যাসকে অতিক্রম ক'রে যায়।

এইজন্যে, 'কবিতা'য় এই অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর, এক মনোযোগী পাঠক এর বিরুদ্ধে গুরুচণ্ডালের অভিযোগ এনেছিলেন। 'নাসিকারন্ধ্রের মধুর

বৃংহিতে গন্ধ নেয় তার হাতির পাল' বা 'চটুল পুঁটিমাছ লাফিয়ে চলে যেন, ধবল কুমুদের কান্তি' — এই ধরনের পঙক্তিতে, আমি জানি, আরো অনেকের আপত্তি হ'তে পারে। 'হাতির পাল'-এর বদলে 'হস্তীযূথ' লেখা সহজ ছিলো; 'পুঁটিমাছ'-এর স্থলে 'শফরী' লেখাও অসম্ভব ছিলো না — কিন্তু আমি খুব সুচিন্তিতভাবেই এদের উপর হস্তক্ষেপ করলাম না। আমার রচনার ভাষা যখন বাংলা, তখন 'হস্তীযূথ' ও 'শফরী'র চাইতে 'হাতির পাল' ও 'পুঁটিমাছ' অনেক বেশি চিত্রবহ তা মানতেই হবে; আমি নিজে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পেয়েছি সে-সব স্থলেই, যেখানে পঙক্তিটি ঠিক আধুনিক বাংলায় দাঁড়িয়ে গেছে ('যক্ষ কোনোমতে চোখের জল চেপে ভাবলে মনে-মনে বহুখন', 'গুণীরে অনুনয় বিফল সেও ভালো, অধমে বর দিলে নিতে নেই'); এবং এমন একটি শ্লোকও তৈরি করিনি, যাতে ক্রিয়াপদে ও বাক্যের বিন্যাসে আধুনিক বাংলার কোনো চরিত্র- বা ব্যাকরণগত লক্ষণ প্রবেশ না-করেছে। আর গুরুচণ্ডালবোধ অনেকটাই অভ্যাসের ব্যাপার; কুড়ি বছর আগে যে-সব প্রয়োগ মারাত্মক বিসংগতির উদাহরণ ছিলো, আজকের দিনে সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

'এবং', 'কিন্তু', 'অতএব' প্রভৃতি অব্যয়শব্দের ব্যবহার বিষয়ে একটু বলতে চাই। সংস্কৃতের আঁটোসাঁটো ব্যাকরণে এগুলো অপরিহার্য ছিলো না, বাংলাতেও বহুকাল পর্যন্ত এরা কবিতার পক্ষে অনুপযোগী ব'লে চিহ্নিত ছিলো। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পদ্যরচনায় 'কিন্তু' বা 'এবং' বা 'অথচ', হয় অত্যন্ত বিরল নয় একেবারেই নেই ('নবজাতকে'র 'কেন' কবিতায় 'কিন্তু, কেন?' ছাড়া কোনো উদাহরণ এ-মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না); কিন্তু আধুনিক কবিতা গদ্যভঙ্গির পক্ষপাতী ব'লে তাতে এ-সব অব্যয়ের ব্যবহার বহুলভাবে — এবং সার্থকভাবে — দেখা দিয়েছে। এদের দ্বারা এবং যতি-চিহ্নের দ্বারা বাক্যের বিভিন্ন অংশ পরস্পরে অন্বিত হয়, বাক্যসমূহের সম্বন্ধ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, রচনাটিতে ঘনতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই সংযোগ-সাধনের প্রয়োজন আমি এই অনুবাদেও অনেকবার অনুভব করেছি।

এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য।

এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রথম পর্বে 'জলের ধারা যার' লিখতে — তাতে একটা মধ্যমিলও পাওয়া যেতো — কিন্তু আমার বিশ্বাস, 'এবং' বাদ দিলে পঙক্তি চারটি শিথিলভাবে ঝুলে থাকতো, একটা নিবদ্ধ স্তবক বা শ্লোকের

চেহারা পেতো না। সংস্কৃতে সমাসের জন্য অন্য কোনো যোগসূত্রের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু বাংলায় তা বর্জন করার উপায় নেই।

আর-একটা কথা। সংস্কৃতে 'আপনি-তুমি' বিনিময়ধর্মী ছিলো; যক্ষও মাঝে-মাঝে মেঘকে 'আপনি' বলছে। আমি, অভ্যাসজনিত আপত্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও, 'ভবৎ' স্থলে অধিকাংশ স্থলেই 'আপনি' লিখেছি। তার কারণ, আমার মনে হয়েছে, কালিদাস শুধু ছন্দ মেলাবার জন্যে ও-রকম করেননি; যক্ষের মুখে প্রায় সর্বত্রই 'আপনি'টা বিশেষ অর্থ পেয়েছে: সে-অর্থ চাটুকারিতার। যক্ষ রাজপুরুষ, অতএব চাটুবাক্যে নিপুণ; মেঘকে আবেদন জানাবার প্রাক্কালে সে মেঘের মহৎ বংশের যথারীতি উল্লেখ করেছে, এবং উত্তরাংশে মেঘের গুণ গাইতেও ভোলেনি। মনে হয়, স্বগতোক্তির ফাঁকে-ফাঁকে তার হঠাৎ কখনো মনে প'ড়ে যাচ্ছে, তার সম্মুখবর্তী মেঘ কত বড়ো অভিজাত ও সজ্জন, আর তার এই প্রার্থনা কত অনুচিত, এবং তখনই 'আপনি' সম্বোধন ক'রে তার অবস্থার উপযোগী বিনয়প্রকাশের চেষ্টা করছে (উত্তরমেঘের উপান্ত্য শ্লোকে এই ভাবটি সুস্পষ্ট)। যে-যে স্থলে মূলের 'আপনি'র কোনো সার্থকতা আমি দেখিনি, সেখানে 'তুমি'ই রেখেছি (পৃ ৫২ ও ৫৫)।

'কবিতা'য় মুদ্রণের সময় পাদটীকা দিয়েছিলাম; কিন্তু ইতিমধ্যে টীকার আয়তন বহুগুণ বেড়ে গেলো ব'লে গ্রন্থের শেষভাগে তা নিবিষ্ট ক'রে দিলাম। যাঁরা এই গ্রন্থের সাহায্যে প্রথম 'মেঘদূত' পড়ছেন, কিংবা যাঁরা মল্লিনাথের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁরা টীকার অংশ আগে একবার প'ড়ে নিলে কাব্যটিতে কোথাও কোনো বাধা পাবেন না। যাঁরা কিছুটা সংস্কৃত জানেন, বা কখনো 'মেঘদূতম্' পড়েছিলেন, তাঁদের সুবিধের জন্য মূল রচনাও অনুবাদের সংলগ্ন-ভাবে মুদ্রিত হ'লো (মূলের পাঠ মুখ্যত রাজশেখর বসুর, দু-এক স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত সংস্করণের অনুগামী)। আর যাঁরা সংস্কৃতের সঙ্গে একবারেই পরিচিত নন, তাঁরাও এই অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকা প'ড়ে 'মেঘদূতে'র আস্বাদ পাবেন ব'লে আশা করি — তাছাড়া কালিদাসের জগৎ ও সংস্কৃত কবিতার সাধারণ প্রকৃতি বিষয়ে কোনো ধারণা পাবেন না তাও নয়। কালিদাসের জগৎ বলতে যা বোঝায় তার ভাবরূপ পাঠক যাতে চোখে দেখতে পান, সেই উদ্দেশে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার কয়েকটি নিদর্শন সংযোজিত হ'লো — এবং, প্রতিতুলনার জন্য, পাশ্চাত্ত্য শিল্পের দুটি নমুনা, একটি রাজপুত-চিত্র, ও একখানা অবনীন্দ্রনাথ।

অনুবাদ ও গ্রন্থের অন্যান্য অংশ রচনায় অনেক সহৃদয় ও রসজ্ঞ বন্ধুর সাহায্য পেয়েছি ; এই সুযোগে তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। প্রথমেই বলি, শ্রী রাজশেখর বসুর অন্বয়-ও সরল গদ্য অনুবাদ-সংবলিত 'মেঘদূত', যা সব অর্থেই নির্ভার ও ট্রামে-বাস্-এ বহনের উপযোগী, সেটি প্রকাশিত না-হ'লে আমার মতো সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ও নানাকর্মজড়িত ব্যক্তির পক্ষে কাব্যটি স্বাধীনভাবে ও সাবধানে পাঠ করাই সম্ভব হ'তো না — অনুবাদ করা তো দূরের কথা। ছাত্রাবস্থার পরে, আমি তাঁর সংস্করণেই প্রথম 'মেঘদূত' পড়ি, এবং একবারের পর বার-বার পড়ায় উৎসাহ পাই। রচনাকালে নানা বিষয়ে নির্দেশের জন্য বসু-মহাশয়কে বার-বার পত্রাঘাত করেছি, তিনি অবিলম্বে সুচারু ও সম্পূর্ণ উত্তরদানে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। তাঁর পত্র ও পুস্তক থেকে উদ্ধৃতির অনুমতি দিয়েছেন ব'লে শ্রীযুক্ত বসুকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই ; এবং শ্রী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ধন্যবাদ তাঁর 'বুদ্ধচরিতে'র অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতির অনুমতির জন্য। শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পাণ্ডুলিপিতে আমার অনুবাদ পাঠ ক'রে বহু অংশের পরিবর্তন প্রস্তাব করেন ; তাঁর প্রস্তাবসমূহ আমি এতদূর পর্যন্ত গ্রহণ করেছি যে কোনো-কোনো বাক্যাংশ তাঁরই রচনা বলা যায়। এর একটি উদাহরণ উল্লেখ করি : প্রথম শ্লোকের প্রথম পঙক্তির প্রথম শব্দটিই তিনি আমাকে ব'লে দেন ; আমি প্রথমে, মাত্রাবিন্যাসে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে, 'কোনো-এক' লিখেছিলাম। এবং ঐ 'জনেক' শব্দটি যেমন সুষ্ঠু হয়েছে, তাঁর ভাণ্ডার থেকে আমার অন্যান্য ঋণও ঠিক তেমনি। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ইতিপূর্বে বহু প্রসঙ্গে আমি লাভবান হয়েছি ; এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'সংস্কৃত কবিতা ও "মেঘদূত"' প্রবন্ধরচনায় আমাকে সাহায্য করেছেন তরুণ লেখক শ্রী জ্যোতির্ময় দত্ত ; তাঁর সঙ্গে আলোচনার ফলে আমার কোনো-কোনো ভাবনা নিজের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। 'মেঘদূত'-সক্রান্ত কয়েকটি বিরল বই দীর্ঘকাল ধ'রে আমাকে ব্যবহার করতে দিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ আমাকে বাধিত করেছেন। সে-সব গ্রন্থ, এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থসংগ্রহের অন্তর্ভূত মনিয়র-উইলিয়মস-এর পরিশোধিত সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানটি সব সময় হাতের কাছে না-থাকলে এই পুস্তক শোচনীয়ভাবে অসম্পূর্ণ থাকতো। মেঘের ভ্রমণপথের যে-মানচিত্রটি সংযোজিত হ'লো, সেটি বহু যত্নে রচনা ক'রে দিয়েছেন আমার বন্ধু শ্রী সৌরেন সেন।

'কবিতা'য় প্রকাশের পরে আমার অনুবাদের অনেক ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন শ্রী সন্তোষকুমার প্রতিহার ও শ্রী জ্যোতিভূষণ চাকী। তাঁদের পরামর্শ অনেক স্থলে গ্রহণ ক'রে আমি অনুযায়ী সংশোধন করেছি; কোনো-কোনো শ্লোক নতুন ক'রে লিখতে হয়েছে। গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে শ্রী নরেশ গুহর কয়েকটি প্রস্তাব উপকারী হয়েছে; ভূমিকাটির পরিশোধনে শ্রী নিরুপম চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান সাহায্য পেয়েছি; একজন পত্রলেখক একটি তথ্যগত অসংগতি দেখিয়ে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। এঁরা, এবং অন্যান্য হিতৈষীরা, যা-কিছু মন্তব্য করেছেন তার প্রত্যেকটি আমি সশ্রদ্ধভাবে অনুধাবন করেছি; সব গ্রহণ করিনি তার কারণ আমার অহমিকা নয়, আমার ভিন্ন বিশ্বাস। এই গ্রন্থে যদি কিছু কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাতে উল্লিখিত রসজ্ঞদের অবদান আমি স্বীকার করি; আর যে সব দোষ দুর্মরভাবে থেকে গেলো তার জন্য একমাত্র আমার অক্ষমতাকে দায়ী করতে হবে।

বানান ও ব্যাকরণ বিষয়ে দু-একটি কথা বলা দরকার। আমি, আমার সমকালীন আরো অনেকের মতো, আধুনিক বানানে অভ্যস্ত হয়েছি; আর আমার বিশ্বাস সংস্কৃতের নিয়ম বেশি দূর অনুসরণ করতে গেলে আধুনিক বাংলার চরিত্রহানি ঘটে। শব্দের ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণে সংস্কৃতে হল্-চিহ্নের প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু বাংলায় আমরা স্বভাবতই হলন্ত উচ্চারণ করি ব'লে তা নিষ্প্রয়োজন; 'প্রাবৃট', 'সুহৃদ', 'দিক', 'কান্তিমান' ইত্যাদিতে ঐ চিহ্ন দিলে সমকালীন বাংলার বিরুদ্ধাচরণ করা হ'তো। আজকের দিনে কোনো লেখকই বোধহয় 'ঐ দিক্ দিয়ে যাও' লিখবেন না, কিংবা এমন কোনো লেখকের কথাও ভাবা যায় না যিনি নায়িকাকে 'অবলে' ব'লে সম্বোধন করবেন। আধুনিক ব্যবহারের অনুগমন ক'রে আমি সম্বোধনে 'গুণবতী', 'অসিতনয়না' ইত্যাদি এবং বহুবচনে 'মর্গনচারীগণ' লিখেছি; তা না-লেখাটা আমার পক্ষে হ'তো অমার্জনীয় গুরুগিরি। বিশেষণে লিঙ্গভেদ কোথাও-কোথাও রক্ষা করেছি, কিন্তু সর্বত্র করিনি — কেননা আধুনিক বাংলায় এই নিয়মহীনতাই নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গপ্রয়োগ নির্ভর করে প্রসঙ্গ, রচনাভঙ্গি ও লেখকের বিচারবুদ্ধির উপর। উ ৮৫-তে 'প্রথম যুবতীর প্রতিমা' ও 'যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা', এই দুটোই আমার কানে সমান স্বাভাবিক শোনায়। তেমনি, সম্পূর্ণরূপে কানের উপর নির্ভর ক'রে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে

কোনো-কোনো স্থলে '-কে'র বদলে '-রে' বা '-য়' লিখেছি ; পদ্যে এই তিন প্রকরণই প্রয়োজ্য ব'লে আমার মনে হয়। যে-সব শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়ই স্বাকার্য সেখানে আমি হ্রস্ব স্বর গ্রহণ করেছি (দেহলি, বলভি, বিজলি, পদাবি, জম্বু)। যাঁরা বলবেন, অন্তত অনুবাদের অংশে বানান ও ব্যাকরণ আরো সংস্কৃত-ঘেঁষা হওয়া উচিত ছিলো, তাঁদের আমি আবার মনে করিয়ে দেবো যে সংস্কৃত ও বাংলা আলাদা ভাষা, এবং আমি বাংলা ভাষার লেখক। গ্রীক ও লাতিন নামের বানানে আমাদের দেশে প্রচলিত ইংরেজি প্রথা সাধারণত অনুসরণ করেছি।

'অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাং' (পূ ২২) ও 'আনন্দোত্থং নয়নসলিলং' (উ ৬৮) এই দুটি শ্লোকের অনুবাদ 'কবিতা'য় ছাপা হয়নি, গ্রন্থে যোগ ক'রে দিলাম। 'কবিতা'য় প্রকাশকালে ভূমিকার বক্তব্যে কিছু ছাপার ও কিছু অনবধানজনিত ভুল ছিলো, গ্রন্থে সেগুলো সংশোধন ও প্রয়োজনমতো পরিবর্তন ক'রে দিলাম, ফলে পাদটীকা সংখ্যায় কম হ'লো। গ্রন্থের ভূমিকা ও টীকায় সংস্কৃত শ্লোকাংশের যে অনেক অনুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে, যেখানে কোনো নাম উল্লেখ করিনি সেখানে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অনুবাদক ব'লে ধ'রে নিতে হবে।

কলকাতা
জুলাই, ১৯৫৭

বু. ব.

পূর্বমেঘ

* চিহ্নিত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ব'লে অনুমিত

১

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু॥

২

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥

৩

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥

৪

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥

৫

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু॥

১

অনেক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটলো ব'লে শাপ দিলেন প্রভু,
মহিমা অবসান, বিরহ গুরুভার ভোগ্য হ'লো এক বর্ষকাল ;
বাঁধলো বাসা রামগিরিতে, তরুগণ স্নিগ্ধ ছায়া দেয় যেখানে,
এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য ।

২

যখন আট মাস কাটলো সে-পাহাড়ে কান্তাবিরহিত কামুকের,
সোনার কঙ্কণ স্খলিত হ'য়ে তার শূন্য হ'লো মণিবন্ধ ।
দেখলো মেঘোদয় ধূমল গিরিতটে একদা আষাঢের প্রথম দিনে
বপ্রকেলি করে শোভন গজরাজ আনত পর্বতগাত্রে ।

৩

কামের উদ্রেক যে করে, সেই মেঘে সহসা দেখে তার সমুখে
যক্ষ কোনোমতে চোখের জল চেপে ভাবলে মনে-মনে বহুখন :
নবীন মেঘ দেখে মিলিত সুখীজন তারাও হ'য়ে যায় অন্যমনা,
কী আর কথা তবে, যদি সে দূরে থাকে যে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন

৪

কেমনে প্রিয়তমা রাখবে প্রাণ তার অদূরে উদ্যত শ্রাবণে
যদি-না জলধরে বাহন ক'রে আমি পাঠাই মঙ্গল-বার্তা ?
যক্ষ অতএব কুড়চি ফুল দিয়ে সাজিয়ে প্রণয়ের অর্ঘ্য
স্বাগত-সম্ভাষ জানালে মেঘবরে মোহন, প্রীতিময় বচনে ।

৫

বাতাস, জল, ধোঁয়া এবং আলোকের কোথায় মেঘরূপী সমবায়,
কোথায় ইন্দ্রিয়ে সুপটু, সজ্ঞান প্রাণীর প্রাপণীয় সমাচার !
এ-ভেদ ভুলে গিয়ে ব্যগ্র বিরহী সে জানালে মেঘে তার যাচনা,
চেতনে-অচেতনে দ্বৈত অবলোপ, তা-ই তো কামুকের স্বাভাবিক ।

৬

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥

৭

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা॥

৮

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ॥

৯

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥

১০

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি॥

৬

হে মেঘ, জানি আমি ভুবনবিশ্রুত তুমি যে পুষ্কর-আবর্তের
বংশে জাত, আর সেবক ইন্দ্রের, ইচ্ছেমতো নাও নানান রূপ।
দৈব প্রতিকূল, বন্ধু বহু দূরে, তোমার কাছে আমি প্রার্থী,
গুণীরে অনুনয় বিফল সেও ভালো, অধমে বর দিলে নিতে নেই।

৭

প্রিয়ার বাহু থেকে কঠিন বিচ্ছেদ কুপিত ধনপতি ঘটালেন,
আমার সমাচার, পয়োদ, নিয়ে যাও, তুমি যে তাপিতের আশ্রয়।
যক্ষপুরে যাবে, অলকা নাম, তার আছেন উদ্যানে শম্ভু,
সৌধশ্রেণী তার চন্দ্রমৌলির ললাট-জ্যোৎস্নায় ধৌত

৮

যখন আরোহণ করবে বায়ুপথে, পথিকবনিতারা অলক তুলে
গভীর প্রত্যয়ে দেখবে তোমাতেই প্রিয়ের আগমন-আশ্বাস।
আমার মতো নয় যে-জন পরাধীন, বলো তো সে কি পারে দয়িতার
বিরহভারাতুর ব্যথা না-ক'রে দূর গগনে তুমি যবে উদিত?

৯

যেমন অনুকূল পবন ধীরে-ধীরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তোমাকে,
এবং বাম দিকে গরবী চাতকেরা ঐকতান তোলে মধুময়,
তেমনি নভতলে গর্ভাধানকালে মালার মতো বাঁধা বলাকা
সহজ অভ্যাসে, হে প্রিয়দরশন, করবে আপনাকে সেবায় সুখী।

১০

অবাধ গতি নাও, জলদ, চ'লে যাও, যেখানে একমনা ভ্রাতৃবধূ
দিবস-গণনায় এখনো বেঁচে আছে — বন্ধু, তুমি তাকে দেখবে।
ফুলের মতো মৃদু হৃদয় রমণীর অচিরে বিচ্ছেদে ভেঙে যায়,
কী আর আছো, বলো, আশার বাঁধ বিনা, যা তাকে রাখে তবু বাঁচিয়ে

১১

কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাদ্বিসকিশলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥

১২

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥

১৩

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥

১৪

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥

১৫

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তাদ্-
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥

১১

প্রভাবে হয় যার পৃথিবী উর্বর, এবং ভ'রে ওঠে শিলীন্ধ্রে,
শ্রবণ-রমণীয় তোমার সেই নাদ শুনবে চঞ্চল মরাল-দল,
মানস-উৎসুক, পাথেয়রূপে নেয় মৃণালকিশলয়খণ্ড —
আকাশ-পথে, সখা, আকৈলাস ওরা তোমার হবে সহযাত্রী।

১২

ভুবন-পূজনীয় রাঘব-পদরেখা রয়েছে আঁকা যার মেখলায়,
তোমার প্রিয় সখা তুঙ্গ এই গিরি, বিদায় বলো তাকে তাহ'লে।
নিত্য কালে-কালে প্রাবৃট দেখা দিলে তোমার সঙ্গ সে ফিরে পায়,
নিহিত স্নেহ তার বিরহসঞ্চিত উষ্ণ আঁখিজলে ব্যক্ত।

১৩

প্রথমে শোনো, মেঘ, বলছি আমি সব, যোগ্য পন্থার বিবরণ,
আমার সমাচার শুনবে তার পরে, করবে পান তুমি শ্রবণে।
শ্রান্ত হবে যেই, পা রেখো বিশ্রামে উদার পর্বতশৃঙ্গে,
শীর্ণ যদি হও, তখনই পান কোরো নদীর অতি লঘু কোমল জল

১৪

তোমার উৎসাহ দেখবে মুখ তুলে মুগ্ধ অপ্সর-অঙ্গনারা.
চমকে মনে-মনে ভাববে বায়ু বুঝি হরণ ক'রে নিলো অ'দ্রি!
আর্দ্র বেতসের আবাস এই স্থল ছাড়িয়ে, উত্তর-আকাশে
যাত্রা করো, পথে এড়িয়ে সংঘাত বিপুল দিঙ্‌নাগহস্তের।

১৫

উইয়ের ঢিবি থেকে বেরিয়ে এলো এই ইন্দ্রধনুকের টুকরো,
রত্ন বহুবিধ মেশায় আভা যবে, তেমনি অভিরাম নয়নে;
তোমার শ্যাম তনু কান্তি পাবে তাতে মোহন ভঙ্গিতে উজ্জ্বল,
ময়ূরপুচ্ছের দীপ্ত প্রসাধনে যেমন গোপবেশী বিষ্ণু।

১৬

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥

১৭

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ

১৮

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥

১৯

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥

২০

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥

১৬

জানে না ভ্রূবিলাস, নয়ন স্নেহময়, সরল জনপদবধূরা
তোমাতে নির্ভর কৃষির, তা-ই জেনে করবে দৃষ্টিতে তোমাকে পান
লাঙল পেয়ে হোক সুরভি মালভূমি, তোমার বর্ষণে ধন্য,
এবার লঘু হ'য়ে খানিক পশ্চিমে, আবার দিক নাও উত্তর।

১৭

তোমার ধারাজলে ভীষণ দাবদাহ নিবলো যার, সেই আম্রকূট
সাদরে নেবে টেনে তোমাকে বুকে তার, জুড়োবে ভ্রমণের পরিশ্রম ;
বন্ধু যদি চায় শরণ, তবে তার অতীত-উপকার-স্মরণে
ক্ষুদ্রজন সেও থাকে না উদাসীন, কী আর কথা তবে মহতে

১৮

প্রান্ত ছেয়ে আছে আম্রবনরাজি, ঝলক দেয় তাতে পক্ক ফল,
বর্ণে চিক্কণ বেণীর মতো তুমি আরূঢ় হ'লে সেই শৃঙ্গে —
দৃশ্য হবে যেন ধরার স্তনতট, অমরমিথুনের ভোগ্য,
গর্ভসূচনায় মধ্যে কালো আর প্রান্তে পাণ্ডুর ছড়ানো

১৯

কুঞ্জে ভ্রমে যার বন্য বধূগণ, ক্ষণেক থেকো সেই শৈলে,
মোচন ক'রে বারি ত্বরান্বিতগতি, নতুন পথে উত্তীর্ণ,
দেখবে নদী এক বিন্ধ্যশৈলের উপলবন্ধুর চরণে —
হাতির গায়ে আঁকা চিত্রলেখা যেন শীর্ণ রেবা সেই বিসর্পিতা

২০

যখন বর্ষণ ফুরোবে, পান কোরো তীব্রসৌরভ রেবার জল,
জামের বনে যার আঘাত লাগে, আর বন্য গজমদগন্ধে ভরা।
বিফল হবে বায়ু তোমার পরাভবে, হে মেঘ, যদি হও সারবান,
কেবল পূর্ণতা দেয় যে গৌরব, লঘুতা রিক্তেরই লক্ষণ।

২১

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্ ।
জগ্ধ্বারণ্যেঽধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥

*২২

অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি ॥

২৩

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিয়াসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে ।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥

২৪

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ-
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥

২৫

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা ।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি ॥

২১

নব কদম্বের সবুজ-পিঙ্গল অর্ধবিকশিত বর্ণ
দ্যাখে যে-মৃগদল, নেয় অরণ্যের মাটির আমোদিত আঘ্রাণ,
এবং মুকুলিত সদ্য ভুঁইচাঁপা জলার ধারে করে ভক্ষণ —
হে মেঘ, জলকণা-মোচনে উন্মুখ, তোমার হবে তারা দিশারী।

*২২

বিন্দুবর্ষণ-গ্রহণে সুনিপুণ চাতকদলে করে দর্শন,
দেখায় গুনে-গুনে বকের পঙক্তির বদ্ধশৃঙ্খল বিন্যাস —
সে-সব কিন্নর তোমাকে সম্মান জানাবে, গর্জনসময়ে
বেপথুমতী প্রিয় সখীর শঙ্কিত আলিঙ্গন পেয়ে সহসা।

২৩

যদিও জানি, তুমি আমার প্রিয় কাজে অচির যাত্রায় উৎসুক,
দেখছি তবু সব কুটজসৌরভে মোদিত পর্বতে কাটবে কাল ;
সজল চোখে ক'রে তোমার অর্চনা তুলবে কেকারব ময়ূরগণ,
বিদায়কালে দেবে এগিয়ে কিছু পথ — ত্বরার তবু কোরো চেষ্টা

২৪

তোমার আগমনে হবে দশার্ণেই যাত্রী হংসের বিশ্রাম,
কাননে বেড়াগুলি পাণ্ডু ক'রে দিয়ে ফুটবে থরে-থরে কেতকী,
গ্রামের পথে-পথে আকুল হবে তরু কাকের বাসা-বাঁধা ঝাপটে,
পক্ব, পরিণত, প্রচুর জম্বুতে শ্যামল হবে বনপ্রান্ত।

২৫

বিদিশা নাম, সারা ভুবনে বিখ্যাত, যখন যাবে রাজধানীতে,
তখনই পাবে, মেঘ, সকল উপচারে কামুকবৃত্তির পূর্ণফল।
তটের কলতানে রূপসী রমণীর ভুরুর ভাঙ্গিমা যে দেয় এঁকে,
ঊর্মি-চঞ্চল বেত্রবতী সে-ই — করবে পান তার মধুর বারি।

২৬

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্‌গারিভির্নাগরাণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি॥

২৭

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥

২৮

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥

২৯

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ।
নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু॥

৩০

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী-
কার্শ্যং য়েন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ

২৬

নীচৈ নামে গিরি সেখানে আছে, তার শিখরে বিশ্রামে নামবে,
তোমার স্পর্শের পুলকে ফোটাবে যে নব কদম্বের গুচ্ছ,
বারাঙ্গনাদের অঙ্গপরিমলে লিপ্ত শিলাগৃহ যেখানে
রটনা ক'রে দেয় পৌর পুরুষের মত্ত, উত্তরোল যৌবন।

২৭

শ্রান্তি দূর ক'রে যাত্রা কোরো পুন, কিন্তু নদীতীরবর্তী
কাননে জলকণা ছিটিয়ে যেয়ো, মেঘ, তরুণ যূথিকার কোরকে ;
কপোলে স্বেদ মুছে ক্লান্ত হ'লো যারা, মলিন হ'লো কানে পদ্মকলি,
আননে ছায়া ফেলে ক্ষণেক দেখে নিয়ো পুষ্পচায়িকা সে-মেয়েদের।

২৮

জেনেছো, উত্তরে তোমার অভিযান ; যদি বা পথ হয় বক্র,
ভুলো না দেখে নিতে উজ্জয়িনীপুরে সৌধসমূহের উপরিতল ;
সেখানে সুন্দরী আছেন যাঁরা, তুমি তাঁদের চঞ্চল চাহনির
স্ফুরিত বিদ্যুতে না যদি প্রীত হও, হবে যে বঞ্চিত নিদারুণ।

২৯

দেখবে যেতে-যেতে স্খলিত, মনোরম ভঙ্গি নেয় নির্বিন্ধ্যা,
ঢেউয়ের সংঘাতে মুখর বিহগেরা রচনা করে তার কাঞ্চীদাম,
ঘূর্ণি নাভি তার দেখায়, তুমি তাই সরস হবে তার সন্নিপাতে,
জানো তো হাবেভাবে আগে অনুরাগ জানায় দয়িতেরে প্রমদা।

৩০

বেণীর মতো ক্ষীণ জলের ধারা যার তোমারই ভাগ্যের ঘোষণা,
তটজ বৃক্ষের জীর্ণ পাতা ঝ'রে পাণ্ডু হ'লো যার বর্ণ,
তোমার কারণে যে বিরহলক্ষণ ধারণ ক'রে আছে অঙ্গে —
যাতে সে-তটিনীর কার্শ্য হয় দূর, এবার করো সেই চেষ্টা !

৩১

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্ ।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥

৩২

দীর্ঘীকুর্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ ॥

৩৩

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ ।
হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথাঃ
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥

৩৪

ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য ।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥

৩৫

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্ ॥

৩১

যাবে অবন্তীর পুরীতে, বৃদ্ধেরা যেখানে উদয়ন-কথাবিদ,
বলেছি পূর্বেই ঋদ্ধিশালী সেই নগর বিশালার গৌরব ;
স্বর্গবাসীদের পুণ্য হ'লে ক্ষয় যা থাকে সুকৃতির অবশেষ,
প্রভাবে তারই যেন এনেছে ধরাধামে স্বর্গকণা এক কান্তিমান

৩২

ফুল্ল কমলের গন্ধে আমোদিত শিপ্রাবায়ু সেথা প্রভাতে
ছড়িয়ে দেয় দূরে হৃষ্ট সারসের মধুর, অস্ফুট কাকলি ;
প্রার্থী প্রণয়ীর মতোই চাটুকার, অঙ্গে অনুকূল সে-অনিল
সোহাগে ধীরে-ধীরে ভোলায় মেয়েদের রতির উত্তরক্লান্তি

৩৩

সেথায় বাতায়নে কেশের প্রসাধনে গন্ধধূপ উদ্গীর্ণ,
পুষ্ট তাতে, পাবে প্রীতির উপহার, পালিত ময়ূরের নৃত্য ;
শ্রান্তি হবে দূর, ভাখো এ-লক্ষ্মীরে পুষ্পসুরভিত ভবনে,
যেখানে আঁকা আছে ললিতা বনিতার অলক্তকরাগচিহ্ন।

৩৪

ত্রিলোকগুরু যিনি দেবাদিদেব, তাঁর পুণ্যধামে যেতে ভুলো না,
নিকটে নদী বয়, স্নিগ্ধ বায়ু তার আন্দোলিত করে উদ্যান,
সঙ্গে আনে বাস পদ্মপরাগের, যুবতী-জলকেলি-সৌরভ ; —
প্রভুর কণ্ঠের বর্ণ ধরো, তাই দেখবে সমাদরে প্রমথগণ।

৩৫

হে মেঘ, মহাকাল-দেউলে দৈবাৎ অন্য কালে যাও যদি বা,
তবুও থেকো তুমি, যাবৎ দৃষ্টির না হয় অগোচর সূর্য ;
সান্ধ্য আরতির লগ্নে তুমি যদি হও মৃদঙ্গের প্রতিভূ ;
মন্দ্র, গম্ভীর, শ্লাঘ্য নিনাদের পুণ্যফল পাবে অবিকল।

৩৬

পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূ-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥

৩৭

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥

৩৮

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥

৩৯

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥

৪০

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াশ্রুং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥

৩৬

তখন বেশ্যারা, নাচের তালে যারা তুলছে মেখলায় নিক্কণ,
সলীল ভঙ্গিতে রত্নছায়াময় চামর নেড়ে যারা ক্লান্ত,
তোমার দিকে তারা হানবে চাহনির দীর্ঘ মধুকর-পঙক্তি
কেননা নখক্ষতে পরশে আনে সুখ প্রথম বৃষ্টির বিন্দু।

৩৭

উত্তোলিত বাহু বন্য তরু যেন, নৃত্যে উদ্যত শম্ভু —
তখন হবে তুমি সন্ধ্যাকিরণের জবায় রক্তিম মণ্ডল ;
ব্যাপ্ত তুমি, তাই তৃপ্ত হবে তাঁর আর্দ্র অজিনের বাসনা,
তোমার ভক্তিরে শান্ত, অনিমেষ নয়নে দেখবেন ভবানী

৩৮

সেখানে প্রণয়ীর ভবনে রমণীরা চলেছে পুঞ্জিত আঁধার ঠেলে
বিজন রাজপথে, তামসী যামিনীতে, দৃষ্টিবিরহিত চরণে —
দেখিয়ে নিয়ো পথ স্নিগ্ধ বিদ্যুতে নিকষে কনকের তুল্য,
কিন্তু বর্ষণ অথবা গর্জন কোরো না, তারা অতি ভয়াতুর !

৩৯

পত্নী বিদ্যুৎ ক্লান্ত হ'লে পরে ঝলক তুলে-তুলে অনেক বার,
বিরাম নিয়ো কোনো ভবন-বলভিতে, যেখানে কপোতেরা সুপ্ত ;
সূর্য দেখা দিলে আবার বাকি পথে যাত্রা শুরু হোক আপনার —
বন্ধুবিনোদনে অঙ্গীকৃত জন পথে কি দেরি করে কখনো !

৪০

তখন খণ্ডিতা নারীর আঁখিজল শান্ত ক'রে দেবে প্রণয়ী ;
সূর্য ফিরে এসে সিক্ত নলিনীর কমল-মুখ থেকে সরাবে
শিশির-অশ্রুর চিহ্ন — অতএব ত্বরিতে ছেড়ে দিয়ো সেই পথ ;
বন্ধু, পাবে তাঁর তীব্র বিদ্বেষ রুদ্ধ করো যদি রশ্মি।

৪১

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্যা-
ন্মোঘীকর্তুং চটুলশফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি ॥

৪২

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥

৪৩

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥

৪৪

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥

৪৫

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ ॥

৪১

বরং গম্ভীরা নদীর অন্তরে প্রবেশ কোরো তুমি, হে সুন্দর!
অমল হৃদয়ের মতো সে-জলধারা তোমার ছায়ারূপে ধন্য হোক।
চটুল পুঁটিমাছ লাফিয়ে চলে যেন, ধবল কুমুদের কান্তি —
তেমনি তার চোখে চাহনি, তুমি তায় কোরো না নিষ্ফল ধৈর্য ধ'রে।

৪২

বসন ধ'রে আছে শিথিল হাতে যেন, তেমনি ঝুঁকে আছে বেতের শাখা,
মুক্ত কোরো, সখা, তটনিতম্বেরে সরিয়ে দিয়ে নীল-সলিল-বাস;
সহজে প্রস্থান হবে না সম্ভব, তুমি যে তার 'পরে লম্বমান,
বিবৃতজঘনার বারেক পেলে স্বাদ কে আর পারে, বলো, ছাড়াতে!

৪৩

যখন যাবে দেবগিরিতে, বাতাসের বীজন পাবে মৃদুমন্দ,
সে-বায়ু রমণীয় তোমারই বৃষ্টিতে সদ্যপুলকিত মাটির ঘ্রাণে,
নাসিকারন্ধ্রের মধুর বৃংহিতে গন্ধ নেয় তার হাতির পাল,
সহজ বনজাত ডুমুর পেকে ওঠে শীতল তার সৌজন্যে।

৪৪

সেখানে নিত্যই আছেন কার্তিক, অধীন তাঁর সব ইন্দ্রসেনা;
মূর্ত করেছেন, চন্দ্রমৌলির যে-তেজ হুতাশনে নিহিত,
পরাক্রমে তাঁর সূর্য হার মানে। পুষ্পমেঘরূপে আপনি
আকাশগঙ্গার আর্দ্র ফুলদলে, হে মেঘ তাঁকে স্নান করাবেন।

৪৫

মন্দ্র গরজনে শৈল মেখলায় প্রতিধ্বনি তুলে অতঃপর
নাচাবে পাবকির ময়ূরটিকে, যার স্খলিত, উজ্জ্বল পুচ্ছ
গৌরী প'রে নেন পুত্রস্নেহবশে, কর্ণে, কুবলয়কলির পাশে —
এবং ধবলিত নয়ন-কোনা যার শিবের ললাটের জ্যোৎস্নায়।

৪৬

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্।

৪৭

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্॥

৪৮

তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্॥

৪৯

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি॥

৫০

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাং সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা-
মন্তঃশুদ্ধস্ত্বমসি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ॥

৪৬

নিলেন শরবনে জন্ম যে-দেবতা, সাঙ্গ হ'লে তাঁর ভজনা,
এড়াতে জলকণা, দেবেন ছেড়ে পথ সবীণ সিদ্ধেরা সকলে ;
যোগ্য সম্মান দিয়ো সে-কীর্তিরে, গেছেন রেখে সেথা রন্তিদেব —
সুরভিসন্তান-নিধনে পরিণত নদীর স্রোতে ক'রে অবতরণ।

৪৭

যখন হবে নত জলের 'পরে, তুমি শার্ঙ্গী বিষ্ণুর বর্ণচোর,
গগনচারীগণ, অনেক দূরে ব'লে, দৃষ্টিনিক্ষেপে নিশ্চয়
দেখবে সে-বিপুল নদীরে ক্ষীণতনু ; যেন এ-পৃথিবীর কণ্ঠে
একক লহরের মুক্তামালা দোলে, মধ্যমণি তার ইন্দ্রনীল।

৪৮

সে-নদী পার হ'লে তোমার কান্তিরে কৌতূহলে-ভরা চক্ষে
দেখবে দশপুরবধূরা, ভ্রূলতার বিলাসে যারা অভ্যস্ত,
যাদের পক্ষের চটুল উৎক্ষেপে ধবলে শোভা পায় কৃষ্ণ,
কুন্দকুসুমের আন্দোলনে যেন মুগ্ধ মধুকর ধাবমান।

৪৯

ব্রহ্মাবর্তের প্রথিত জনপদ, একদা যেথা কুরুক্ষেত্রে
কমলদলে তুমি যেমন ঢালো জল, তেমনি অবিরল শরজাল
শাণিত বিক্রমে শত রাজন্যের আননে হেনেছেন অর্জুন —
এবার ছায়ারূপে যাবে সে-যুদ্ধের অস্ত্রচিহ্নিত ভূমিতে।

৫০

বন্ধুপ্রীতিবশে যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ছিলেন যিনি, সেই বলরাম
সরিয়ে মনোমতো মদিরা, যাতে আঁকা রেবতীনয়নের বিম্ব,
নিতেন যার স্বাদ — সৌম্য, তুমি সেই সরস্বতী-বারি ভুলো না —
সেবন ক'রে হবে হৃদয়ে নির্মল, বর্ণে শুধু র'বে কৃষ্ণ।

৫১

তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জাহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্র, ভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা॥

৫২

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্ধলম্বী
ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগতযমুনাসংগমেবাভিরামা॥

৫৩

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্॥

৫৪

তঞ্চেদ্‌বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসংঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-
রাপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্॥

৫৫

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ॥

৫১

ঐ যে হিমাচল, নিকটে কনখল, গা বেয়ে নামে তার গঙ্গা,
জহ্নু-দুহিতা সে, সগরবংশের স্বর্গযাত্রায় যেন সোপান ;
গৌরী তাকে যত ভ্রূকুটি করেছেন, তত সে ফেনময় হাস্যে
ঢেউয়ের মুঠি তুলে ধরেছে শম্ভুর ইন্দু-জ্বলা কেশগুচ্ছ ।

৫২

আকাশে পশ্চাৎ এলিয়ে দিয়ে তুমি, আকারে যেন এক ঐরাবত,
বক্র হ'য়ে পান করবে যদি ভাবো স্ফটিক-নির্মল সেই জল,
তাহ'লে তার স্রোতে তোমার ছায়ারূপ তখনই হবে বিস্তীর্ণ,
যেমন অস্থানে নয়ন-অভিরাম গঙ্গা-যমুনার সংগম ।

৫৩

আসীন মৃগদের নাভির সৌরভে মোদিত হয় যার শিলাতল,
তুষারে সমাহিত ধবল সেই গিরি গলিত গঙ্গার উৎস ;
শ্রান্ত হে পথিক, শিখরে তুমি তার বিরাম নিলে পাবে সেই রূপ
ধবল হরবৃষশৃঙ্গে উৎখাত যেমন শোভা পায় কর্দম ।

৫৪

চমরী-রোমরাজি দগ্ধ করে যার বাতাসে ধাবমান স্ফুলকি,
সরল বৃক্ষের স্কন্ধ-ঘর্ষণে অভ্যুদিত সেই দাবানল
দুঃখ দেয় যদি নগাধিরাজে, তুমি বিপুল বারিপাতে নিবিয়ো,
কেননা পীড়িতের আর্তিনিবারণে বিত্ত সার্থক মহতের ।

৫৫

মুক্ত ক'রে দিলে তাদের গতিপথ, অথচ আক্রোশে বেগবান
লম্ফ দিয়ে উঠে শরভদল যদি আক্রমণ করে তোমাকে,
তখনই উত্তরোল শিলার বর্ষণে অঙ্গ ক'রে দিয়ো চূর্ণ —
চেষ্টা পায় যেবা অসম্ভবে, তার ঘটবে পরাজয় নিশ্চয় ।

৫৬

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্ধ্বমুদ্ধূতপাপাঃ
সংকল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ॥

৫৭

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্যমাণাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সংগীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ॥

৫৮

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ॥

৫৯

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

৬০

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব॥

৫৬

সেখানে প্রস্তরে ব্যক্ত শিবপদ ভক্তিভরে কোরো প্রদক্ষিণ —
সিদ্ধগণ যাকে নিত্য পূজা দেন, এবং পেয়ে যার দর্শন
সকল পাপ থেকে মুক্ত হয় সে-ই, হৃদয়ে যার আছে শ্রদ্ধা,
মরণ-পরপারে পায় চিরন্তন পুণ্য প্রমথের পদবি।

৫৭

বাতাসে ভরপুর বেণুর সুমধুর শব্দ ওঠে সেথা অবিরাম,
সকল কিন্নরী মিলিত সমসুরে ত্রিপুরজয় করে কীর্তন ;
বাজাও তুমি যদি পাষাণ-কন্দরে গভীর ধ্বনিময় পাখোয়াজ,
তবেই পশুপতি পাবেন উপচার পূর্ণ সংগীত-বাদ্য।

৫৮

পেরিয়ে হিমালয়তটের বিস্ময়, হংসদ্বার পাবে সমুখে,
ক্রৌঞ্চরন্ধ্র সে, পরশুরাম যাতে যশের পেয়েছেন পন্থা —
দীর্ঘ, তির্যক তুমিও সেই পথে আবার উত্তরে চলবে,
শোভন যেন শ্যাম চরণ বিষ্ণুর, সমুদ্যত বলিদমনে।

৫৯

শিথিল সানু যার রাবণ-বিক্রমে, দ্যুলোকবনিতার দর্পণ —
তুঙ্গতর সেই ধবল কৈলাসে অতিথি হোয়ো তুমি ক্ষণকাল ;
মহান তার চূড়া ব্যাপ্ত করে নভে শুভ্র কুমুদের কান্তি,
নিত্য-জ'মে-ওঠা অট্টহাসি যেন রাশি করেছেন ত্র্যম্বক।

৬০

সদ্য-কেটে-আনা দ্বিরদ-দন্তের গৌর আভা যার তনুতে
সে-গিরিতটে যবে আগত হবে তুমি দলিত-অঞ্জন-বর্ণ,
দেখাবে মনোরম শ্যামল বাস যেন, যা তাঁর কাঁধে নেন বলরাম —
বন্ধু, আমি জানি তখন হবে তুমি নির্নিমেষে দ্রষ্টব্য।

৬১

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী॥

৬২

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্‌ঘট্টনোদ্‌গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ঘর্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ॥

*৬৩

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্॥

৬৪

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্‌গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্॥

৬১

রম্য সে-গিরিতে গৌরী সেইক্ষণে করেন যদি পদচারণা,
কাটাতে ভয়, খুলে সাপের কঙ্কণ, ধরেন পাণি তাঁর শম্ভু —
এগিয়ে যেয়ো তুমি, কিন্তু অন্তরে রুদ্ধ রেখো সব বৃষ্টিবেগ,
ক্রমশ ধাপে-ধাপে এলিয়ে দিয়ে তনু, সোপান হ'য়ে যেয়ো মণিতটের।

৬২

সেখানে নিশ্চয়ই স্বর্গযুবতীরা বলয়কুলিশের আঘাতে
উদ্‌গিরিত জলে রচনা ক'রে নেবে তোমাতে স্নানধারাযন্ত্র ;
গ্রীষ্মে খরতাপে তোমাকে পেয়ে তারা না যদি দিতে চায় মুক্তি,
রূঢ় গরজনে দেখিয়ো ভয় সেই আমোদে মাতোয়ারা মেয়েদের।

*৬৩

সোনার অম্বুজ ফোটে যে-সরোবরে, সে-বারি পান কোরো কখনো,
ঐরাবতে দিয়ো ক্ষণিক সুখ, তার আননে টেনে দিয়ে গুণ্ঠন,
কাঁপিয়ো বায়ুবেগে কল্পপাদপের সূক্ষ্ম-অংশুক-পল্লব —
হে মেঘ, এইমতো বিবিধ বিনোদনে কোরো সে-পর্বতে উপভোগ।

৬৪

প্রণয়ী কৈলাস, এলিয়ে আছে কোলে বিমান-মনোরমা অলকা,
গঙ্গা নামে তার স্রস্ত অঞ্চল, প্রাসাদচূড়া তার বর্ষায়
ধারণ করে মেঘ — মুক্তাজালে গাঁথা যেমন কামিনীর কেশদাম ; —
স্বৈরী, তুমি সেই পুরীকে পুনরায় চিনতে পারবে না ভেবো না।

উত্তরমেঘ

চিহ্নিত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ব'লে অনুমিত

৬৫

বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদস্থাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥

৬৬

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥

*৬৭

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥

*৬৮

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্‌বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥

৬৯

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥

৬৫

রয়েছে বিদ্যুৎ ললিত বনিতায়, ইন্দ্রধনু গৃহচিত্রে,
গানের আয়োজনে প্রহত পাখোয়াজে স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ,
স্বচ্ছ ভূমিতল সজল মনে হয়, লেহন করে মেঘে তুঙ্গ চূড়া —
সৌধাবলি যেথা এ-সব লক্ষণে তোমারই অবিকল তুলনা।

৬৬

হস্তে ধৃত লীলাকমল, কুন্তলে কুন্দকলি বিন্যস্ত,
পাণ্ডুরতা পায় মুখের মধুরিমা লোধ্রকুসুমের রেণুতে,
তরুণ কুরুবকে কবরী ধরে শোভা, শিরীষ দোলে চারু কর্ণে,
এবং তুমি যাকে ফোটাও, সেই নীপে সিঁথির প্রসাধন মেয়েদের।

*৬৭

যেথায় তরুগণ নিয়তপুষ্পিত, মুখর উন্মাদ ভোমরায়,
নিত্য পদ্মের বিকাশ নলিনীতে, মরালশ্রেণী তার মেখলা,
ময়ূর নিত্যই কলাপে উজ্জ্বল, এবং কেকারবে উদ্‌গ্রীব,
নিত্য জ্যোৎস্নায় আঁধার কেটে যায়, তাই তো মনোরম সন্ধ্যা

*৬৮

অন্য হেতু নেই — যেথায় আঁখিজল স্খলিত হয় শুধু পুলকে,
অন্য তাপ নেই — কেবল কামজ্বর, দয়িত কাছে এলে কেটে যায়,
প্রণয়-অভিমান ব্যতীত অন্তত কখনো বিচ্ছেদ ঘটে না,
যেথায় যৌবন ব্যাপ্ত আজীবন, অন্য বয়সের দেখা নেই।

৬৯

তারার ছায়া দেয় ছড়িয়ে ফুলদল, ধবল মণিময় কুট্টিম,
যেথায় যক্ষেরা মিলিত, মনোমতো রূপসী বনিতার সঙ্গে,
সেবন করে ধীরে কল্পবৃক্ষের প্রসূত রতিফলমদ্য
মৃদু মৃদঙ্গের বাদনে কোটে যবে তোমারই গম্ভীর মন্দ্র।

*৭০

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥

৭১

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু ।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥

৭২

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং স্বজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ-
র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণাঃ জর্জরা নিষ্পতন্তি ॥

৭৩

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥

*৭৪

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্ধম্ ।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি ॥

*৭০

যেথায় কন্যারা, অমরবাঞ্ছিতা, কনকসৈকতে ছুঁড়ে দেয়
হাতের মুঠো ভ'রে রত্নরাজি, পুন খেলাচ্ছলে করে সন্ধান,
এবং সেবা পায় শীতল অনিলের, মন্দাকিনী-বারি-স্পৃষ্ট,
বারণ করে তাপ ছায়ার বিস্তারে তটজ মন্দারবীথিকা।

৭১

আকুল প্রণয়ীরা আবেগভরে যেথা উচ্ছ্বসিত হাতে সহসা
নীবির বন্ধন খসিয়ে, ক'রে দেয় ক্ষৌম অংশুক স্রস্ত,
বিম্বাধরাগণ, বিমূঢ় লজ্জায়, তখনই কুঙ্কুমচূর্ণ,
যদিও ছুঁড়ে দেয় দীপ্ত মণিদীপে, বিফল হয় সেই চেষ্টা।

৭২

উচ্চ বিমানের অন্তঃপুরে যেথা তোমারই অনুরূপ মেঘেরা
সততগতিশীল বায়ুর চালনায় অবাধে নীত হয় কখনো —
স্বজলকণিকার সংক্রমণে তারা দূষিত ক'রে দিয়ে চিত্রাবলি,
সদ্য শঙ্কায় পলায় বাতায়নে, ধোঁয়ার অনুকারে, শীর্ণ।

৭৩

তোমায় আবরণ কখনো স'রে গেলে, অমল ইন্দুর কিরণে,
বিতানে লম্বিত চন্দ্রমণিদাম ক্ষরণ ক'রে জলবিন্দু,
নিশীথে মুছে নেয় সে-সব নায়িকার লকশৃঙ্গার ক্লান্তি,
শিথিল বাহুপাশে যাদের প্রণয়ীরা আলিঙ্গনে হ'লো ভ্রষ্ট।

*৭৪

যেথায় যক্ষেরা, যাদের ঘরে আছে ধনের অক্ষয় ভাণ্ডার,
বেড়ায়, বারমুখী বিবুধবনিতার সঙ্গে আলাপনে বদ্ধ,
উদার বৈভ্রাজ-কাননে প্রতিদিন ; — এবং সমবেত কিন্নর
উচ্চ, রঞ্জিত কণ্ঠে তুলে তান যশের গাথা গায় ধনপতির।

*৭৫

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥

৭৬

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্ ।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥

*৭৭

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিশলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্ ।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥

৭৮

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন ।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥

৭৯

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥

*৭৫

গতির কম্পনে কবরীপাশ থেকে ভ্রষ্ট মন্দারপুষ্প,
কর্ণবিচ্যুত সোনার শতদল, স্তনের উচ্ছ্বাসে ছিন্ন হার,
মুক্তাজাল, আর খণ্ড পত্রিকা যেথায় সবিতার উদয়ে
সূচনা ক'রে দেয় বিবিধ লক্ষণে নৈশ অভিসার মেয়েদের।

৭৬

কুবেরসখা শিব স্বয়ং অধিবাসী, এ-কথা জেনে কন্দর্প
নেন না ভয়ে-ভয়ে প্রায়শ ধনু, যার ছিলায় মধুকরপঙক্তি
করেন তাঁর কাজ চতুর বনিতারা কামুকসন্ধানে নির্ভুল,
অমোঘ বিভ্রমে মিশিয়ে দৃষ্টিতে ভুরুর অপরূপ ভঙ্গি।

*৭৭

যেথায় ললনার সকল প্রসাধন প্রসব করে এক কল্পতরু—
রঙিন বেশবাস, ভূষণ নানামতো, পুষ্পবিকশিত কিশলয়,
অলক্তকরাগ, চরণকমলের প্রান্তে লেপনের যোগ্য,
এমন মধু, যার আদেশে দেখা দেয় নয়নে আবেশের বিভ্রম।

৭৮

দেখবে আমাদের ভবন উত্তরে, যক্ষরাজপুরী ছাড়িয়ে,
চিনবে দূর থেকে ইন্দ্রধনুকের তুল্য মনোরম তোরণে,
প্রান্তে আছে তার আমারই কান্তার পালিত কৃত্রিমপুত্র —
তরুণ মন্দার, স্তবকভারে নত, বাড়ালে হাত তাকে ছোঁয়া যায়।

৭৯

রয়েছে সরোবর, সোপানদাম তার কঠিন মরকতে রচিত,
কনক-শতদল প্রচুর প্রস্ফুট, মৃণালে জলে বৈদূর্য,
যদিও দূরে নয় মানস, তবু সেই সলিলবাসী সব হংস
তোমার উদয়েও অনুৎকণ্ঠিত, হবে না যাত্রায় তৎপর।

৮০

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥

৮১

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য ।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥

৮২

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্ বঃ ॥

৮৩

এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা ।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥

৮৪

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥

৮০

প্রমোদশৈলের ইন্দ্রনীলে গড়া শৃঙ্গ শোভা পায় তীরে তার,
কনককদলীর নিবিড় বেষ্টনে নয়ননন্দন দৃশ্য ;
তুমিও পরিবৃত স্ফুরিত বিদ্যুতে, বন্ধু, তা ই দেখে দুঃখে —
ঘরনী তাকে ভালোবাসেন ব'লে, আমি স্মরণ করি সেই শৈলে।

৮১

রেখেছে বেড়া দিয়ে ফুল্ল কুরুবক সেথায় মাধবীর বিতানে,
অদূরে কমনীয় বকুলতরু, আর কম্প্রকিশলয় রক্তাশোক ;
হে মেঘ, সে তোমার সখির বাম পদ আমারই মতো করে অভিলাষ,
অন্য জন তার দোহদ ছল ক'রে চায় যে বদনের মদিরা।

৮২

সে-দুটি বৃক্ষের মধ্যে শোভমান দেখবে কাঞ্চনযষ্টি,
ফলক স্ফটিকের, ভিত্তি মণিময়, তরুণ বেণু যেন বর্ণে,
দিনের অবসানে তোমার প্রিয় সখা ময়ূর এসে বসে সেখানে —
কণিত বলয়ের ললিত করতালে নাচায় তাকে যবে কান্তা।

৮৩

অবিস্মরণীয় এ-সব লক্ষণ, তোমারই হৃদয়ে যা নিহিত,
এবং দ্বারপাশে শঙ্খপদ্মের চিত্র দেখে তুমি চিনবে —
অধুনা যে-ভবন আমার বিচ্ছেদে মলিন হ'য়ে আছে নিশ্চয়,
কমল কখনো কি আপন রূপ ধরে সূর্য রয় যদি আড়ালে !

৮৪

সহজ প্রবেশের উপায় বলি, শোনো : কলভ-রূপ নিয়ে সদ্য
পূর্বকথিত যে-প্রমোদগিরি, তার রম্য সানুদেশে বসবে,
অল্পবিলসিত আভাসে সেজে, জ্বলে যেমন জোনাকির পুঞ্জ,
তেমনি বিজলির স্ফুরিত দৃষ্টিতে তাকাবে ভবনের মধ্যে।

৮৫

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥

৮৬

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥

৮৭

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্তি ॥

৮৮

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥

৮৯

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্-
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥

৮৫

তন্বী, শ্যামা, আর সূক্ষ্মদন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীণমধ্যা,
জঘন গুরু ব'লে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি,
অধরে রক্তিমা পক্ব বিম্বের, যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা,
সেথায় আছে সে-ই, বিশ্বস্রষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা।

৮৬

আমি-যে সহচর রয়েছি দূরে, তাই একেলা যেন এক চক্রবাকী,
ক্বচিৎ কথা বলে, দীর্ঘ দিনমান কাটায় ঘোর উৎকণ্ঠায়,
তুহিনমন্থনে যেমন পদ্মিনী, অন্যরূপা তাকে মনে হয় —
মেনেছি, সে আমার দ্বিতীয় প্রাণ; তাকে, জলদ, তা-ই ব'লে জানবে।

৮৭

ব্যাকুল, অবিরল রোদনে রঞ্জিত পরিস্ফীত তার চক্ষু,
অধর নয় আর স্বভাবরক্তিম, যেহেতু নিশ্বাস উষ্ণ;
ন্যস্ত কর আর স্রস্ত কেশদামে স্বল্প-প্রকাশিত প্রিয়ার মুখে
অধুনা মুকুরিত তোমার তাড়নায় পীড়িত ইন্দুর দৈন্য।

৮৮

বুঝি বা সেক্ষণে পূজায় মনোযোগী — দেখতে পাবে তাকে অচিরে,
অথবা অনুমানে আঁকছে প্রতিকৃতি বিরহে-ক্ষীণতনু আমারই,
শুধায় নতুবা সে — মঞ্জু বাণী যার, পিঞ্জরিতা সেই শারিকায়,
'সোহাগী তুই তাঁর, স্বামীরে কখনো কি পড়ে না মনে, ওলো রসিকা?'

৮৯

অঙ্কে নিয়ে বীণা, মলিন বেশবাসে হয়তো গান ধরে কখনো,
আমার নাম দিয়ে রচিত পদে এসে ব্যর্থ হয় সেই বাসনা;
চোখের জলে ভেজা বীণায় তার যদি পারে বা কোনোমতে চালাতে,
অনেক অভ্যাসে রক্ষত মূর্ছনা — তাও সে বার-বার ভুলে যায়।

৯০

শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ॥

৯১

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ॥

৯২

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্॥

৯৩

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্চাদয়ন্তীং
সাভ্রেহহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥

৯৪

নিঃশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোহপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্॥

৯০

রেখেছে প্রতিদিন ভবন-দেহলিতে একটি ক'রে ফুল সাজিয়ে,
ভূমিতে রেখে তা-ই গণনা করে, আর ক-মাস বাকি আছে বিরহের ;
কিংবা সে আমার সঙ্গ করে ভোগ, কল্পনায় যার জন্ম —
প্রায়শ এইমতো বিনোদ খুঁজে নেয় রমণবিরহিণী মেয়েরা।

৯১

ব্যাপৃত দিবাকালে তোমার সখী নয় বিরহভারে তত খিন্ন,
কিন্তু মানি ভয়, বিনোদব্যতিরেকে দুঃখে ভরা তার যামিনী ;
দেখবে সাধ্বীরে ভূতলশয্যায়, নিদ্রালেশ নেই চক্ষে ;
মহৎ সুখ দিয়ো, সৌধবাতায়নে আমার সমাচার জানিয়ে।

৯২

বিরহশয্যায় শুয়েছে একপাশে, শীর্ণ তনু মনোকষ্টে,
পূর্বাকাশে যেন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের শেষ কলা উদিত,
আমাকে নিয়ে তার যে-নিশি কেটে গেছে স্বেচ্ছাশৃঙ্গারে ক্ষণিকে,
এখন বিচ্ছেদে দীর্ঘায়িত হ'য়ে অশ্রুজলে হয় অবসান।

৯৩

এখনো জানালায় শীতল চন্দ্রমা ছড়ায় অমৃতের স্পর্শ,
পূর্বপ্রীতিবশে দৃষ্টি ছোটে তায়, কিন্তু ফিরে আসে তখনই,
অশেষ বেদনায় নয়ন ঢেকে যায় অশ্রুভারাতুর পক্ষ্মে —
মেঘলা দিনে যেন মলিন কমলিনী, জেগেও নেই, নেই ঘুমিয়ে।

৯৪

শুদ্ধস্নান করে, অলক অতএব রুক্ষ হ'য়ে, বিস্রস্ত,
কপোলে নেমে আসে, তাপিত নিশ্বাসে ক্লিষ্ট অধরের কিশলয় ;
ঘুমেরে সাধে কত, যদি বা অন্তত স্বপ্নে খুঁজে পায় আমাকে,
অথচ অশ্রুর উৎপীড়নে তার কোথায় তন্দ্রার অবকাশ।

৯৫

আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্ ।
স্পর্শক্লিষ্টাময়মিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥

৯৬

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্ ।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥

৯৭

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি ।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥

৯৮

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্ ।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যাঃ
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥

৯৯

বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ-
র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা ।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥

১৫

মাল্য ফেলে দিয়ে বেঁধেছে একবেণী বিরহদিবসের প্রথমে,
শাপের অবসানে বিগতশোক আমি ছাড়ায়ে দেবো তার গ্রন্থি,
পরশে কর্কশ কঠিন সেই বেণী গণ্ডদেশ থেকে বার-বার
যে-হাতে ঠেলে দেয়, হেলায় এতকাল কাটে না তার নখপঙক্তি।

১৬

অসহ বেদনায় কখনো উঠে বসে, এমনি বার-বার শয্যাতলে
ভূষণবর্জিত পেলব তনু তার ন্যস্ত করে সেই অবলা,
নবীন জলময় অশ্রু নিশ্চয় মোচন করাবে সে তোমাকেও,
অন্তরাত্মায় আর্দ্র যারা, প্রায় করুণাশীল তারা সকলেই।

১৭

তোমার সখী তার স্নেহের সম্ভার, জেনেছি, আমাকেই দিতে চায়,
তাই তো অনুমান, প্রথম বিচ্ছেদে এমনি শোচনীয় দশা তার ;
এ নয় বাচালতা — 'ভাগ্যবান আমি' তা ভেবে, অভিমানবশত,
আমার বিবরণ অচিরে অবিকল আপন চোখে, ভাই, দেখবে।

১৮

স্রস্ত কুন্তলে রুদ্ধ বিস্তার, স্নিগ্ধকজ্জলশূন্য,
সুরার পরিহারে ভুলেছে ভ্রূবিলাস, এমন বাম আঁখি মৃগাক্ষীর —
তোমার আগমনে ঊর্ধ্বকম্পনে যে-শোভা করি তার অনুমান,
তুলনা সে-রূপের ক্ষুব্ধ মৎস্যের আঘাতে চঞ্চল কুবলয়।

১৯

গৌর বরনে যে তুলনা আনে মনে সরস কদলীর কাণ্ড,
দৈবে এক্ষণে আমার চিরচেনা মুক্তাজাল যার ত্যাজিত,
আমার নখে আর যে নয় চিহ্নিত, পায় না সম্ভোগ-অন্তে
আমারই হস্তের সংবাহন-সুখ — হবে সে-বাম উরু স্পন্দমান।

১০০

তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্॥

১০১

তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্।
বিদ্যুদ্গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ॥

১০২

ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি॥

১০৩

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈবম্।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সংগমাৎ কিঞ্চিদূনঃ॥

১০৪

তামায়ুষ্মন্মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্তুং
ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব॥

১০০

যদি বা সেক্ষণে নিদ্রাসুখ তার ভাগ্যে জুটে থাকে দৈবে,
জলদ, গরজনে বিরত, সাবধানে প্রহরকাল থেকো অপেক্ষায় ;
প্রেমিক-আমি তার স্বপ্নে কোনোমতে লব্ধ হ'লে পরে, তখনই
কোরো না বিচ্যুত কণ্ঠ হ'তে সেই গাঢ় ভুজলতা-বন্ধন।

১০১

তোমার জলভারে শীতল-পরশন বাতাসে মানিনীরে জাগিয়ে
আনন্দে তার মুখে মালতীমুকুলের সদ্যবিকশিত আশ্বাস,
লুকোবে বিদ্যুৎ, যখন সে তোমায় দেখবে অনিমেষে জানালায়,
তোমার ধ্বনিরূপ বচনে ধীরে-ধীরে বলবে এইমতো বার্তা :

১০২

'জানবে, অবিধবা, অম্বুবাহ আমি, তোমার ভর্তার বন্ধু,
হৃদয়ে সমাচার বহন ক'রে তার তোমারই সম্মুখে আগত ;
স্নিগ্ধগম্ভীর স্বননে প্রবাসীর ত্বরান্বিত করি যাত্রা,
পথশ্রান্ত যে-পতিরা উৎসুক প্রিয়ার বেণীপাশমোচনে।'

১০৩

যেমন মৈথিলী পবননন্দনে, তেমনি উৎসুক হৃদয়ে
এ-কথা বলা হ'লে যোগ্য সম্মানে দেখবে সে তোমাকে, সৌম্য !
শুনবে একমনে যা বলা বাকি আছে, কেননা মিলনের তুলনায়
সুহৃৎ-উপহৃত প্রিয়ের সমাচার অল্প ন্যূন মানে বধূরা।

১০৪

আমার অনুনয়ে, নিজেরও লাভহেতু, আয়ুষ্মান, তুমি বলবে :
'তোমার সহচর, যদিও বিরহিত, জীবিত আছে রামগিরিতে।
অবলা, তোমাকে সে কুশল জিজ্ঞাসে ; — প্রথমকৃত্য এ-প্রশ্ন,
কেননা প্রাণীদের জীবন অস্থির, বিপদ জুটে অতি সহজে।

১০৫

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী
সংকল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ॥

১০৬

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্য-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ॥

১০৭

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥

১০৮

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সংগমং নৌ কৃতান্তঃ॥

১০৯

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতো-
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি॥

১০৫

'বৈরী বিধি আজ, রয়েছে দূরে তাই, গতির পথ অবরুদ্ধ ;
কেবল মনোরথে তোমার অঙ্গে সে সঞ্চারিত করে অঙ্গ ; —
তোমার অতিকৃশ, সাশ্রুনিশ্বাসী, বেদনাতাপময় তনুতে
মিলায় সন্তাপী, দীর্ঘনিশ্বাসী, অশ্রুপ্লুত, ক্ষীণ তনু তার।

১০৬

'যে-কথা বলা যায় সহজে সোচ্চারে তোমার সখীদেরই সমুখে,
তাও যে-লোভাতুর বলতো কানে-কানে আননপরশের লালসায়,
সে আজ, দৃষ্টির বহির্ভূত, আর শ্রবণবিষয়ের অগোচর,
আমার মুখ দিয়ে তোমায় বলে বাণী, রচিত ঘোর উৎকণ্ঠায় :

১০৭

"দেখি প্রিয়ঙ্গুতে তোমার তনুলতা, বদন বিম্বিত চন্দ্রে,
ময়ূরপুচ্ছের পুঞ্জে কেশভার, চকিত হরিণীতে ঈক্ষণ,
শীর্ণ তটিনীর ঢেউয়ের ভঙ্গিতে তোমার বঙ্কিম ভ্রূবিলাস —
কিন্তু, হায়, নেই তোমার উপমান কোথাও একযোগে, চণ্ডী !

১০৮

"অধুনা ধাতুরাগে শিলায় আঁকি আমি প্রণয়কোপবতী-তোমাকে,
সে-পটে আপনাকে লোটাতে চাই যদি তোমার চরণের প্রান্তে,
তখনই অশ্রুর প্লাবনে বার-বার লুপ্ত হ'য়ে যায় দৃষ্টি —
নিয়তি নির্দয়, চিত্রফলকেও মিলন আমাদের সহে না।

১০৯

"স্বপ্নে কোনোমতে তোমায় কাছে পেয়ে নিবিড় আশ্লেষে ব্যগ্র
আমার প্রসারিত বাহুর বিক্ষেপ ব্যর্থ হয় যবে শূন্যে,
তা, দেখে মনে জানি, বনের দেবগণ মুহুর্মুহু করুণায়
করেন বর্ষণ অশ্রুবিন্দু, যা আকারে মুক্তার অনুরূপ।

১১০

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥

১১১

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্‌বিয়োগব্যথাভিঃ ॥

১১২

নম্বাত্মানং বহুবিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎ কল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥

১১৩

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥

১১৪

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥

১১০

' "হে গুণবতী, শোনো, যে-বায়ু দক্ষিণে তুষারগিরি হ'তে বহমান
সদ্য দেওদারে দীর্ণ কিশলয়ে গন্ধনিস্রাব ঝরিয়ে,
তোমার সুকুমার অঙ্গ বুঝি বা সে পরশ করেছিলো পূর্বে —
আমি সে-তনুহীন সুরভি বাতাসেরে আলিঙ্গনে বাঁধি অতএব।

১১১

'"কেমনে ক্ষণিকের তুল্য ক'রে আনি দীর্ঘযামা এই ত্রিযামায়,
এবং দিনমান সর্বকালে হবে স্বল্পতাপ কোন উপায়ে —
এ-সব দুর্লভ বাসনা যত ভাবি হৃদয় তত ছায় দুঃখে,
তোমার বিচ্ছেদব্যথায় নেই কোনো শরণ, হে চটুলনয়না!

১১২

' "অনেক ভেবে আমি,আপন চেষ্টায় ধারণ ক'রে আছি নিজেকে,
তুমিও, কল্যাণী, পরম হতাশায় হোয়ো না অসহায় মগ্ন ;
এমন কে বা আছে, নিত্য দুঃখ বা নিয়ত সুখ জোটে ভাগ্যে,
কখনো উত্থান, কখনো অবনতি, চক্রনেমি যেন মানবদশা।

১১৩

' "রয়েছে চার মাস, যাপন করো তুমি ধৈর্যে, নিমীলিত নয়নে,
বিষ্ণু উঠবেন শয্যা ছেড়ে তাঁর, আমার হবে শাপমুক্তি ;
তখন পরিণত শরৎ-জ্যোৎস্নায় মিলনপুলকিত রাত্রে
পূর্ণ হবে সব, বিরহসঞ্চিত যা-কিছু আমাদের অভিলাষ।"

১১৪

'আরেক কথা শোনো, যক্ষ জানিয়েছে : "একদা ছিলে যবে সুপ্ত
আমারই গলা ধ'রে যুগলশয্যায়, হঠাৎ কেঁদে উঠে জাগলে ;
আমার বহুবিধ প্রশ্ন শুনে পরে বললে মৃদু হেসে — ধূর্ত!
স্বপ্নে দেখি তুমি রমণে উপগত অন্য কোন এক নায়িকায়।

১১৫

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিতনয়নে ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥

১১৬

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি
প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥

১১৭

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥

১১৮

এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্ত্তিনো মে
সৌহার্দাদ্ বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥

১১৫

' "দিলাম পরিচয়চিহ্ন, অতএব জানবে আমি আছি কুশলে,
তোমার কালো চোখে লোকের কথা শুনে না যেন দেখা দেয় অবিশ্বাস ;
বিরহে প্রণয়ের ধ্বংস হয় নাকি, কিন্তু অভাবের প্রভাবে
আমার মনে হয় স্নেহের উপচয় মহৎ প্রেমে পায় পরিণাম।" '

১১৬

সখীরে দেবে তুমি এ-মতো আশ্বাস, প্রথম বিরহে সে আর্তা,
ত্বরায় ফিরে এসো সে-গিরি থেকে, যার শৃঙ্গ হরবৃষখনিত ;
পাঠাবে প্রিয়া তার কুশল-সমাচার, এনো অভিজ্ঞান সঙ্গে —
প্রভাতকুন্দের মতোই স্খলমান আমার জীবনেও রক্ষা করো।

১১৭

সৌম্য, হবে তুমি আমার বান্ধব ? আছো কি সম্মত কার্যে ?
নিরুত্তর যদি, তবুও সংশয় করি না আপনার সাধুতায় ;
যাচিত হ'লে পরে তুমি যে দাও জল চাতকদলে নিঃশব্দে —
কেননা প্রার্থীর বাঞ্ছাপূরণেই মহৎজন দেন উত্তর।

১১৮

বিধুর আমি, তাই, অথবা করুণায়, কিংবা বন্ধুতাসূত্রে,
জলদ, করো তুমি আমার প্রিয় কাজ, মিটাও অনুচিত যাচনা ;
প্রাবৃটে দেশে-দেশে ঋদ্ধিশালী হ'য়ে বিহার কোরো তুমি তারপর —
কখনো না ঘটুক তোমার বিদ্যুৎ-প্রিয়ার ক্ষণেকের বিচ্ছেদ।

চিত্রসূচি

গ্রন্থের শেষ অংশে 'চিত্রপ্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য



টীকা

পূর্বমেঘ

শ্লোক ১

যক্ষ : দেবযোনিবিশেষ (বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত, অমরকোষে এই দশ প্রকার দেবযোনির উল্লেখ আছে।) 'যক্ষ' শব্দ (তু যজ্ঞ) পূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যক্ষগণ কুবেরের পূজক, বা মানুষের দ্বারা পূজিত এই দুই অর্থই সম্ভব। কেনোপনিষদে ব্রহ্ম যখন নিজেকে দেবতাদের ইন্দ্রিয়গোচর করলেন, তখন দেবকুলে প্রশ্ন উঠলো, 'কিমিদং যক্ষম্', এই যক্ষ (পূজনীয়) কে? কখনো-কখনো পিশাচরূপে চিত্রিত হ'লেও যক্ষেরা সাধারণত 'মেঘদূতে'র নায়কের মতোই স্নিগ্ধস্বভাব; যক্ষ ও যক্ষীর প্রাচীন মূর্তিতে কালিদাসের ইন্দ্রিয়বিলাস না-থাকলেও, প্রাচুর্য ও ভক্তির ভাব লক্ষণীয় (চিত্র ৫ ও ৬ দ্র)। যক্ষদের আসন, মনে হয়, অপ্সর ও রাক্ষসের মধ্যবর্তী; যক্ষ ও রাক্ষস বিষয়ে বা-রাম, রা-ব, উত্তর : ২ দ্র।

কর্মে অবহেলা, 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' (স্বীয় কর্মে অনবহিত) : কেউ-কেউ বলেন, এই যক্ষ কুবেরের উদ্যানরক্ষক ছিলো; একদিন তার অবহেলায় সুযোগে ঐরাবত উদ্যানে প্রবেশ ক'রে ফুল নষ্ট ক'রে দেয়।

মহিমা অবসান : কুবেরের শাপে যক্ষের অলৌকিক ক্ষমতাদি এক বছরের জন্য বিনষ্ট হয়, বিভিন্ন রূপধারণ ক'রে যথেচ্ছ বিচরণের শক্তি সে হারিয়ে ফেলে — তা না-হ'লে বিরহ বা নির্বাসনের কোনো কথা উঠতো না।

রামগিরি : মল্লিনাথের মতে চিত্রকূট (আধুনিক বুন্দেলখণ্ডে), যেখানে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসের প্রথম অবস্থায় অল্পকাল বাস করেছিলেন। রামায়ণে চিত্রকূট পর্বতকে রমণীয় বলা হয়েছে, মাল্যবতী নদীতীর সংলগ্ন, বনে হরিণ ও পাখির প্রাচুর্য। কিন্তু আধুনিক কালে নাগপুরের উত্তরে রামটেক পাহাড়কে 'মেঘদূতে'র রামগিরি ব'লে শনাক্ত করা হয়েছে; উভয় স্থলই আজ পর্যন্ত রাম-সীতার স্মৃতিমণ্ডিত তীর্থ ব'লে পরিগণিত। 'ঋতু-সংহারে' বর্ষাবর্ণনাতেও বিন্ধ্যপর্বতের উল্লেখ আছে। বিন্ধ্য নামের অর্থঃ সূর্যের গতি যাতে বাধা পায়।

বাঁধলো বাসা রামগিরিতে : মূলে বহুবচনের কারণ, মল্লিনাথ বলেন, যক্ষ বিরহজনিত উন্মাদ অবস্থায় এক জায়গায় থাকতো না, ঘুরে-ঘুরে বেড়াতো। পরিবেশের প্রভাবে রাম-সীতার কথা ভাবতো সে, রাম হনুমানকে দূতরূপে সীতার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তা-ই থেকে মেঘদূতের কল্পনা তার মনে আসে।

মল্লিনাথ নির্দেশ করেছেন : এই কাব্যের রস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার।

শ্লোক ২

আট মাস, 'মাসান্' : কয়েক মাস, কিন্তু আসলে আট মাস, কেননা উত্তর-মেঘে যক্ষ বলছে আর চার মাস পর তার শাপমুক্তি হবে।

একদা আষাঢ়ের প্রথম দিনে : 'প্রথমদিবসে' নিয়ে বিরাট তর্ক আছে, কারো-কারো মতে শুদ্ধ পাঠ 'প্রশমদিবসে' (আষাঢ়ের শেষ দিনে), কেননা ৪র্থ শ্লোকে বলা হচ্ছে শ্রাবণ মাস আসন্ন। মল্লিনাথ এই মতকে 'মূলোচ্ছেদী পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ' বলেছেন, তাঁর মতে আষাঢ়ের প্রথম দিনেও শ্রাবণ আসন্ন বলা যায়। তাছাড়া 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' এতদূর খ্যাতিলাভ করেছে যে তার কোনো পাঠান্তরের কল্পনা এখন অসম্ভব।

বপ্রকেলি করে ই, 'বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ম্' : 'ইবলোপাৎ লুপ্তো-পমা'। বাংলায় এরূপ স্থলে সাধারণত 'মতো' বা 'যেন' প্রযোজন হয়, কিন্তু অনুবাদে আমি বাদ দিয়েছি। 'পরিণত'='তির্যকদন্তপ্রহারঃ' (মল্লি)। 'বপ্রক্রীড়া'='হস্তিবৃষাদির দন্তশৃঙ্গদ্বারা মৃত্তিকাখননক্রীড়া' (রা-ব)।

মেঘের সঙ্গে হাতির উপমা হিন্দু সাহিত্যে আদিকাল থেকে প্রচলিত, তার কারণ শুধু গাত্রবর্ণের সাদৃশ্য নয়। পুরাণে আছে, পুরাকালে হাতিদের পাখা ছিলো, তখন তারা মেঘের মতোই আকাশে বিচরণ করতো। পরে, দীর্ঘতপা মুনির শাপে তাদের পাখা কাটা যায়। টী পৃ১৪ দ্র। 'মেঘদূতে'র বর্ষাবর্ণনার কয়েকটি মূলসূত্র বাল্মীকিতে আছে :

> বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ।
> গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥ (কিষ্কিন্ধ্যাঃ ২৮ : ২০)

'বিদ্যুৎপতাকা ও বলাকার মালায় শোভিত গিরিশৃঙ্গাকার মেঘ রণভূমিস্থ মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করছে।' (অনু : রা-ব।) কৃষ্ণকায় রাবণ যখন জটায়ু বধ ক'রে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সালংকারা সীতাকে পুষ্পকরথে নিয়ে

যাচ্ছেন তখন রাবণকে দেখতে হ'লো যেন 'অগ্নিদীপ্ত পর্বত, কনককাঞ্চী-শোভিত নীল হস্তী, নীলবর্ণ নির্মল শব্দায়মান মেঘ' (অরণ্য ৫২ : ১৫, ২৩, ২৫)।

শূন্য হ'লো মনিবন্ধ : যক্ষ বিরহদুঃখে কৃশ হয়েছে, তাই কঙ্কণ স্খলিত হ'লো। (উ৯৬ দ্র।)

শ্লোক ৩

যক্ষ: মূলে 'রাজরাজস্য অনুচরঃ' = যক্ষরাজের (কুবেরের) অনুচর। রাজন্ শব্দর এক অর্থ যক্ষ।

কুবের = কু + বের (দেহ), কুরূপ। কুবেরের তিন পা, দাঁত মাত্র আটটি। গ্রীক ধনদেবতা প্লুতসও, আরিস্তোফানেস-এর নাটক অনুসারে, অন্ধ ও অসূয়াপন্ন। ধনের আধিক্যে বিকার ঘটে এই ধারণা মানুষের মনে সনাতন ; দেবযোনি যক্ষ শেষ পর্যন্ত 'যখের ধনে'র প্রেতরূপী পাহারাওলায় অধঃপতিত হ'লো। ইন্দ্রেরও ঐশ্বর্য কম নয়, কিন্তু লোকমানসে তাঁর এমন পতন হয়নি। আসল কথা, ধন আর ঐশ্বর্য এক নয় ; কুবেরকে মনে হয় কুসীদজীবী সঞ্চয়ী ধনীর প্রতীক, তাই তাঁকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। তবে কালিদাসের বর্ণনায় ধনপতির রাজধানী ইন্দ্রের স্বর্গের মতোই রমণীয়।

অথর্ববেদে কুবেরের নাম বৈশ্রবণ, তিনি পিশাচদের মধ্যে প্রধান। ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি পুলস্ত্য, পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা, বিশ্রবা ও ভরদ্বাজকন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র বৈশ্রবণ (পরবর্তী নাম কুবের)। এই বৈশ্রবণই দেবতাদের ধনাধ্যক্ষ, দু-হাজার বৎসর তপস্যা ক'রে ব্রহ্মার বরে চতুর্থ লোকপাল (যম, ইন্দ্র ও বরুণের পরে) ও পুষ্পকরথের অধিকারী হন। তাঁর আদিনিবাস ছিলো বিশ্বকর্মারচিত স্বর্গতুল্য লঙ্কাপুরীতে, পরে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ (বিশ্রবা ও রাক্ষসকন্যা কৈকসী বা নিকষার পুত্র) আক্রমণ করলে অলকায় আশ্রয় নেন। দেবী রুদ্রাণীকে দেখে ফেলেছিলেন বলে তাঁর ডান চোখ দগ্ধ ও বাঁ চোখ পিঙ্গলবর্ণ হয়ে যায়, পরে কঠোর তপস্যাদ্বারা শিবের সখ্য ও একাক্ষিপিঙ্গল নাম অর্জন করেন। কুবের ও রাবণ উভয়েই শিবের প্রিয়পাত্র। (বা-রাম : উত্তর : ৯-১৬)।

'কৌতুকাধান' : কৌতুক — কামনা ; আধান — সঞ্চার। 'কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনি জনে' — 'প্রণয়' শব্দের অর্থ এ[illegible]।

শ্লোক ৪

বর্ষাকাল বিশেষভাবে বিরহদুঃখজনক কেন? পুরাকালে বর্ষা ছিলো কর্মহীন ঋতু, তখন যুদ্ধ বা বাণিজ্য সম্ভব ছিলো না (রামও সীতা-উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারেননি); স্থলপথে (এবং জলপথেও) ভ্রমণ ছিলো দুঃসাধ্য। তাই বর্ষারম্ভের পূর্বেই প্রবাসী পতিরা ঘরে ফিরতেন; পূর্বমেঘে তার বহু উল্লেখ আছে। দৈবদোষে কোনো পতির প্রত্যাবর্তন পেছিয়ে গেলে, সেই বেদনা উভয় পক্ষেই দুর্ভর হ'তো। বর্ষার সঙ্গে বিরহবেদনার সম্বন্ধ ভারতের একটি প্রধান কবিপ্রসিদ্ধি; রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, 'মেঘদূত', জয়দেব ও বৈষ্ণব গীতিকা, তারপর রবীন্দ্রনাথ: এমনি ক'রে একটি আবহমান ধারা চ'লে আসছে এবং আজকের যন্ত্রযুগেও বর্ষার মেঘ আমাদের মনে কী-রকম মায়াবিস্তার করে, তার প্রমাণ আছে অমিয় চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি', সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' ও আরো অনেক আধুনিক বাংলা কবিতায়।

কেমনে প্রিয়তমা রাখবে প্রাণ তার অদূরে উদ্যত শ্রাবণে: আষাঢ় শেষ হ'য়ে এলেও পতি যদি না ফেরে পত্নীর অবস্থা তখনই মর্মান্তিক হয়। সেই সংকটের পূর্বেই মেঘ যেন অলকায় পৌঁছয়, যক্ষের এই ইচ্ছা এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। রামগিরি থেকে অলকায় যেতে মেঘের প্রায় এক মাস লাগবে, এ-রকম অনুমান স্বাভাবিক মনে হয়; আর এই অনুমান মেনে নিলে দ্বিতীয় শ্লোকের 'প্রথমদিবসে' নিয়ে আপত্তি ওঠে না।

মূলের 'জীমূত' শব্দ লক্ষণীয়। জীমূত—জীবন মূত (বদ্ধ) যার দ্বারা। জীবনের এক অর্থ জল। জল ও জীবন এই দুটো অর্থই কালিদাসের অভিপ্রেত ছিলো মনে হয়; যে-মেঘের মধ্যে জল আবদ্ধ আছে, সে-ই যক্ষ-প্রিয়াকে জীবন দেবে।

শ্লোক ৫

মূলে 'গুহ্যক'—যক্ষ (টীকা পৃ১ দ্র)। প্রাপণীয়—প্রেরণীয়।

শ্লোক ৬

প্রথম পঙক্তির আক্ষরিক অনুবাদ: 'ভুবনবিখ্যাত পুষ্কর আবর্তক ইত্যাদির বংশে জাত'। পুরাণে মেঘের মধ্যে শ্রেণীভেদের উল্লেখ আছে; পুষ্করাবর্তক মেঘ বিশেষভাবে জলের বাহন। H. H. Wilson 'পুরাণসর্বস্ব' থেকে শ্লোক

উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা আছে পুষ্কর মেঘ জলভারে স্ফীত হয় ব'লে তার নাম পুষ্করাবর্তক।

এই শ্লোকে যক্ষের আবেদন আরম্ভ হ'লো।

শ্লোক ৭

তুমি যে তাপিতের আশ্রয় : না বললেও চলে, তাপিত ('সন্তপ্ত') শব্দে দুটো-অর্থ ধ্বনিত হচ্ছে : গ্রীষ্মে বা বিরহে তাপিত।

'মেঘদূতে'র ইংরেজি অনুবাদক G. H. Rooke বলেন, অলকার উদ্যান-স্থিত এই শিব সম্ভবত শিবের মূর্তি, তার ললাট রত্নময় চন্দ্রকলায় খচিত। কিন্তু এই মত স্পষ্টত ভুল ; কোনো রত্নের আভায় হর্ম্যরাজি উদ্ভাসিত হ'তে পারে না। স্বয়ং মহাদেবকেই এখানে বোঝানো হচ্ছে ; ভক্তবৎসল শিব, যেমন রাবণের লঙ্কায়, তেমনি কুবেরের অলকাতেও উপস্থিত থাকেন। 'রঘু': ৬ : ৩৪-এ অবন্তীপতির প্রাসাদের অনুরূপ বর্ণনা আছে ; উদ্যানে শিব প্রতিষ্ঠিত ব'লে সেখানে কৃষ্ণপক্ষেও জ্যোৎস্না দেখা যায় (উ৬৭ দ্র)।

যক্ষপুরে, 'যক্ষেশ্বরাণাং বসতিঃ' : মূলের বহুবচন থেকে মনে হয় 'যক্ষেশ্বর' অর্থ এখানে ধনী যক্ষগণ বা কুবের ও অন্যান্য যক্ষ।

অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে' কৈলাস, অলকা, কুবের ও যক্ষগণের বহু উল্লেখ আছে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করি :

সেই নগরী (কপিলবস্তু) নিজ শুভ্রতা এবং উচ্চতার দ্বারা, কৈলাস শৈলের শ্রেষ্ঠ শোভা হরণ করিয়াছিল। (১।৩)

…কপিলের নামে প্রখ্যাত সেই নগরী, নবকুবেরের (কুবেরপুত্র) জন্মে অপ্সরাবিরাজিত অলকার ন্যায়, রাজপুত্রের মহিমময় জন্মহেতু হর্ষপূর্ণ হইল। (১।৯৩)

অনন্তর সুন্দরী অপ্সরাপরিবৃত, অলকায় আনীত নবব্রতধারী মুনির ন্যায়, বিরক্তান্তর রাজকুমার, বরাঙ্গনাকুলপূর্ণ সেই উপবনে বলপূর্বক নীত হইলেন। (৩।৬৫)

নতদেহ যক্ষগণ কনকবলয়ভূষিতপ্রকোষ্ঠ, [দ্র পৃ২] কমলপ্রতিম করাগ্রের দ্বারা যেন (সেই অশ্বের) চরণতলে কমল বর্ষণ করত, সেই অশ্বের খুর (মাটি হইতে ঊর্ধ্বে) ধারণ করিয়া, চকিতগতিতে চলিতে লাগিল। (৫।৮১)

কপিলবস্তু ও অলকার বর্ণনায় সাদৃশ্য স্পষ্ট এবং উভয়ের সঙ্গেই বাল্মীকির লঙ্কার মিল পাওয়া যায়।

শ্লোক ৮

যখন আরোহণ করবে বায়ুপথে : 'ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীম্' এবং 'অদ্রেঃ শৃঙ্গং

হরতি পবনঃ কিম্' (পৃ ১৪) — এই দুটি চিত্রে বাল্মীকির প্রভাব লক্ষ্য না-করা অসম্ভব, এই উড্ডীন মেঘ, আর সাগরলঙ্ঘনকারী হনুমানের লম্ফ, এ-দুয়ে দৃশ্যগত সাদৃশ্য আছে, উভয়ের উদ্দেশ্যও এক।

শুশুভে চ মহাতেজা মহাকায়ো মহাকপিঃ।
বায়ুমার্গে নিরালম্বে পক্ষবানিব পর্বতঃ॥ (সুন্দর ১ : ৭৮)

'সেই মহাতেজা মহাকায় মহাকপি বায়ুমার্গে পক্ষযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভিত হলেন' (অনু : রা-ব)। হনুমান যখন লঙ্কা থেকে ফিরে দণ্ডকারণ্যে পদার্পণ করলেন, তখন তাঁকে এক 'ছিন্নপক্ষ পর্বতের' মতো বোধ হ'লো। (সুন্দর : ৫ : ৩০)।

পথিকবনিতা : যার পতি প্রবাসে আছে, প্রোষিতভর্তৃকা।

শ্লোক ৯

বাম : বাঁ দিকে কোনো লক্ষণই ভালো না, এই হ'লো সাধারণভাবে হিন্দুর সংস্কার, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে তার কয়েকটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ আছে : ময়ূর, চাতক ও অন্যান্য পুরুষ-পাখি বাঁ দিকে দেখা দিলে সুলক্ষণ ব'লে গণ্য। গ্রীকদের কাছেও বাঁ দিক অশুভ ছিলো, কিন্তু রোমকরা ডান দিকেই দুর্লক্ষণ দেখতেন। মেঘের বাঁ দিকে চাতকেরা ডাকছে, অতএব তার যাত্রা শুভ।

বাম ও দক্ষিণ বিষয়ে সংস্কার ভারতে অতি প্রাচীন ; পুরুষের ক্ষেত্রে দক্ষিণ অর্থ প্রসন্ন (তু দক্ষ, দক্ষিণা, দাক্ষিণ্য), ভারতীয় ভূগোলে যে-দিকটি সবচেয়ে মনোরম তারও নাম দক্ষিণ। 'বাম'-এর সাধারণ অর্থে প্রতিকূল ('বিধি হলেন বাম') ; কিন্তু নারীর বেলায় তা উল্টে গেছে, তার এক নাম বামা। সীতাহরণের প্রাক্কালে রামের বাঁ চোখ স্পন্দিত হ'লো, মৃগপক্ষীগণ ডাকতে লাগলো তাঁর বাঁ দিকে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রাম ও সুগ্রীবের প্রণয়-সম্বন্ধকালে সীতা, বালী ও রাক্ষসদের বাঁ চোখ একসঙ্গে স্পন্দিত হ'লো ; অর্থাৎ, এই ঘটনা সীতার পক্ষে শুভ, অন্যদের পক্ষে মর্মান্তিক। সুন্দরকাণ্ডে হনুমান যখন অশোকবনে গোপন থেকে সীতাকে দেখছেন, তখন সীতার বাম নেত্র, বাম বাহু ও বাম উরু একসঙ্গে স্পন্দিত হয় — অর্থাৎ, সীতা উদ্ধার আসন্ন।

M. W.-এর অভিধানে 'বাম' শব্দ দু-বার উল্লিখিত আছে : প্রথমটির অর্থ—lovely, dear, pleasant, agreeable, fair, beautiful, splendid,

noble (R. V.), striving after, eager for, intent upon, fond of ; the female breast, the god of love ; বিপরীত — left, reverse, adverse, contrary, opposite, unfavourable, crooked, oblique refractory, coy (in love), acting in the opposite way or differently, hard, cruel vile, wicked, base, low ; on the left side, adversity, misfortune। একই শব্দের এই সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থসমূহে সংস্কৃত ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে। (টী উ১৮ দ্র)।

বলাকা : স্ত্রীবক, বকপঙক্তি। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁর 'হংস'-সংযোগের ফলে বাংলায় কিছুটা ভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে। আমি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে সাহস পেয়ে 'স্ত্রীবকসমূহ' অর্থে ব্যবহার করলাম। সত্যচরণ লাহার মতে এই বক heron জাতীয় পাখি, সাধারণত একা থাকে, কিন্তু বর্ষায় দল বেঁধে (মল্লিনাথ বলেন, বলয়ের আকারে) আকাশে উড়েযায়। এদের গর্ভসঞ্চারকাল বর্ষা।

চাতক : ফটিক-জল, ইংরেজী নাম pied-crested cuckoo, আদিনিবাস আফ্রিকা। ১৯৫৭, ৩ জুন-এর 'স্টেটসম্যান'-এ প্রকাশিত পি. কে. সেনগুপ্ত স্বাক্ষরিত একটি পত্র অনুসারে এই পাখি 'মে বা জুন মাসের কোনো সময়ে ভারতে আসে, অক্টোবরের কাছাকাছি সময়ে ফিরে যায়।' পৃথিবীর শীতমণ্ডলে লাল-বুক রবিন যেমন বসন্তের, তেমনি ভারতে এই পাখি বর্ষার দূত। এদের প্রজননঋতু বর্ষা ; সেই সময়ে পুরুষ-পাখিরা মধুর ও উচ্চ স্বরে নিনাদ করে। 'সগর্ব' : মল্লিনাথের মতে সগর্ব। গর্বের কারণ, কেউ-কেউ বলেছেন, কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা। (টী পূ২২ দ্র।)

যক্ষ মাঝে-মাঝে মেঘকে 'আপনি' বলছে (দ্র 'অনুবাদকের বক্তব্য')।

শ্লোক ১০

একমনা ভ্রাতৃবধূ : 'একপত্নীং ভ্রাতৃজায়াম্'। একপত্নী — পতিব্রতা, যে-নারীর একটি বই পতি নেই। ভ্রাতৃজায়াম্ : 'মাতৃবৎ নিঃশঙ্কং দর্শনীয়াম্' (মল্লি)। তার প্রিয়া সাধ্বী, এবং মেঘ তাকে ভ্রাতৃবধূ বা মাতৃরূপে জ্ঞান করবে, এই দুটি কথা একসঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যক্ষ তার দূতকে যেন সাবধান ক'রে দিচ্ছে।

শ্লোক ১১

শিলীন্ধ্র : ব্যাঙের ছাতা। বৃষ্টি পড়লে ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠে ;

তার মানে আগামী হেমন্তে ফসল খুব ভালো হবে। আধুনিক ভারতীয় কবির উপেক্ষিত এই উদ্ভিদের প্রতি উল্লেখের জন্য পঙক্তিটি বিশেষভাবে আদরণীয়; কিন্তু আধুনিক ভাষায় 'ব্যাঙের ছাতা' নামটাই কবিতায় প্রতিবন্ধক।

কালিদাসের 'শিলীন্ধ্রে'র মতোই চমকপ্রদ বাল্মীকির বর্ষাবর্ণনায় 'বালেন্দ্রগোপ' — ইন্দ্রগোপ কীট (কিষ্কিন্ধ্যা : ২৮ : ২৪); এই ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ সুন্দর কীটেদের আমি একবারমাত্র চোখে দেখেছিলাম, যখন শান্তিনিকেতনে এক পশলা বৃষ্টির পরে তারা অকস্মাৎ সবুজ মাঠ ছেয়ে ফেলেছিলো। শান্তিনিকেতনের ছেলে-মেয়েরা এদের বলে 'মখমল-পোকা'; দুঃখের বিষয়, বিশ্বম্ভর রবীন্দ্রনাথও কবিতায় এদের স্থান দিতে পারেননি — বোধ হয় চলিত বাংলায় উপযুক্ত শব্দ নেই বলেই।

মানস : মানস সরোবর। রামায়ণ বালকাণ্ড অনুসারে সরোবরটি ব্রহ্মা তাঁর মন দ্বারা রচনা করেছিলেন, তাই তার নাম মানস।

মরাল-দল, 'রাজহংসাঃ' : বিদেশীরা যার নাম দিয়েছেন Himalayan বা greylag goose, আমরা তাকেই রাজহাঁস ব'লে থাকি, কিন্তু লাহা বলেন, এই goose আষাঢ় মাসে ভারতে দেখা যায় না, swan হিমালয়বাসী নয়, অতএব কালিদাসের রাজহংস = flamingo। রাজহংসের 'দেহ শুক্ল, চঞ্চু ও চরণ লোহিত, শ্বেত পক্ষ,' অমরকোষের এই বর্ণনার সঙ্গেও flamingoর মিল আছে। এরা বর্ষাঋতু মানস সরোবর অঞ্চলে যাপন করে, এবং জলজ উদ্ভিদ এদের-অন্যতম খাদ্য; কিন্তু এরা সত্যই পদ্মের কন্দ মুখে নিয়ে আকাশে ওড়ে কিনা সে-বিষয়ে লাহা কিছু বলেননি।

শ্লোক ১২

রাঘব-পদরেখা, 'রঘুপতিপদৈঃ' : মূলের বহুবচনের অর্থ — রামগিরিতে রামের বহু পদচিহ্ন বা স্মৃতিচিহ্ন, অঙ্কিত আছে (পদ = চিহ্ন বা পদচিহ্ন)।

উষ্ণ আঁখিজল, 'বাষ্পমুষ্ণম্' : কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৮ : ৭-এ আছে : 'এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা। সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি॥ — পৃথিবী সূর্যতাপে পরিক্লিষ্ট ছিলেন, এখন নববারিপাতে সিক্ত হয়ে যেন শোক সন্তপ্তা সীতার ন্যায় বাষ্পমোচন করছেন' (অনু : রা-ব) এবং বুদ্ধচরিতে : 'তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া তুরগোত্তম কন্থক, জিহ্বার দ্বারা তাঁহার

পদলেহন করিল, এবং উষ্ণ বাষ্প মোচন করিতে লাগিল' (৬ : ৫৩, অনু : র-ঠা)।

বিদায় বলো তাকে : 'আপৃচ্ছস্ব'—জিজ্ঞাসা করো, কিন্তু 'বিদায়-সম্ভাষণ জানাও' অর্থই প্রসঙ্গের পক্ষে উপযোগী।

শ্লোক ১৩

পর্বতশৃঙ্গে মেঘের বিশ্রাম, এই সূত্রটিও বাল্মীকির ; কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বর্ষা-বর্ণনায় জলভারবাহী মেঘেরা 'মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়াস্তি। —মেঘেরা বিশাল পর্বতশৃঙ্গগুলিতে বিশ্রাম ক'রে-ক'রে আবার যাত্রা করছে' (কিষ্কিন্ধ্যা : ২৮ : ২২)।

লঘু জল, 'পরিলঘুপয়ঃ' : 'ক্ষারলবণাদিশূন্য, soft water' (রা-ব)। হিমালয়জাত নদীসমূহের জল লঘু (গুরুপাক নয়) ও স্বাস্থ্যপ্রদ, এই হ'লো মল্লির ব্যাখ্যা।

করবে পান তুমি শ্রবণে, 'শ্রোত্রপেয়ম্' : টী পৃ১৬ দ্র।

'মেঘদূতে'র ভৌগোলিক অংশ এখানে আরম্ভ হ'লো।

শ্লোক ১৪

দিঙ্‌নাগ : দিক্‌হস্তী। হস্ত : হাতীর শুঁড়। পৌরাণিক মতে অষ্ট হস্তী অষ্ট দিকের রক্ষক (ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সর্বভৌম, সুপ্রতীক); তাদের মধ্যে ঐরাবত প্রধান। সৃষ্টির আদিতে গরুড় যখন ডিম ভেঙে বেরোলো, ব্রহ্মা সেই ডিমের খোলার দুই অংশ দু-হাতে নিয়ে সামগান করলেন, তার ফলে আটটি হস্তী ও আটটি হস্তিনীর জন্ম হ'লো। ডান হাতের অংশ থেকে ঐরাবত ও অন্য হস্তীরা নির্গত হ'লো, বাঁ হাতের অংশ থেকে ঐরাবত-পত্নী অভ্রমু ও অন্য সাত হস্তিনী। ঐ আদিম অষ্ট হস্তীই বিশ্বের দিকপাল, এবং আট হস্তীদম্পতি স্বর্গ-মর্ত্যের সকল হস্তীর পূর্বপুরুষ। মতান্তরে, শ্বেত হস্তী ঐরাবত, দেবী কমলার সঙ্গেই সমুদ্রমন্থনকালে উত্থিত হয়েছিলেন।

Heinrich Zimmer দেখিয়েছেন, ঐরাবত নামের মধ্যেই জল, মেঘ ও ইন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ বিধৃত আছে। 'ঐরাবত'—ইরাবৎ বা ইরাবতীর সন্তান ; ইরা—দুধ, জল বা তরল পদার্থ। প্রাচীনতর পুরাণে প্রজাপতির নাম দক্ষ, দক্ষের কন্যা ইরা। আদিকূর্ম কশ্যপের পত্নীও ইরা নামে উক্ত,

তিনি সমগ্র উদ্ভিদজগতের জননী। 'ঐরাবত' শব্দের অন্যান্য অর্থ ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ; 'অভ্রমু' — যে মেঘ রচনা করে।

প্রাচীন ভারতীয় মানসে হাতি ছিলো শক্তি, উর্বরতা ও সফলতার প্রতীক। যেমন সে আট দিক ধারণ ক'রে আছে, তেমনি হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যেও ভারবাহী বা caryatidরূপে হস্তীমূর্তি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে — তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন এলুরার শিবমন্দিরের হস্তীশ্রেণী। এলুরা ও কোনারকের ভাস্কর্য দেখে আমরা বুঝি, এই ধূসরবর্ণ বৃহদাকার অসুন্দর জন্তুটিকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেমন প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন (চিত্র ১৩ দ্র)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাপও সজল মৃত্তিকা ও প্রজননশক্তির প্রতীক, এবং 'নাগ' অর্থ সাপ ও হাতি দু-ই হয়। (টী পৃ২ দ্র।)

এই শ্লোকে কালিদাস দিঙ্‌নাগ নামক এক বিরুদ্ধ সমালোচককে আক্রমণ করেছেন, মল্লিনাথের এই ব্যাখ্যা আজকাল কেউ গ্রাহ্য মনে করেন না।

শ্লোক ১৫

উইয়ের ঢিবিতে যে-সাপ থাকে তার নিশ্বাসে ইন্দ্রধনু রচিত হয় ব'লে প্রবাদ আছে।

শ্লোক ১৬

জনপদবধূ: গ্রামের মেয়ে। তারা পাড়াগেঁয়ে ব'লে ভ্রূবিলাস শেখেনি, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নগরের মেয়েরা এর উল্টো। (পৃ৪৮ তু।)

খানিক পশ্চিমেই। যক্ষ মেঘকে কিছু পশ্চিমে গিয়ে তারপর উত্তরে যেতে বলছে কেন, তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। 'মাল' শব্দের সহজ অর্থ উন্নতভূমি বা plateau; কিন্তু উনিশ-শতকী ইংরেজ লেখকরা দেখাতে চেয়েছেন যে আম্রকূট বা অমরকণ্টকে পৌঁছতে হ'লে যে-সব স্থল পেরোতে হয় তার মধ্যে আধুনিক ছত্তিশগড় অন্যতম, এবং ছত্তিশগড়ের মালদ নামক জনপদই কালিদাসের 'মাল'। এই অনুমান ঠিক হোক বা না-ই হোক, তাতে কবিতার কিছু এসে যায় না, কবিতার পাঠকের পক্ষে সহজ অর্থে তৃপ্ত হবার বাধা নেই। ভারতীয় মৌশুমি মেঘের ঈষৎ বঙ্কিম গতির নির্ভুল ছবি পাওয়া যাচ্ছে, এই মতও বিবেচ্য।

Wilson বলেছেন, মেঘ প্রথম থেকেই সোজা উত্তরে গেলে বিন্ধ্য পর্বতের

দুর্গম অংশ পেরোতে হয়, কবি সেখানে সঙ্গী হ'তে পারেন না, তাই মেঘ প্রথমে কিঞ্চিৎ পুবে যাবে, তারপর পশ্চিমে স'রে এসে উত্তরে। কাব্যটি আর-একটু অগ্রসর হ'লেই কবির অভিপ্রায় স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে; তিনি এমনভাবে মেঘকে নিয়ে যাচ্ছেন যাতে তাঁর নিজের প্রিয় স্থানগুলি পথে পড়ে।

মল্লিনাথ, খুব সম্ভব ভুল ক'রে নয়, 'মেঘদূতে'র অনেক শ্লোকেই আদি-রসাত্মক ধ্বনি দেখিয়েছেন। মেঘ 'মালং ক্ষেত্রম্'-এ জলবর্ষণ ক'রে উত্তর দিকে যাবে, যেমন বহুবল্লভ পতি কোনো-এক প্রণয়িণীর সঙ্গে গোপনে বিহার ক'রে ত্রস্ত হ'য়ে নিম্নপথে ধাবিত হয়। সংস্কৃত 'ক্ষেত্র' শব্দের এক অর্থ কলত্র। 'মেঘদূতে' আদিরসের ব্যাপ্ত ব্যবহার বিষয়ে 'ভূমিকা' দ্র।

আয়ত দৃষ্টিতে করবে পান, 'লোচনৈঃ পীয়মানঃ' : বাল্মীকিতে আছে 'লোচনাভ্যাং পিবন্নিব' আর অশ্বঘোষে 'পিবন্তীব লোচনৈঃ'। পৃ১৩-র 'শ্রোত্রপেয়ম্'-এর সঙ্গেও এর সম্বন্ধ স্পষ্ট।

শ্লোক ১৭

আম্রকূট : আম্রকাননে আচ্ছন্ন, তাই আম্রকূট। আধুনিক নাম অমরকণ্টক। 'নিমিত্তনিদানে' আছে, প্রথম বিশ্রামস্থল সুখের হ'লে পথিকের কার্যসিদ্ধি হয়; আম্রকূটের অভ্যর্থনা শুভলক্ষণ।

গ্রীষ্মের শেষে দাবাগ্নি সাধারণ ঘটনা।

শ্লোক ১৮

'মেঘ যেন শ্রান্ত পুরুষ, তার নায়িকা পৃথিবী; পৃথিবীর স্তন তার বিশ্রামস্থল' (মল্লি)। 'ঋতু' : ২ : ২-এ মেঘকে বলা হয়েছে 'সগর্ভপ্রমদাস্তনপ্রভঃ'; এখানে 'শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ' বিশেষণেই গর্ভাবস্থা বুঝিয়ে দেয়া হ'লো — পৃথিবী শরৎ-কালে শস্যবতী হবে। মেঘের বর্ণ গাঢ় নীল, পর্বতের বর্ণ পাণ্ডুর; পর্বতগাত্রে বিশ্রামকারী মেঘের সঙ্গে এই উপমা শোভন হয়েছে, কেননা গর্ভিণীর স্তনের মধ্যভাগ নীলবর্ণ। 'রঘু' : ৩ : ৮-এ রানী সুদক্ষিণার গর্ভসঞ্চারকালে তাঁর স্তনদ্বয় 'নিতান্তপীবরং আনীলমুখম্' হ'য়ে উঠলো, যেন পদ্মকোষে ভ্রমর উপবিষ্ট হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বাল্মীকির একটি পর্বতবর্ণনা উদ্ধৃতিযোগ্য। লঙ্কা থেকে ফেরার সময় হনুমান অরিষ্ট পর্বত থেকে লম্ফ দেন; 'এই পর্বতের স্নিগ্ধ নীল বনরাজী যেন তার বসন, শৃঙ্গমধ্যে লম্বিত মেঘ যেন উত্তরীয়। সূর্যকিরণে

অরিষ্ট পর্বত যেন উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে আছে, উজ্জ্বল ধাতুসমূহ যেন তার চক্ষু, নির্ঝরের গম্ভীর ধ্বনি ক'রে যেন সে অধ্যয়নে রত আছে।' (বা-রাম, রা-ব, সুন্দর : ১৩) হনুমান বীর ও ব্রহ্মচারী; মেঘ যক্ষের মতোই কামুক; পর্বতের প্রতি দুই দূতের ভিন্ন মনোভাব ধরা পড়ে, আর বাল্মীকি ও কালিদাসের মনোলোকেরও প্রভেদ বোঝা যায়।

'আষাঢ় মাসে মেঘের নিশ্বাসে বন্য আম পক্ব হয়' (মল্লি)।

শ্লোক ১৯

রেবা : নর্মদা। অমরকোষ এই নদীর চারটি নাম দিয়েছেন : রেবা, নর্মদা, সোমোদ্ভবা ও মেখলকন্যকা — অর্থ যথাক্রমে বহমানা, সুখদায়িনী, সোমবংশে জাতা, মেখলের কন্যা। মেখল—বিন্ধ্যপর্বত বা কোনো ঋষির নাম। বিশীর্ণা : মল্লিনাথের অর্থ, বহুধা বিসর্পিণী। 'বিন্ধ্যপাদে' ই : 'কোনো শীর্ণা বিরহিণী প্রিয়তমের চরণে লুটিয়ে পড়ছে, এই অর্থ ধ্বনিত হচ্ছে' (মল্লি)।

হাতির গায়ে আঁকা চিত্রলেখা, 'ভক্তিচ্ছেদৈঃ বিরচিতাং ভূতিম্‌' : 'ভক্তি' অর্থ এখানে ভাগ, অর্থাৎ হাতির গায়ে বিচিত্র নকশা আঁকা হয়েছে। ভূতি (ভূ বিভূতি) : অলংকার, প্রসাধন।

শ্লোক ২০

মূলে 'বনগজমদে'র বিশেষণ 'তিক্ত'=সুগন্ধি বা তিক্তস্বাদ। মল্লিনাথ ব্যঙ্গ্যার্থ দিয়েছেন মেঘ প্রথমে বৃষ্টিপাত অথবা বমন করবে, তারপর শ্লেষ্মাশোধক, লঘু ও (জামের সংস্রবে) তিক্তকষায় জলপান ক'রে বায়ুর প্রকোপ থেকে মুক্ত ও সবল হবে। এই আয়ুর্বেদীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য নই; সংস্কৃত টীকাকারদের অতিসূক্ষ্মতায় কখনো-কখনো কাব্য ও কাব্যের পাঠক যুগপৎ আহত হয়।

'বনগজমদ' : এ-বিষয়ে Wilson-এর মন্তব্যের সারাংশ তুলে দিচ্ছি। পশ্চিমী জীববিজ্ঞানীরা আঠারো শতক পর্যন্ত যা লক্ষ করেননি, প্রাচীন ভারতে তা সকলেই জানতেন : পুংহস্তীর কপালের দুই পার্শ্বে ছিদ্র আছে; তা দিয়ে প্রজননকালে এক রস নিঃসৃত হয়। সেই রসের তীব্র সৌরভে ভৃঙ্গাদি আকৃষ্ট হয় ব'লে কথিত আছে। অমরকোষে এই নিস্রাবের নাম 'মদঃ' বা 'দানম্‌', আর ক্ষরণকালীন হস্তীর বিশেষণ 'প্রভিন্নঃ', 'গর্জিতঃ' ও 'মত্তঃ'। মৈথুনঋতু উত্তীর্ণ হ'লে হস্তীকে বলা হয় 'উদ্বান্তঃ' বা 'নির্মদঃ'।

মল্লিনাথ বলছেন, হিমালয়, বিন্ধ্য ও মলয়দ্বীপ হস্তীর প্রজননভূমি। (স্পষ্টত, তিনি আসামের অস্তিত্ব জানতেন না।)

'ঋতু : ২ : ১৫-তে আছে, মদস্রাবী হস্তীগণের গণ্ডদেশে ভ্রমরযূথ বিদ্ধ হয়ে আছে — ভাবটা বোধহয় এই যে স্রাবের আঠার জন্য নড়তে পারছে না।

শ্লোক ২১

সংস্কৃতে এক শব্দের বহু অর্থ হয় ব'লে, শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিগত খেয়ালের প্রভাব বেড়ে যায়। 'সারঙ্গ' অর্থ হরিণ, ভ্রমর হাতি বা চাতক; যাঁরা চাতক অর্থ ধ'রে পক্ষীতত্ত্বে কালিদাসের জ্ঞান প্রমাণ করেছেন, কিন্তু দৃশ্য, গন্ধ ও খাদ্য বিষয়ে শ্লোকোক্ত সারঙ্গের রুচি লক্ষ করলে তাদের হরিণ মনে করাই সংগত বোধ হয়। 'সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্' : পথ দেখাবে, মল্লিনাথের মতো বর্ষাগম অনুমান করবে। হরিণের দল বর্ষার আনন্দে মেতে উঠে মেঘের আগে-আগে ছুটে চলেছে, এই অর্থও হ'তে পারে। রা-ব 'সারঙ্গ' অর্থ দিয়েছেন spotted deer বা antelope।

শ্লোক ২২

বিন্দুবর্ষণ-গ্রহণে : সুনিপুণ : প্রবাদ আছে, চাতকেরা বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়বার আগে তারা আকাশেই তা পান করে, এটা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব'লেই মনে হয়। (টী পৃ৯ দ্র)।

শ্লোক ২৩

'মেঘদূতে' উল্লিখিত অন্য অনেক প্রাণীর মতো, ময়ূরেরও মৈথুনঋতু বর্ষা, তাই সে মেঘকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। মূলের 'শুক্লাপাঙ্গ' অর্থ ময়ূর; এ-বিষয়ে টী পৃ৪৫-৪৬ দ্র।

শ্লোক ২৪

দশার্ণ, মূলে 'দশার্ণাঃ' : বহুবচন, কিন্তু অর্থে একবচন (রা-ব) দশার্ণ কোন দেশ তা নিয়ে Wilson অনেক জল্পনা করেছেন : Major Wilford-এর পৌরাণিক নামের তালিকা অনুসারে দশার্ণ বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণস্থিত জনপদসমূহের অন্যতম; টলেমির মানচিত্রেও অনুরূপ নামের জনপদ ও বিন্ধ্য-নির্গত নদীর উল্লেখ আছে। Wilson ছত্তিশগড় আর দশার্ণে নিকট সম্বন্ধ দেখেছেন; দশার্ণ (দশ + ঋণ) — দশ দুর্গ; ছত্তিশগড়ও ছত্রিশ দুর্গের

পরিচয় দিচ্ছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে পূর্বমালবের পৌরাণিক নাম দশার্ণ, এবং এর রাজধানী যখন বিদিশা, তা বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরস্থ ব'লেই অনুমেয়।

কাকের বাসা-বাঁধা ঝাপটে, 'নীড়ারম্ভৈঃ' ই : এটি 'মেঘদূতে'র একটি প্রসিদ্ধতম শ্লোক, কিন্তু 'গৃহবলিভুক্'-এর বিশেষ অর্থটি অনুবাদে পৌঁছিয়ে দেয়া গেল না। বলি = খাদ্য ; সরল অর্থ, গৃহস্থের প্রদত্ত খাদ্য যে খায়, অর্থাৎ কাক, শালিক ইত্যাদি মানুষের প্রতিবেশী পাখিরা। কিন্তু এ-স্থলে 'গৃহ' অর্থ গৃহিণীও হ'তে পারে, তাহ'লে মানে দাঁড়ায় : যে তার স্ত্রীর খাদ্য খায়। মৈথুনকালে কাকাদি স্ত্রীপক্ষী পতির আহার জোগায়, এই রকম প্রবাদ আছে। কিন্তু লাহার মতে এই প্রবাদ ভিত্তিহীন ; অণ্ডপ্রসবকালে স্ত্রীপক্ষীই নিশ্চেষ্ট থাকে, তার পতি তাকে চঞ্চুর দ্বারা খাইয়ে দেয়।

শ্লোক ২৫

বিদিশা : দশার্ণদেশের রাজধানী সাঁচীর সন্নিকট। বেত্রবতী : আধুনিক নাম বেতোআ, বিন্ধ্যশ্রেণীর উত্তরাংশ থেকে নির্গত নদী (যমুনার শাখা)। ভিলশা এই নদীর তীরে অবস্থিত।

শ্লোক ২৬

নীচৈ : নিচু পাহাড়, কিন্তু কোন পাহাড়ের তা নাম ছিলো তা নিয়ে কেউ গবেষণা করেছেন ব'লে জানি না। এই পাহাড়ের শিলাগৃহগুলি, শাস্ত্রীর মতে, পরিত্যক্ত বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারাম। এই অনুমান সত্য হ'লে, এই শ্লোকে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় বিষয়ে একটি কুটিল মন্তব্য পাঠ করতে পারি।

পরিমল : অমরকোষের মতে বিমর্দনের দ্বারা উত্থিত মনোহর গন্ধ। প্রসঙ্গের পক্ষে এই বিশেষ অর্থ অত্যন্ত অনুকূল।

শ্লোক ২৭

'বননদী'র পাঠান্তর : নবনদী, নগনদী ; কারো-কারো মতে নামশব্দ। Wilson বেতোআর পশ্চিমে পার্বতী নদীর উল্লেখ ক'রে বলেছেন, পার্বতী ও নগনদীর আক্ষরিক অর্থ এক, অতএব এই দুই শব্দ একই নদীর বিভিন্ন নাম হ'তে পারে। কিন্তু নদীমাত্রেই পর্বতোদ্ভূত, এবং ভারতের ঐ অংশ

নদীবহুল ; কালিদাস বিশেষ-কোনো নদীর কথা ভেবেছিলেন কিনা, তা আজকের দিনে বলা অসম্ভব। বরং, 'বননদী' পাঠ গ্রহণ করলে সরল অর্থ প্রতিভাত হবার বাধা হয় না।

পুষ্পচায়িকা, 'পুষ্পলাবী' : অনেকে বলেছেন এই মেয়েরা শখ ক'রে ফুল তুলছে না, এরা জাত-মালিনী। তা যদি হয়. এদের শ্রমনিবারণে বিশেষ সার্থকতা আছে।

'ছায়া' শব্দের এক অর্থ কান্তি। খুব সম্ভব কবি দুটো অর্থই বোঝাতে চেয়েছেন, এটাকে আধুনিক অর্থে ambiguity বলা যায়। মল্লিনাথের মতে এর ব্যঙ্গ্যার্থ : 'কামুকদর্শনে কামিনীর মুখের বিকাশ'।

ক্ষণেক দেখে নিয়ো : দেখতে গিয়ে দেরি ক'রে ফেলো না।

শ্লোক ২৮

পথ বক্র হবে কেন, মল্লিনাথ তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। মেঘ সোজা উত্তরে গেলে নির্বিন্ধ্যা নদী পাবে, কিন্তু উজ্জয়িনী দেখার জন্য কিছু পশ্চিমে যাওয়া প্রয়োজন। বঞ্চিত হবে : তোমার জন্ম বিফল হবে (মল্লি)।

ভারতের সপ্ত তীর্থ : অযোধ্যা, মথুরা, গয়া, কাশী, কাঞ্চীপুরম্‌, অবন্তী (উজ্জয়িনী) ও দ্বারবতী (দ্বারকা) ; এ-সব স্থলে মৃত্যু হ'লে মোক্ষলাভ হয়। উজ্জয়িনীর চার নাম : উজ্জয়িনী, বিশালা, অবন্তী ও পুষ্পকরণ্ডিনী।

শ্লোক ২৯

পূর্বমেঘের নদীবর্ণনায় বাল্মীকির প্রভাব কত ব্যাপক তা অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ত্রয়ী' গ্রন্থে দেখিয়েছেন ; রামের দৃষ্ট নদীসমূহের মধ্যে কোনোটি 'ফেননির্মলহাসিনী', কোনোটি 'বেণীকৃতজলা', কোনোটি 'আবর্ত-শোভিতা', কোনোটি 'নানাপুষ্পরজোময় সমদা নারীর তুল্য', ই।

নির্বিন্ধ্যা : মল্লিনাথের মতে যে-নদী বিন্ধ্য থেকে নির্গত হয়েছে। সন্নিপাত : সংগম। 'নির্বিন্ধ্যা নাম কোনো প্রাচীন মানচিত্রে পাওয়া যায়নি, কিন্তু পার্বতী ও শিপ্রার মধ্যবর্তী অনেকগুলি নদী আছে, কবির নির্বিন্ধ্যা তারই একটি।' (Wilson)

রচনা করে তার কাঞ্চীদাম : 'রঘু' : ৬ : ৪৩-এ কবি বলছেন— 'তীরস্থ মাহিষ্মতী নগরীর প্রাচীর যেন রেবার নিতম্বে কাঞ্চীর মতো শোভমান।'

প্রাচীরকে কাঞ্চীরূপে ধারণা করা সহজ নয়, কিন্তু পাখির ঝাঁক চঞ্চল ও মুখর, তার সঙ্গে লাস্যময়ী কামিনীর কাঞ্চীর তুলনা সার্থক।

শ্লোক ৩০

সিন্ধু : Wilson ভেবেছিলেন নামশব্দ, উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী সাগরমতী নদী ব'লে শনাক্ত করেছিলেন। কিন্তু 'সিন্ধু'র এক অর্থ নদী, পূর্ব শ্লোকের নির্বিন্ধ্যাকেই বোঝান হচ্ছে সন্দেহ নেই। এর পরের শ্লোকে মেঘ উজ্জয়িনীতে পৌঁছলো।

বিরহাবস্থার প্রসিদ্ধ লক্ষণ, একবেণী ও পাণ্ডু বর্ণ, নির্বিন্ধ্যা নদীতে দেখা যাচ্ছে, অতএব মেঘ ভাগ্যবান্। (নদীর কৃশতায় মদনাবস্থার পঞ্চম পর্যায় সূচিত হয়েছে — উ৯৪ দ্র।) বিরহের পরে নায়কের যেমন সম্ভোগ, তেমনি মেঘের কর্তব্য জলবর্ষণ ; তার দ্বারা নদী-নায়িকার কার্শ্য দূর হবে।

উত্তরমেঘের যক্ষপত্নীকে অশোকবনের সীতার উত্তরাধিকারিণী ব'লে স্পষ্ট চিনতে পারা যায় ; সীতাও 'উপবাসে কৃশ হয়ে মলিন বেশে মস্তকে জটিল (জট-পড়া) একবেণী ধারণ ক'রে রামদর্শন-লালসায় কাতর।' (বা-রাম, রা-ব, সুন্দর : ১৩)

শ্লোক ৩১

এই শ্লোকে রাজ্যের নাম অবন্তী, তার রাজধানী বিশালা (উজ্জয়িনী)। 'অবন্তীন্' : 'বহুবচন, কিন্তু অর্থে একবচন' (রা-ব)।

উদয়ন : বৎসদেশের রাজা, 'রত্নাবলী' নাটকের নায়ক।

স্বর্গবাসীদের পুণ্য হ'লে ক্ষয় ই : লঙ্কায় রাবণের শয়নগৃহে ঘুমন্ত নারীদের দেখে হনুমান ভাবছেন : 'পুণ্যক্ষয় হলে যেসকল তারকা গগনচ্যুত হয় তারাই এখানে মিলিত হয়েছে' (সুন্দর : ৪২)। (অনু : রা-ব)

শ্লোক ৩২

সারস : লাহার মতে হংসজাতীয় নয়, ভিন্ন পরিবারভুক্ত। এরা যাযাবর নয়। এদের মধ্যে দাম্পত্যপ্রেমের প্রাবল্য দেখা যায় ব'লে সংস্কৃত অভিধানে এদের এক নাম 'মৈথুনী'। কণ্ঠস্বর বৃষবৎ কর্কশ ব'লে এরা 'গোনর্দ', সরোবরের ঘনিষ্ঠ ব'লে 'পুষ্করাহ্বা'। এদের যুগলে বা ঝাঁক বেঁধে থাকতে দেখা যায়। বর্ষাঋতু এদের মৈথুনকাল।

আদিরসে কালিদাসের আসক্তি ক্লান্তিহীন ; নায়িকার সুরতগ্লানি যে-বায়ু হরণ ক'রে নিচ্ছে, তারও তুলনা মিলনেচ্ছু চাটুকার বল্লভ। মনে হ'তে পারে, এখানে উপমেয় ও উপমানে সংগতি নেই ; কিন্তু সম্ভোগান্তে নায়িকার অঙ্গসংবাহন নায়কের কৃত্য ছিলো (উ৯৯ দ্র) ; অঙ্গ-অনুকূল শিপ্রাবায়ু এখানে সেই কাজ করছে। তছাড়া, মল্লিনাথ বলেন, নায়িকা বল্লভের প্রার্থনা পূরণ করবে তারও ইঙ্গিত আছে।

শ্লোক ৩৪

'এটা (শিবমন্দির) শুধু মুক্তিস্থান নয়, বিলাসস্থানও বটে।' (মল্লি)

নিকটে নদী বয় : এই নদীর জল দুই কারণে সুরভি, পদ্মরাগে ও যুবতীদের স্নানে (চন্দনাদি স্নানীয় দ্রব্যের সংযোগে)। মূলের 'গন্ধবতী'কে মল্লিনাথ নামশব্দ বলেছেন, তা যদি হয় তবে একে শিপ্রার নামান্তর ব'লে ধ'রে নিলেই অর্থের সংগতি হয় ; ৩১-৪০ এই দশ শ্লোকেই উজ্জয়িনীর বর্ণনা। অলকা ছাড়া অন্য কোনো স্থানের প্রতি কবি এতদূর মনোযোগ দেননি।

শ্লোক ৩৬

রত্নছায়াময় চামর, 'রত্নছায়াখচিতবলভিঃ' : রত্নদ্যুতিমণ্ডিত চামরদণ্ডদ্বারা ; (বলি—চামরদণ্ড)। অনুবাদে 'চামরদণ্ডে'র বদলে শুধু 'চামর' লিখতে বাধ্য হয়েছি। মল্লিনাথের মতে এখানে দৈশিক নৃত্য সূচিত হচ্ছে : খড়্গ কন্দুক বস্ত্রাদি দণ্ডিকা চামর ও মাল্যধারণ এই নৃত্যের অঙ্গ।

নর্তকীদের কটাক্ষ বিষয়ে মল্লিনাথের দুই মন্তব্য : (১) মেঘ বর্ষণরূপ উপকার ক'রে কটাক্ষরূপ প্রত্যুপকার লাভ করবে ; (২) মেঘ যে কামিনীদের দ্বারা দর্শনীয় হ'লো সেটাই তার পূর্বশ্লোকে উক্ত শিবোপাসনার 'পুণ্যফল'।

Wilson 'মেঘদূত' নিয়ে বহু পরিশ্রম করেছেন, তাঁর কাছে আমাদের ঋণ ভোলা যায় না। তবু এও সত্য যে তাঁর অনুবাদ অপাঠ্য আর কালিদাসের খুব অল্পই তাতে পাওয়া যায়। তার উপর ভারতীয় জীবনে অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁর কোনো-কোনো মন্তব্য কী-রকম হাস্যকর হয়েছে তার একটি উদাহরণ দিই। এই শ্লোকের 'পাদন্যাস' বিষয়ে তিনি লিখছেন : 'It is to be recollected that these ladies are dancing barefooted, divesting the feet of the shoes upon entering an apartment being a mark of reverence or respect exacted by oriental arrogance and

readily paid by oriental servility.' 'নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূন্'-এর অনুবাদ—'…showers benign and sweet / Cool the parched earth and soothe their tender feet'।

আমার বিশ্বাস, এই শ্লোকের প্রথম চরণের একটি ভ্রান্ত বোধ আধুনিক বাংলায় 'লীলাবধূ' শব্দটির জন্ম দিয়েছে। 'লীলার সহিত অবধূত (আন্দোলিত)' — এই হ'লো কথাটা, কিন্তু বাঙালিরা 'বধূ' শব্দের প্রতি প্রীতিবশত 'লীলাবধূ'কে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছে। শব্দটি M. W. বা জ্ঞানেন্দ্র-মোহন বা হরিচরণের অভিধানে নেই; কিন্তু বিলাসিনী অর্থে 'লীলাবধূ'র প্রয়োগ আধুনিক বাংলা কবিতায় পেয়েছি।

এই শ্লোকটি আমার মনে আশ্চর্যরকম নাড়া দেয়; নটীদের দেহভঙ্গি ও ক্লান্তির সঙ্গে মিশে তাদের কটাক্ষ মর্মভেদী হ'য়ে উঠেছে — মনে হয়, জ্যামুক্ত বাণের মতো এক ঝাঁক ভ্রমর হঠাৎ ছুটে গেলো। অনেক স্থলেই কবিপ্রসিদ্ধসমূহ কালিদাসের হাতে রূপান্তরিত হয়েছে; কিন্তু প্রতিভার স্পর্শে একটি বাঁধা বুলি ('ভ্রমরপঙক্তির মতো কটাক্ষ') কতদূর পর্যন্ত সতেজ, সপ্রাণ ও গতিশীল হ'য়ে উঠতে পারে তার কোনো উৎকৃষ্টতর উদাহরণ কালিদাসে আমার জানা নেই। কিন্তু

কুন্দকুসুমের আন্দোলনে যেন মুগ্ধ মধুকর ধাবমান (পূ৪৮)

ও

তুলনা সে-রূপের ক্ষুদ্র-মৎস্যের আঘাতে চঞ্চল কুবলয় (উ৯৮)

এ দুটিও এর পাশে উল্লেখ্য।

এই শ্লোকে উক্ত বেশ্যারা মন্দিরের দেবদাসী; তারা যুগপৎ মদনের ও মদনভস্মকারী শিবের আরতি করে।

শ্লোক ৩৭

বাহুর উত্তাল অরণ্যেরে : 'উচ্চৈর্ভুজতরুবনম্' : মল্লিনাথের অর্থ : উন্নত বাহুর মতো বৃক্ষময় বন, যা মেঘ মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত করবে। আমার মনোনীত অর্থ : নৃত্যকালে শিবের উন্নত-বৃক্ষরূপ বাহু।

শিব গজাসুর বধের পর, মৃত অসুরের রক্তাক্ত চর্ম হাতে তুলে নিয়ে নৃত্য করেছিলেন। প্রতি সন্ধ্যার নৃত্যের সময় তাঁর আবার সেই ইচ্ছা জেগে ওঠে; মেঘ তা তৃপ্ত করতে পারবে, কেননা তার গায়ের রং কালো, সূর্যাস্তের

আভায় তা আরক্ত হয়েছে এবং সে শিবের উত্তোলিত বাহুর উপরে আনত। (চিত্র ১০ দ্র।)

অনিমেষে : টী উ১০১ দ্র।

কালোর সঙ্গে আলোর এই মিশ্রণে বাল্মীকির একাধিক শ্লোক মনে পড়ে : সীতাহরণকালে রাবণ যেন 'অগ্নিদীপ্ত পর্বত, কাঞ্চনকান্তিশোভিত নীল হস্তী' (টী পূ২ দ্র), অন্যত্র রাবণের 'বর্ণ নীলাঞ্জনের তুল্য, মেঘের উপর বলাকাশ্রেণীর ন্যায় তাঁর বক্ষে পূর্ণচন্দ্রদ্যুতি বক্র রজতহার', অন্য কোথাও আকাশে তিনি শোভা পাচ্ছেন যেন 'বিদ্যুৎমণ্ডলধারী বলাকাসমেত মেঘ', এবং সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর 'অঙ্গে রক্তাভরণ, কান্তি নীল মেঘের ন্যায়, পরিধেয় স্বর্ণখচিত বসন, উত্তরীয় শশশোণিততুল্য লোহিত'। (অনু : রা·ব)

সুন্দরকাণ্ডে লঙ্কাধিপতির অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে হনুমান রক্তচন্দনলিপ্ত শ্যামলবর্ণ নিদ্রিত রাবণকে দেখতে পেলেন 'যেন সন্ধ্যার আকাশে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মতো রক্তবর্ণ'।

শ্লোক ৩৮

'ঋতু'-র বর্ষাবর্ণনাকে 'মেঘদূতে'র একটি পূর্বলেখ বললে ভুল হয় না ; 'মেঘদূতে'র বহু উপাদান (এমনকি উপমাদি) ঐ কৈশোরোচিত কাব্যে পাওয়া যায়, কিন্তু রূপায়ণের প্রভেদে এ-দুয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেছে। এখানে দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

> আবিল ও প্রবৃদ্ধবেগ নদীসমূহ, দুই তীরের গাছপালা ভেঙে দিয়ে, কুলত্যাগিনী নারীদের মতো সত্বর খরস্রোতে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। (ঋতু : ২ : ৭)
>
> রাত্রি ঘন অন্ধকার, মেঘরাশি মন্দ্রমুখর, কচিৎপ্রভ বিদ্যুতের আলোয় পথ দেখে-দেখে অনুরাগিণী অভিসারিকারা সংকেতস্থানে ছুটে চলেছে। (ঋতু : ২ : ১০)

আমাদের আলোচ্য অবিস্মরণীয় শ্লোকটি দ্বিতীয় উদ্ধৃতির সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত সংস্করণ।

সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিতায় নারীরাই অভিসারে যায় ; এই ভাবে, রবীন্দ্রনাথ কোথাও একবার বলেছিলেন, কবিরা মেয়েদের বাস্তব পরাধীনতার ক্ষতিপূরণ করেছেন। 'কামসূত্রে' বর্ণিত নাগরগণ যে-সব বান্ধবীদের স্বগৃহে অভ্যর্থনা করেন, তাঁরা কুলনারী নন, গণিকা বা রক্ষিতা বিধবা। বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতার উপাখ্যান মহাভারতে প্রচুর, কিন্তু সেগুলি মুনি, দেবতা

ও দেবযোনি, এবং মুনিপত্নী ও স্বর্গ বা মর্ত্যলোকের বারাঙ্গনাদের মধ্যেই আবদ্ধ। সাধারণ জীবনযাত্রায় নারীদের যৌন স্বাধীনতা কতটুকু ছিলো, পুরাণ বা কাব্য থেকে তা ধারণা করা সহজ নয়। মল্লিনাথের টীকা-সমেত 'মেঘদূত' প'ড়ে মনে হ'তে পারে পুরস্ত্রীরাও অভিসারে যেতেন বা স্বগৃহে প্রণয়ী গ্রহণ করতেন, কিন্তু এটাকে ঠিক বাস্তব চিত্র ব'লে মেনে নেয়া যায় কিনা সন্দেহ, কেননা সমগ্র মহাভারতে সধবা বা বিধবার কোনো প্রণয়োপাখ্যান নেই। (ব্যাসের ঔরসে অম্বিকা ও অম্বালিকার, এবং বিভিন্ন দেবতার ঔরসে কুন্তী ও মাদ্রীর সন্তানলাভ সম্পূর্ণ বিধিসম্মত ব্যাপার, এবং এগুলো প্রণয়ের উদাহরণও নয়।)

কালিদাসের কালে নারীর সামাজিক অবস্থা বিষয়ে যা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তা এই। সমাজ ছিলো সম্পূর্ণরূপে পুরুষ ও ব্রাহ্মণশাসিত; উচ্চবর্ণের পুরুষের পক্ষে বহুপত্নীকতা ছিলো নিয়ম, অবিবাহিত ও বিবাহিত পুরুষের উপপত্নী ও গণিকাগ্রহণে সামাজিক অনুমোদন ছিলো, কিন্তু কুলনারীকে হ'তে হ'তো — যক্ষপত্নীর মতোই — 'একপত্নী', নিশ্চল এবং (কখনো-কখনো) নির্বোধভাবে একনিষ্ঠ। সপত্নীসহ অন্তঃপুরে থাকতেন তাঁরা, স্বামী যেখানে বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে আমোদ করতেন সেখানে আসতেন না। কিন্তু নারীর মধ্যে অন্য একটি বৃহৎ শ্রেণী ছিলো, তারা বেশ্যা; তারা সুশিক্ষিত, নানা কলায় নিপুণ ও সমাজে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। তাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিলো, কিন্তু নিম্নতম স্তরেও তারা পতিতা বা ভয়ঙ্করী ব'লে চিহ্নিত ছিলো না, তার অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই এই যে প্রাচীন জগতে উপদংশ রোগ অজ্ঞাত ছিলো। উপরন্তু, বাৎস্যায়নের হৃদয়হীন উপদেশ সত্ত্বেও গণিকাদের মধ্যে যে মনুষ্যধর্মের উন্নত বিকাশ দেখা যেতো, তার প্রমাণ আছে বৌদ্ধ কাহিনীতে আর 'মৃচ্ছকটিকে'র নায়িকার চিত্রণে। কুলস্ত্রীরা ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত, গৃহকর্ম ও সন্তানপালন ভিন্ন অন্য সব বিষয়ে অনভিজ্ঞ; বিদগ্ধ পতিরা তাঁদের কাছে সঙ্গ পেতেন না, তাই গণিকারূপ প্রতিষ্ঠানটি সব পুরুষের পক্ষেই প্রয়োজনীয় ও প্রকৃষ্টদের পক্ষে অপরিহার্য ছিলো। কবি কালিদাস ও রাজা বিক্রমাদিত্য একই বারমুখীর প্রণয়াসক্ত ছিলেন, এই লোকপ্রবাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দেয়া যায় না; বিখ্যাত আথেনীয় গণিকা আস্পাসিয়ার গৃহে প্রৌঢ় পেরিক্লেস ও তরুণ সক্রেটিস-এ দেখাশোনা হতো; পরে ধর্মপত্নীকে ত্যাগ ক'রে, পেরিক্লেস

আস্পাসিয়াকেই জীবনসঙ্গিনী ক'রে নেন। পেরিক্লেস-এর আথেন্স ও গুপ্তযুগের ভারতে কালের ব্যবধান প্রায় এক হাজার বছরের ; কিন্তু এ-দুয়ের সমাজব্যবস্থা মোটের উপর একই ছাঁচে গড়া ব'লে মনে হয় — যদিও (মনুসংহিতায় বহু কুখ্যাত উক্তি সত্ত্বেও) তুলনায় হিন্দু গৃহিণীরা কিছুটা কম বন্দিনী ছিলেন। ভারতে গণিকা ও কুলনারীর মেলামেশায় বাধা ছিলো না, কিন্তু গ্রীক hetaera (মূল অর্থ বান্ধবী) দের পক্ষে মেট্রনরা ছিলেন কঠোরভাবে দূরবর্তিনী (টী পৃ৪০ দ্র)। কালিদাস-বর্ণিত অভিসারপ্রথা গণিকাবৃত্তিরই একটি আদর্শচিত্র ব'লে মনে হয়।

শ্লোক ৩৯

'পারাবত' অর্থ পায়রা ও ঘুঘু দু-ই হ'তে পারে ; বিজ্ঞানীর মতেও এদের জাতি এক, কিন্তু কালিদাসের পারাবত আমাদের চিরপরিচিত গৃহকপোত (গোলা-পায়রা বা rock pigeon)। ভারতীয় সংস্কারে ঘুঘু আশার দূত বা প্রেমের চিত্রকল্প নয়, উল্টে তাকে 'গৃহনাশন, ভীষণ, অগ্নিসহায়' প্রভৃতি আখ্যা দেয়া হয়েছে ; লৌকিক বাংলাতেও 'ঘুঘু লোক'টি প্রণয়যোগ্য নয় এবং 'ভিটেতে ঘুঘু চরা' মানে সর্বনাশ। পক্ষান্তরে, কপোতের সংস্কৃত বিশেষণ 'বাগ্‌বিলাসী', 'মদন' ও 'মদনমোহন', আর বাংলা সাহিত্যেও প্রেমিক-পায়রার বহু উল্লেখ পাওয়া যায় ('কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে'. 'আহা তুমি পায়রাটি ফুটফুটে / আর আমি পায়রাটি মিশকালো…')।

আপনার : মূলে 'ভবান্' আছে।

শ্লোক ৪০

বিবাহিতা স্ত্রীর পারিবারিক ও সামাজিক স্থান কত নিচুতে ছিলো, এই শ্লোকে তা বোঝা যায়। পতিরা অন্যত্র রাত কাটিয়ে ভোরে ফিরে এসে পত্নীদের চোখের জল যদি মুছিয়ে দেন, তাতেই সতীরা ধন্য!

খণ্ডিতা : উপেক্ষিতা : যে-নারীর পতি অন্য সঙ্গিনী নিয়েছে।

শ্লোক ৪১

অমল হৃদয়ের মতো সে-জলধারা : 'রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা' (বা-রাম, বাল ২ : ৫ : তমসানদীর বর্ণনা)।

গম্ভীরা নদীকে কেউ শনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন ব'লে জানি না।

তোমার ছায়ারূপে, 'ছায়াত্মাপি' : মল্লিনাথের ব্যাখ্যা — ইচ্ছা না-থাকলেও প্রতিবিম্বশরীরে জলের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, মেঘ না-চাইলেও জলে তার ছায়া পড়বেই। মেঘ 'প্রকৃতিসুভগ', স্বভাবসুন্দর ; অর্থাৎ, 'ধূর্ত' নায়কের মতো সে ব্যবহার করবে না। ধূর্ত নায়ক নায়িকার অনুরাগহীন অবস্থায় তাকে আলিঙ্গন করে, সে অনুরাগের লক্ষণ দেখালে দূরে স'রে যায়। গম্ভীরাতে 'উদাত্ত' নায়িকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এই শ্লোকে মেঘ উজ্জয়িনী ছেড়ে যাচ্ছে।

শ্লোক ৪২

এই শ্লোকে গম্ভীরা নদীর কথাই বলা হচ্ছে ; এটি আদিরসের একটি চরম নমুনা।

সরিয়ে দিয়ে নীল-সলিল-বাস : 'প্রস্থানকালে প্রেয়সীর বসন হরণ ক'রে নিলে বিরহতাপের অপনোদন হয়' (মল্লি)। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করলে শ্লোকটির পূর্ণ অভিঘাত পাওয়া যায় না ; নায়িকার বসন অপহৃত হ'লে তাকে ছেড়ে যাওয়া কত কঠিন, এটাই এখানে আসল কথা। 'কো বিহাতুং সমর্থঃ?' — মেঘের পক্ষেও গম্ভীরাকে ছেড়ে যাওয়া সহজ হবে না, কিন্তু বার্তাবহনে বিলম্বের আশঙ্কা সত্ত্বেও সে যেন নায়িকাকে উপেক্ষা না করে।

'নীল' অর্থ মল্লিনাথের মতে কৃষ্ণ ; কিন্তু আমরা নীল বর্ণেই সন্তুষ্ট।

শ্লোক ৪৩

উজ্জয়িনী থেকে মেঘ সোজা উত্তরে যাচ্ছে ; মধ্য-মালবে, চর্মণ্বতী (আধুনিক নাম চম্বল) নদীর দক্ষিণে দেবগিরি পাহাড়, শাস্ত্রীর মতে 'কার্তিকের চির-বাসস্থান'। কালিদাসের কাছে কার্তিক ছিলেন বিশেষভাবে সম্মানযোগ্য (তাঁর জন্ম নিয়ে মহাকাব্য লেখা হ'লো) ; কিন্তু মৃচ্ছকটিকে তিনি চোরেদের দেবতা ব'লে উল্লিখিত আছেন — সেটা অবশ্য তেমন অসম্মানজনক নয়, কেননা মনোহরতম গ্রীক দেবতা হের্মেসও তস্করগুরু। কিন্তু আধুনিক যুগে, অন্তত উত্তরভারতে, এই দেবতাটির শোচনীয় অধঃপতন ঘটেছে ; উনিশ-শতকী 'কলকাতার বাবু'র মতো চেহারা নিয়ে, হাস্যকর একটি ময়ূরে চ'ড়ে, তিনি অগত্যা কৌমার্যগুণে বঙ্গদেশীয় গণিকাদের পূজ্য হয়েছেন। বোধ হয় একই কারণে দক্ষিণভারতে কার্তিকপূজা মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

শ্লোক ৪৪

'পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা' : মেঘ কামরূপী, ইচ্ছেমতো যে-কোনো রূপ ধারণ করতে পারে ; এই শ্লোকেও যক্ষ মেঘকে 'আপনি' বলছে।

শ্লোক ৪৫-৪৬

পাবাক : পাবক বা অগ্নি থেকে জাত : কার্তিক। শিববীর্য অগ্নিমুখে পতিত হ'য়ে কার্তিকের জন্ম দেয়, এই প্রবাদ আছে। মতান্তরে শিববীর্য প্রথমে গঙ্গাবক্ষে পতিত হয়, কিন্তু গঙ্গা তা সহ্য করতে পারলেন না দেখে মহাদেব তা শরবনে নিক্ষেপ করেন, সেখানে কৃত্তিকাগণের দ্বারা লালিত হয়েছিলেন ব'লেই দেবসেনাপতির নাম কার্তিকেয়। সুরভি : পুরাণে উক্ত কামধেনু ; তার সন্তান, গোজাতি। দশপুরের রাজা রন্তিদেব একবার গোমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তারই গোরক্তধারায় চর্মন্বতী বা চম্বলের সৃষ্টি হয়*। Wilson-এর মতে এই নদী বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর-পশ্চিম অংশ থেকে নির্গত।

শিব একাই কার্তিকের জন্ম দেন ('কুমারসম্ভবে' হরগৌরীর বিবাহ-ব্যাপারই প্রধান, কার্তিকের জন্মটা গৌণ) ; এবং একটি উপাখ্যান অনুসারে গণেশের জন্ম হয় পার্বতীর গাত্রমল থেকে, শিবের তাতে কোনো অংশ ছিলো না। বাঙালীর দুর্গাপ্রতিমায় যে-আদর্শ পরিবার চিত্রিত হয়েছে, তার মূল খুঁজলে দেখা যাবে লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিব ও পার্বতীর চেয়েও প্রাচীন ; পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজন শুধু পিতার, অন্যজন শুধু মাতার সন্তান। গণেশ-জন্মের পূর্বোক্ত কাহিনী মেনে নিলে বলা যায়, হরপার্বতীর মিলনের ফলে একটি সন্তানেরও জন্ম হয়নি। অর্থাৎ, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'র পরম প্রতিবাদ করেছেন স্বয়ং আদর্শ পতি মহাদেব। এ-ভাবে দেখলে হরগৌরীর প্রেম ও পারিবারিক জীবন আরো বেশি মহিমান্বিত ব'লে মনে হয়।

স্খলিত পালক : যে-পালক আপনি খ'সে পড়ে। ('ন তু লৌল্যাৎ, স্বয়ং ছিন্নমিতি ভাবঃ।' মল্লি।)

---

* প্রাচীন ভারতে যে গোমাংসভোজনের প্রচলন ছিলো রন্তিদেবের কাহিনীতে তারই প্রমাণ আছে ব'লে অনেকে মনে করেন ; রন্তিদেবের বহুগোঘাতক যজ্ঞের পরেই গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়ে যায়, এমন একটি মত প্রচলিত আছে। —চতুর্থ সংস্করণের টী।

গো-বলি ও গোমাংসভোজনের সরল উল্লেখের জন্য ঋগ্বেদ : ১ : ১৬৪ : ৪৩ দ্র। 'আমি দূর হইতে শুষ্ক গোময়সম্ভূত ধূম দেখিলাম। চতুর্দিকে ব্যাপ্ত নিকৃষ্ট ধূমের পর অগ্নিকে দেখিলাম। বীরগণ শুক্লবর্ণ বৃষ পাক করিতেছেন। তাঁহাদের এই অনুষ্ঠানই প্রথম' (অনু: রমেশচন্দ্র দত্ত)। —পঞ্চমসংস্করণের টী।

বর্ষার শেষে ময়ূরের পালক খ'সে পড়ে, নতুন পুচ্ছ গজাতে পাঁচ ছ মাস সময় লাগে। ময়ূরপুচ্ছের ব্যবহার ভারতে এখনো বহুল, কিন্তু তার জন্য জীবহত্যা করতে হয় না, স্বভাবত স্খলিত পুচ্ছেই কাজ চ'লে যায়। উত্তর-পশ্চিম ভারত ময়ূরের বাসভূমি, সেই অঞ্চলে ময়ূর পবিত্র জীব ব'লে গণ্য, কোনো-কোনো রাজ্যে অবধ্য, কিন্তু রাজস্থানে ময়ূরমাংসভক্ষণ প্রচলিত আছে।

ধবলিত নয়ন-কোনা : ময়ূরের চোখের রং ঘন বাদামি, ধারের বৃত্তটি শাদা। পূ২৩ ও উ৮২-তে ময়ূরকে 'শুক্লাপাঙ্গ' বলা হয়েছে একই কারণে।

সবীণ সিদ্ধেরা : বীণাধারী কিন্নরাদি।

৪৬ সংখ্যক শ্লোকটি কালিদাসের মতো কবি কেন লিখেছিলেন, আমাদের পক্ষে তা ভেবে পাওয়া শক্ত।

শ্লোক ৪৭

শার্ঙ্গী : যিনি শৃঙ্গনির্মিত ধনুক ধারণ করেন : কৃষ্ণ। 'মেঘদূতে' কৃষ্ণের উল্লেখ দু-বার মাত্র আছে ; অন্যটির জন্য পূ১৫ দ্র।

গগনচারীগণ : 'গগনগতয়ঃ' : গন্ধর্বাদি দেবযোনি। এরা আকাশ-বিহারী ; এদের উড্ডীন অবস্থার বহু মূর্তি ক্ষোদিত হয়েছে (চিত্র ৮ দ্র)। 'মেঘদূত' প'ড়ে আমাদের মনের চোখে এদের যে-ছবি জেগে ওঠে, ভারতীয় ভাস্কর্যে তার পূর্ণ অনুমোদন পাওয়া যায়।

একক লহরের : ' একং মুক্তাগুণমিব' : একগাছি হার বা একনরী হার অর্থ হ'তে পারে। আমি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছি।

শ্লোক ৪৮

দশপুর : পৌরাণিক রাজা রন্তিদেবের রাজধানী, শাস্ত্রীর মতে আধুনিক মান্দাশোর, Wilson-এর মতে চম্বল নদীর উত্তরস্থ রন্তপুর বা রিন্তিপুর।

ধবলে শোভা পায় কৃষ্ণ : মূলের 'কৃষ্ণসার' শব্দটি দেখে প্রথমে ভয় হয় কালিদাস বুঝি আরো একবার নারীর ও হরিণের দৃষ্টির সাদৃশ্য টানছেন, কিন্তু মল্লিনাথ বুঝিয়েছেন 'সার' বা 'শার' অর্থ 'কৃষ্ণরক্তসিত' (কালো, লাল ও শ্বেতবর্ণযুক্ত), অতএব কৃষ্ণসার = কৃষ্ণপ্রধান শ্বেত (কৃষ্ণতার প্রাধান্যের জন্য লাল রং বোঝা যাচ্ছে না)। ভ্রমর যেমন কালো, তেমনি শাদা কুন্দফুল ; এ-দুয়ের সমাবেশে চোখের কৃষ্ণশ্বেতের প্রতিবিম্ব ধরা পড়েছে। আর দশপুর-

বধূরা চক্ষুপক্ষ্ম উৎক্ষিপ্ত ক'রে মেঘ দেখছে ব'লে, তাদের চোখের মধ্যে কালো ও শাদার বিভরণ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। এই বর্ণনাতেও কালিদাসের পূ'রাবর্তী বাল্মীকি, সীতার চোখের অন্যতম বিশেষণ 'কৃষ্ণবিশালশুক্লম্'।

শ্লোক ৪৯

ব্রহ্মাবর্ত : মনুতে আছে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী, এই দুই নদীর মধ্যস্থিত দেবনির্মিত ভূখণ্ডের নাম ব্রহ্মাবর্ত। '(ব্রহ্মাবর্ত) আদিম আর্যভূমি—চাতুর্বর্ণ্য সমাজের উৎপত্তিস্থান (শাস্ত্রী)।' দৃষদ্বতী (মূল অর্থ প্রস্তরাকীর্ণ) ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে, কিন্তু বর্তমানে তার কী নাম, বা অস্তিত্ব আছে কিনা, তা অনিশ্চিত মনে হয়।

কমলদলে তুমি যেমন ঢালো জল : এই উপমায় সর্বাঙ্গীণ সংগতি নেই; পদ্মের মুখে ধারাবর্ষণ শরবর্ষণের মতো মারাত্মক হ'তে পারে, কিন্তু যোদ্ধাদের মুখ পদ্মের মতো ব'লে কল্পনা করা দুঃসাধ্য। লক্ষণীয়, কালিদাস বর্ণনাসূত্রে যেখানেই পেরেছেন মেঘের উল্লেখ করেছেন : 'এবং তুমি যাকে ফোটাও, সেই নীপে' (উ৬৬), 'তোমারই অনুরূপ মেঘেরা' (উ৭২), 'তোমার তাড়নায় পীড়িত ইন্দুর দৈন্য' (উ৮৭)। উত্তরমেঘের প্রথম শ্লোকের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

শ্লোক ৫০

সরস্বতী : M. W.-র অভিধান অনুসারে ঋগ্বেদে উল্লিখিত পঞ্জাবের সিন্ধুনদীর নামান্তর, কিন্তু কখনো-কখনো ব্রহ্মাবর্তের সীমান্তরূপী নদীকেও বোঝায়। এই নদী ছোটো হ'লেও পবিত্র, অন্তঃশীল হ'য়ে এলাহাবাদের কাছে গঙ্গা-যমুনায় মিলিত হয়েছে ব'লে প্রসিদ্ধি আছে, তাই প্রয়াগের এক নাম ত্রিবেণী। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে নিরপেক্ষ বলরাম এই সরস্বতীর তীরে বাস করেন।

শ্লোক ৫১

কনখল : হরিদ্বারের নিকটবর্তী স্থান। পুরাকালে প্রসিদ্ধি ছিলো, এখানে গঙ্গা পর্বত ছেড়ে ভারতের সমতলে নেমেছে, কিন্তু ভারতের আধুনিক ভূগোলের সঙ্গে এই বর্ণনা মেলে না। কনখল দক্ষযজ্ঞের ঘটনাস্থল। হরিদ্বারে গঙ্গা ২২০০০ ফুট থেকে ৫০০ ফুটে নেমে আসছে, পাহাড়ের ধাপে-ধাপে আহত হয়ে তার ফেনিল অবতরণের কথা ভাবলে এই শ্লোক আরো জীবন্ত হ'য়ে ওঠে।

Wilson বলেছেন 'কনখল'-এর আদিরূপ কলখল (জলস্রোতের অনুকার-শব্দ), কিন্তু কনখল শব্দই প্রামাণিক। স্কন্দপুরাণের 'গঙ্গাদ্বারমাহাত্ম্য' অংশে একটি শ্লোকে আছে : এমন খল (দুর্জন) কে [কঃ খলঃ ন], যে এখানে স্নান ক'রে মোক্ষলাভ না করবে ? অতএব মুনিগণ এই তীর্থের নাম দিয়েছেন 'ক-ন-খল।'

শ্লোকের শেষার্ধ বিষয়ে ম'ল্ল : 'যেমন কোনো প্রৌঢ়া (পরিণতা) নায়িকা সপত্নীকে সহ্য করতে না-পেরে বল্লভের কেশ আকর্ষণ করে, তেমনি গঙ্গা'ই। বা-রাম অনুসারে গঙ্গা উমার সহোদরা, হিমালয় ও মেনার জ্যেষ্ঠা কন্যা। এই প্রসিদ্ধি মনে রাখলে গঙ্গাবতরণকালে উমা ও গঙ্গার পারস্পরিক ঈর্ষা আরো অর্থময় হ'য়ে ওঠে। উপরন্তু, গঙ্গাকে কার্তিকের অর্ধেক মাতা বলা যায় (টী পৃ৪৫-৪৬ দ্র)। গঙ্গা শিবের তেজ সহ্য করতে পারেননি ; তাঁর গর্ভ থেকে চ্যুত হয়েছিলেন ব'লে কার্তিকের এক নাম স্কন্দ (স্কন্ন = চ্যুত)।

শ্লোক ৫২

মূলে আছে 'সুরগজ' (দিক্‌হস্তী) ; 'ঐরাবত' অনুবাদ করলে ভুল হয় না। মেঘের পশ্চাদ্‌ভাগ আকাশে লম্বিত, পূর্বার্ধ (মস্তক, মুখ ই) গঙ্গার বুকে নেমে এলো, আর তার বর্ণ যমুনার মতোই কালো। উপমার ঔচিত্য মানতেই হয়। গঙ্গাযমুনা-সংগমের সবিস্তার বর্ণনার জন্য 'রঘু' : ১৩ : ৫৪-৫৭ দ্র।'

এই শ্লোকে ও পৃ৫৫-এ মূলে 'আপনি' আছে, কিন্তু অনুবাদে তা গ্রহণ করার আমি প্রয়োজন দেখিনি।

শ্লোক ৫৩

কথিত আছে, হরবৃষ-কর্তৃক উৎখাত পঙ্কদ্বারাই কৈলাসের শৃঙ্গ গঠিত হয়।

গলিত গঙ্গার উৎস : ('তস্যা [গঙ্গার] এব প্রভবম্')। গঙ্গার উৎপত্তি-স্থল এই ধবলগিরি বা হিমালয় শিবের গার্হস্থ্য বা দাম্পত্যসুখের ঘটনাস্থল, তাই মেঘের পক্ষেও তা বিশেষ উপভোগ্য হবে — এই হ'লো মল্লিনাথের ব্যাখ্যা।

শ্লোক ৫৪-৫৫

চমর : স্ত্রী, চমরী : তিব্বতি লোমশ গোরু বা মহিষ, এদের লোমে তৈরি পাখার নামই চামর। শরভ : বেদোক্ত হিমালয়বাসী প্রাণী, মহামৃগ বা

মহাসিংহ, কারো-কারো মতে ঊর্ধ্বনেত্র, অষ্টপদযুক্ত, সিংহঘাতী হরিণ। হয়তো বা 'Abominable Snowman'-এর প্রবাদের এখানেই সূত্রপাত।

সরলবৃক্ষ : মল্লির অর্থ দেবদারু (cedar জাতীয়), কিন্তু ইংরেজ লেখকদের মতে এক প্রকার পাইন।

দাবানলের বিস্তৃত বর্ণনার জন্য 'ঋতু' : ১ : ২২-২৭ দ্র।

শ্লোক ৫৭

বেণু, 'কীচক' : 'এক রকম বাঁশ, পোকায় তার গায়ে ছিদ্র করে, সেই ছিদ্রে বাতাস ঢুকলে বাঁশির মতো শব্দ হয় এই প্রসিদ্ধি আছে।' রা-ব।

যেমন 'ঋতু : ২-এর সঙ্গে বর্ষাবর্ণনার, তেমনি 'কুমার' : ১-এর সঙ্গে 'মেঘদূতে'র হিমালয়বর্ণনার সাদৃশ্য প্রচুর, কিন্তু শ্লোক ধ'রে-ধ'রে তুলনা করলে 'মেঘদূতে'র শ্রেষ্ঠতাই শুধু ধরা পড়ে। 'কুমার' : ১ : ৮-এর ভাবার্থ : 'গুহামুখে উত্থিত বাতাস কীচকরন্ধ্রে স্বনিত হ'য়ে কিন্নরকণ্ঠের গানের মতো শোনাচ্ছে' ; এই সাধারণ তথ্য, ত্রিপুরবিজয়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হ'য়ে, এখানে একটি নতুন আয়তন পেলো।

'ত্রিপুর' ও 'ত্রিলোক' ঠিক সমার্থক নয় ; বেদোক্ত ত্রিলোকের অর্থ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল (সমগ্র বিশ্ব), কিন্তু ত্রিপুর অর্থ আকাশ (স্বর্গ), অন্তরিক্ষ (বায়ুমণ্ডল) ও পৃথিবী। ময় নামক অসুর (যার স্বভাব মহাভারতের বাস্তু-শিল্পী ময়ের মতো প্রীতিকর নয়) একবার তপোবলে স্বর্গ জয় ক'রে আকাশ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীতে স্বর্ণ, রজত ও লৌহময় তিন পুর (নগর বা দুর্গ) নির্মাণ করে, এবং সেই তিনকে এমনভাবে একীভূত করে যে তা ভেদ করা ইন্দ্রাদি দেবগণের অসাধ্য হ'লো। অসাধ্য এই কারণে যে একটিমাত্র তীরক্ষেপে একবারে ভেদ করতে না-পারলে তা কখনো ধ্বংস হবে না। অগত্যা দেবতারা শিবের শরণাপন্ন হলেন ; শিব একটিমাত্র তীর ছুঁড়ে ত্রিপুর ও আসুর শক্তি বিনষ্ট ক'রে বিশ্বে দেবরাজ্য ফিরিয়ে আনলেন। এলুরার কৈলাসনাথ মন্দিরে এই ঘটনার আশ্চর্য মূর্তি ক্ষোদিত আছে ; সেখানে ব্রহ্মা শিবের সারথি, শিবের বাহুতে ধনু উত্তোলিত, আর তাঁর ক্ষীণ, তরুণ, সুঠাম দেহটি চেষ্টাহীন, চিন্তাহীন — প্রায় শিথিল (চিত্র ১১ দ্র)।

শ্লোক ৫৮

কার্তিকের সঙ্গে ভৃগুপতি বা পরশুরামের যখন যুদ্ধ হয়, পরশুরাম তীর ছুঁড়ে ক্রৌঞ্চ পাহাড় ফুটো ক'রে দিয়েছিলেন। এই সুড়ঙ্গের নাম ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, তা মানসযাত্রী হংসগণের দ্বারস্বরূপ। ক্রৌঞ্চরন্ধ্র আজও বিদ্যমান। 'মেঘদূতে' অলকা ভিন্ন কোনো স্থানই কাল্পনিক নয়, তবে কালিদাস খুব সম্ভব অলকার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন, তাঁর মনের ধর্ম এমন ছিলো না যাতে কোনো Xanaduর কল্পনা সেখানে জাগতে পারে।

মহাভারত, বনপর্ব অনুসারে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র কার্তিকেয়র কীর্তি, পরশুরামের নয়। সেখানে কার্তিকের জন্মকথাও ভিন্ন (টী পৃ৪৫-৪৬, ৫১ দ্র) : দক্ষদুহিতা স্বাহা অগ্নির বীর্য হস্ত দ্বারা গ্রহণ ক'রে ছয়বার হিমালয়ের কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন—সেই স্কন্ন (স্খলিত) রেতঃ থেকে যে পুত্রসন্তান উৎপন্ন হন তিনিই স্কন্দ। তাঁর মস্তক ছয়টি, হস্ত, চক্ষু ও কর্ণের সংখ্যা বারো। ভূমিষ্ঠ হবার দিনই তিনি শিবের ত্রিপুরধ্বংসী ধনুঃশর তুলে নিয়ে পর্বতগাত্র বিদীর্ণ করেন। (বন : ২২৪, কালীপ্রসন্ন সংস্করণ।)

বন : ২৩০-এ কথিত আছে যে মহাদেব অগ্নিতে ও উমা স্বাহাতে সন্নিবিষ্ট হ'য়ে স্কন্দকে উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৫৯

'কৈল' শব্দের ধাতুগত অর্থ কেলিত্ব, কেলি বা সম্ভোগের ভাব, তার আস (আবাস) কৈলাস। মানস সরোবরের উত্তরে স্থিত এই সম্ভোগভূমি কুবেরের রাজধানী ও শিবের বিচরণস্থল। (ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত অনেকটা একইভাবে কল্পিত হয়েছিলো : লঙ্কা ও কৈলাস দুই ভ্রাতার রাজ্য, গৌরবে প্রতিযোগী, উভয় স্থলই শিবকর্তৃক রক্ষিত।) পাশ্চাত্ত্য পর্যটকদের মতে কৈলাসের উচ্চতা ২০,২০০ ফুট, এর তিব্বতি নাম 'তুষার-চূড়া'। রাবণ একবার কৈলাস পর্বত উৎপাটনের চেষ্টা করেছিলেন—ইচ্ছে ছিলো সেটি লঙ্কায় নিয়ে যাবেন, কিন্তু শিব তাঁর পদাঙ্গুলির চাপে রাবণকে পাহাড়ের তলায় বন্দী ক'রে রাখেন। রাবণের মুক্তিলাভের চেষ্টায় কৈলাস কেঁপে ওঠে, তার উপরিভাগ শিথিল হ'য়ে যায়। এলুরার ও এলিফ্যান্টার গুহাগাত্রে এই উপাখ্যান প্রস্তরে রূপায়িত হয়েছে, তাতে ত্রস্তা পার্বতীকে প্রেমিক শিব আশ্বস্ত করছেন। পূর্বোক্ত ত্রিপুরান্তকের মতো, এলুরার মূর্তিটি হিন্দু প্রতিভার একটি মহত্তম সৃষ্টি (চিত্র ১২ দ্র)।

দ্যুলোকবনিতার দর্পণ, 'ত্রিদশবনিতাদর্পণ' : 'স্ফটিকে অথবা রৌপ্যে নির্মিত ব'লে কৈলাস দর্পণের মতো স্বচ্ছ' (মল্লি)। 'ত্রিদশ' : তিন দশা যার, দেবতা। মানুষেরও তিন দশা : জন্ম, সত্তা ও বিনাশ ; দেবতার — বাল্য, কৈশোর ও যৌবন। কিন্তু 'ত্রিদশ' বলতে দেবতাকেই বোঝায়, মানুষকে নয়।

'ত্র্যম্বক' শব্দের ব্যুৎপত্তি কৌতূহলজনক। অম্বক = পিতা বা চক্ষু : ত্রিলোকের পিতা ও ত্রিলোচন, এই দুই অর্থই ধ্বনিত হচ্ছে। তিন অম্ব বা মাতা যার, এই অর্থও অভিধানে প্রাপ্য। M. W. অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কেমন ক'রে শিবের মাতৃরূপিণী হলেন আমি তা আবিষ্কার করতে পারিনি

নিত্য-জ'মে-ওঠা অট্টহাসি যেন রাষ্ট্র করেছেন ত্র্যম্বক : এই পঙক্তি 'মেঘদূতে'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব'লে আমার মনে হয়। শুভ্র বস্তুর সঙ্গে হাসির তুলনা সংস্কৃত কাব্যের একটি প্রথা হ'লেও (পৃ৫১ দ্রু), শুভ্র বিস্তীর্ণ আকাশস্পর্শী চূড়ার সঙ্গে শিবের রাশি-রাশি অট্টহাসির তুলনায় যে-আবেদন আছে তা নিয়মে বাঁধা সংস্কৃত কবিতার পক্ষে আশ্চর্য। মূলের 'প্রতিদিন-মিব'-র পাঠান্তর 'প্রতিদিশমিব'তেও অর্থ খুব ভালো হয়, আমি 'রাষ্ট্র' শব্দে তার আভাস দিতে চেয়েছি।

শ্লোক ৬০

হাতির দাঁত পুরানো হ'লে পীতাভ হয়, সদ্য-কাটা অবস্থায় ঝকঝকে শাদা থাকে।

বলরামের গাত্রবর্ণ শুভ্র, গাত্রবাস শ্যামল। ('মেচক' — শ্যামল)

শ্লোক ৬১

রম্য সে-গিরিতে : কৈলাসে ('তস্মিন ক্রীড়াশৈলে')। কৈলাস (রজত), কনক, মন্দর ও গন্ধমাদন, এই চার শৈল শিবের ক্রীড়ার্থে নির্মিত হয়। উত্তর-মেঘে যক্ষ তার ভবনলগ্ন ক্রীড়াশৈলের উল্লেখ করছে। 'ক্রীড়াশৈলে আপন মনে কণ্ঠ দিতেম ছাড়ি,' রবীন্দ্রনাথের এই অভীপ্সা সত্ত্বেও বলতে হয় যে কালিদাসের ক্রীড়াশৈল প্রধানত রতিবিলাসভূমি।

* অমরকোষ-টীকা অনুসারে চন্দ্রশেখর-রূপী অবতারে শিবের মাতার সংখ্যা তিন (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' 'ত্র্যম্বক' শব্দ দ্র)। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' দ্র। — চতুর্থ সংস্করণের পাদটীকা।

ক্রমশ ধাপে-ধাপে ই। মূলে 'সোপান' আছে; বা-রামে স্তরে-স্তরে সজ্জিত বর্ষার মেঘের সঙ্গে 'সোপান পঙক্তি'র তুলনা পাওয়া যায়।

শ্লোক ৬২

বলয়কুলিশ : কুলিশ—বলয়ের কোটি বা খোঁচা, অথবা বজ্র। বজ্রের এক অর্থ হীরক। পুরাকালে ধারণা ছিলো, হীরক ও বজ্র একই উপাদানে গঠিত। অতএব 'বলয়কুলিশের আঘাত' নানা অর্থের আভাস দিচ্ছে : সরল অর্থ—কঙ্কণের খোঁচায় জল নির্গত করাবে, কিন্তু সুরযুবতীদের কঙ্কণ যদি হীরকে গঠিত ব'লে ভাবা যায় তা'হলে বজ্রের সঙ্গেও সম্বন্ধও ধ্বনিত হয়—বজ্রপাতের পরেই যেমন বৃষ্টি, তেমনি তাদের হীরকবলয়রূপ বজ্রের আঘাতে মেঘ তাদের বারিধারায় স্নান করাবে।

আমোদে মাতোয়ারা, 'ক্রীড়ালোলাঃ' : ক্রীড়াসক্তা, প্রমত্তা। যুবতীরা যে মেঘকে ছেড়ে দিতে চাইবে না তা শুধু স্নানের সুখের জন্য নয়, সম্ভবত এখানে 'ক্রীড়া' শব্দে আদিরসাত্মক-ইঙ্গিত আছে।

সংস্কৃত সমালোচনা অনেক সময় চুলচেরা ওকালতিতে পর্যবসিত হয়; 'ঘর্মলব্ধ' নিয়ে মল্লিনাথ বিস্তর চিন্তা করেছেন। ঘর্ম—গ্রীষ্মকাল, কিন্তু মেঘ কেমন ক'রে গ্রীষ্মে লব্ধ হ'তে পারে, কেননা মেঘ দেখা দিলেই তো গ্রীষ্ম নিবারিত হয়? 'দেবভূমিতে সর্বদা সর্বঋতুর সমাহার ঘ'টে থাকে' (উ৬৬ টী দ্র) এই হ'লো মল্লিনাথের যুক্তি, কিংবা 'আষাঢ়ের প্রথম দিন ব'লে এই মেঘই প্রথম।' মল্লিনাথের মতোই আইনের প্যাঁচ খাটিয়ে আপত্তি তোলা যায় মেঘ রামগিরি থেকে পয়লা আষাঢ়ে যাত্রা ক'রে সেই তারিখেই কৈলাসে পৌঁছতে পারে না; পথে এতবার বিশ্রামের নির্দেশ আছে যে মল্লিনাথ-কথিত 'প্রথম' মেঘ কৈলাসে উদিত হ'তে-হ'তে ধারাবর্ষণ নেমে যাবার কথা। কিন্তু এই সবই অর্থহীন তর্ক; আমরা ভারতবাসীরা সকলেই জানি—এবং কালিদাস ও মল্লিনাথও তা জানতেন—যে ভরা গ্রীষ্মেই বর্ষা নেমে থাকে, বর্ষাঋতুতে প্রতিদিনই বৃষ্টিপাত হয় না, এবং বৃষ্টিহীন দিনগুলিতে উত্তাপ অনুভূত হয়। এখানে মল্লিনাথ অভিজ্ঞতার উপরে স্থান দিয়েছেন তাঁর বুদ্ধিকে, তাঁর কালের পক্ষে সেটাই হয়তো সংগত ছিলো; কিন্তু এ-রকম আইনের ফাঁদে প'ড়ে গেলে আমরা তখনই চাই কালিদাসের হর্ম্য ছেড়ে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসতে, যে-হাওয়ায় গান জেগে ওঠে—'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে / এসো করো স্নান নবধারাজলে।'

রূঢ় গর্জনে : 'রূঢ় দীপের আলোক লাগিল'-র অনুসরণে 'রূঢ়' এখানে তিন মাত্রায় বসিয়েছি।

শ্লোক ৬৩

সোনার অম্বুজ ফোটে যে-সরোবরে : মানস।

ঐরাবতে দিয়ো ই, 'ঐরাবতস্য ক্ষণমুখপটপ্রীতিং কামং কুর্বন্' : ঐরাবতের মুখ ক্ষণকালের জন্য ঢেকে দিয়ে তাকে আনন্দ দিয়ো। মেঘ কৈলাসে এসে ক্রীড়াশীল হবে, এই ভাবটি শ্লোক ৬১ ৬৩এ স্পষ্ট ফুটেছে।

পূর্বমেঘের উপান্ত্য শ্লোকে ঐরাবতের উল্লেখ লক্ষণীয় ; প্রথম শ্লোকের টীকা অনুসারে যক্ষের দুঃখের কারণই ঐরাবত। ঐরাবতের উপস্থিতির কারণ, ইন্দ্র সেই সময়ে শিবের দর্শন পেতে কৈলাসে আসেন (মল্লি)।

বিবিধ বিনোদনে ই। মল্লিনাথের টীকা : মেঘ মিত্রগৃহে (কৈলাসে) আছে, তাই যথেচ্ছ বিহার ক'রে মৈত্রীফল লাভ করবে। মেঘের সঙ্গে পর্বতের, পদ্মের সঙ্গে সূর্যের, চাঁদের সঙ্গে সমুদ্রের, ময়ূরের সঙ্গে মেঘের, বায়ুর সঙ্গে অগ্নির বন্ধুতা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

এই শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত ব'লে সন্দেহ করা হয়। অলকার এত কাছে এসে মেঘের দীর্ঘসূত্রতা দুঃসহ মনে হ'তে পারে, কিন্তু কাব্যের গঠনের দিক থেকে এর সমর্থন আছে।

শ্লোক ৬৪

এলিয়ে আছে কোলে : মূলে 'উৎসঙ্গ'—অঙ্ক, ক্রোড়, বিচ্ছিন্ন উরুদ্বয়।

গঙ্গা নামে তার স্রস্ত অঞ্চল : G. H. Rooke বলেন, 'হিমালয়ের শিখর-সমূহ সাধারণত কুয়াশায় ঢাকা থাকে, এখানে বলা হচ্ছে স্বর্গ থেকে পতনশীল গঙ্গাই সেই কুয়াশার কারণ।'

'অলক' ও 'অলকা' শব্দদ্বয় নিয়ে কালিদাস খেলা করেছেন ; কামিনী যেমন তার অলকে (চূর্ণকুন্তলে) মুক্তাজাল ধারণ করে, তেমনি অলকায় শিখরে জলবর্ষী মেঘ। 'অলকা'য় কেশবতী অর্থও ধ্বনিত হচ্ছে, বলা যায়। মল্লিনাথ অলকাকে বলেছেন 'স্বাধীনপতিকা নায়িকা' (পতিকে যে হাতের মুঠোয় রাখে) ; কৈলাসরূপী 'অনুকূলনায়ক' তার বিনোদনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করছে না।

বাংলা কবিতায় অঞ্চল অর্থে 'দুকূল' ব্যবহৃত হয় ; 'শব্দার্ণবে' তার অর্থ

সূক্ষ্ম বস্ত্র, উত্তরীয় ও সিতাংশুক। মল্লিনাথ এখানে অর্থ দিয়েছেন 'শুভ্র বস্ত্র'। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে সূক্ষ্মতম ক্ষৌমবাসের নামই দুকূল। অতসী বা তিসির (flax) সুতোয় দুকূল তৈরি হ'তো; কেউ-কেউ বলেন তার প্রকৃত নাম মল্ল, পরে যা থেকে 'মলমল' ও 'মসলিন' শব্দ উদ্ভূত হয়। কিন্তু মহাভারতে দুকূল ও ক্ষৌম স্বতন্ত্র বস্ত্ররূপে উল্লিখিত; দুকূল, সূক্ষ্মবস্ত্র ব'লে বল্কলের বিপরীত। যো-রা বলেন, খ্রী পূ চার শতকে বাংলা ও আসামে উৎকৃষ্ট দুকূল বোনা হ'তো।

বিমান: সাত-তলা বাড়ি (আকাশযান অর্থও হয়।)

চিনতে পারবে না ভেবো না: মেঘ আগেও অলকা দেখেছে, কেননা প্রতি বৎসরই বর্ষার মেঘ এই পথে ভ্রমণ করে।

পাহাড়ের গায়ে নেমে-আসা নদী যেন প্রিয়ের অঙ্ক থেকে পতিতা প্রিয়া — এই উপমা মূলত বাল্মীকির, কিন্তু কালিদাসের প্রয়োগে যৌন আবেদন প্রখর।

উত্তরমেঘ

শ্লোক ৬৫

এই শ্লোকে মল্লিনাথ পূর্ণোপমার দৃষ্টান্ত দেখেছেন; আমাদের কাছে এটি কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা, কিন্তু চারু শব্দযোজনার সমাবেশের জন্য রোমাঞ্চকর মনে হয়। সংস্কৃত কাব্যে বিভিন্ন সর্গ বিভিন্ন ছন্দে রচনা করার প্রথা ছিল; উত্তরমেঘে কালিদাস ছন্দ বদল করলেন না, কিন্তু একটি নতুন ও গভীরতর ধ্বনি তুলে নতুন ক'রে আমাদের মনোনিবেশ ঘটালেন। 'স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্'-এর আদি রচয়িতা বাল্মীকি।

মেঘের সঙ্গে প্রাসাদের ও বিদ্যুতের সঙ্গে বনিতার তুলনা সংস্কৃত কবিতায় একটি প্রধান 'ক্লিশে'। রাবণের 'মহীতলে স্বর্গমিব' প্রাসাদে

> মেঘ যেমন তড়িন্মালায় ভূষিত হয়, সেই গৃহ সেইরূপ বহু বরনারীর সমাবেশে সমুজ্জ্বল। (বা-রাম: সুন্দর ৭: ৭। অনু: রা-ব)

এবং কপিলবস্তুতে

> শোকবৃদ্ধিতা, কুমারদর্শনে লোলুপলোচনা স্ত্রীগণ অতি আনন্দে এবং আশায় শরৎপয়োদ-সম গৃহ হইতে চঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায় বহির্গত হইলেন। (অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত: ৮: ২০। অনু: র-ঠা)

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যে মর্মরের ব্যবহার দেখা যায় না, সাহিত্যেও মর্মরের উল্লেখ নেই ; প্রাচীনদের কল্পনায় প্রাসাদের বর্ণ বর্ষার মেঘের মতো ধূসর বা কৃষ্ণ ছিলো, মনে হয়। কপিলবস্তুর প্রাসাদকে শুভ্র বলা হয়েছে, কিন্তু শরতের মেঘে বিদ্যুৎ খেলে না, অশ্বঘোষের উপমাটি যাথার্থ্যহীন।

স্বচ্ছ ভূমিতল সজল মনে হয়, 'মণিময়ভুবঃ' : যার মেঝে মণিময়, এবং এত স্বচ্ছ যে মেঘের মতো 'অন্তস্তোয়ম্' (যা'র ভিতর জল আ'ছে) ব'লে ভুল হয়। (মহাভারতে ময়দানব-নির্মিত যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদ স্মর্তব্য।)

'সেন্দ্রচাপ' শব্দ (স + ইন্দ্রচাপ = ইন্দ্রধনুসমেত) 'ঋতুসংহারে'ও আছে (২ : ২২)।

শ্লোক ৬৬

পদ্ম শরতের ফুল, কুন্দকলি হেমন্তের, লোধ্র শীতের, কুরুবক বসন্তের, শিরীষ গ্রীষ্মের, ও কদম্ব বর্ষার। অলকায় ছয় ঋতুর ফুল একসঙ্গে ফোটে। এখানে স্মর্তব্য, লঙ্কার অশোকবন 'সর্বঋতুর পুষ্পে' শোভিত, ও দশরথের প্রাসাদে এমন বহু বৃক্ষ ছিলো যা নিত্য পুষ্পফল দেয়। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন হয়েছিলো চৈত্র মাসে, কিন্তু উৎসব উপলক্ষে রাজপথ কমল ও উৎপলে আকীর্ণ ছিলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামায়ণে অযোধ্যা-প্রত্যাবৃত্ত রাম সীতার সঙ্গে যে-অশোকবনে বিহার করেছিলেন (উত্তর : ৪২), অলকার সঙ্গে তার সাদৃশ্য অনেক। সেটিও বহু প্রকার সুন্দর পুষ্পফলপ্রসূ বৃক্ষে শোভিত, এবং সেখানেও দীর্ঘিকাসমূহের সোপানশ্রেণী মাণিক্যনির্মিত ও কুট্টিম স্ফটিকময়। ভোগ্য এবং ভুক্তিত বস্তুর তালিকায় আছে সরস মাংস ও মৈরেয়মত্ত এবং মদিরালোল অপ্সরীদের নৃত্যগীতাদি। কথিত আছে, রাম-সীতা সেখানে শীতঋতু যাপন করেছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত ফুল-ফলের মধ্যে গ্রীষ্মের পনস, বর্ষার কদম্ব ও বসন্তের বকুলও পাওয়া যায়। এবং রামায়ণের প্রসিদ্ধতর অন্য অশোক-কাননটি — যেখানে রাবণ অপহৃতা সীতাকে রেখেছিলেন — সেখানে উপাস্থিত হ'য়েও হনুমান দেখলেন সর্বঋতুর পুষ্পাল তরু ও ফলবান বৃক্ষ (সুন্দর : ১৪)। এই ঋতুসমাহার যথোচিত প্রসঙ্গে কচিৎ ঘটলে সুখকর হ'তো, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এটিকেও আমরা সংস্কৃত কাব্যের একটি 'ক্লিশে' বলে সন্দেহ না-ক'রে

পারছি না। (অশোকবন অর্থ শোকরহিত উদ্যান, প্রমোদভবন—আধুনিক প্রাকৃত ভাষায় 'বাগান-বাড়ি'।)

লীলাকমল : মল্লিনাথের অর্থ, 'লীলার্থং কমলম্', লীলা বা লাস্যের জন্য যে-পদ্ম ব্যবহৃত হয়, কিন্তু M. W. অন্যতম অর্থ দিয়েছেন 'toy-lotus' অর্থাৎ এটি কৃত্রিম পদ্মও হ'তে পারে। পার্বতী লীলাকমল দ্বারা তাঁর মুখলুব্ধ ভৃঙ্গকে সরিয়ে দেন ('কুমার' : ৩ : ৫৬) ;—আঠারো শতকের প্যারিসীয় সালঁতে মহিলাদের হাতে যেমন পাখা, লীলাকমলের ব্যবহারও সেই রকমই মনে হয়, যদিও তা পুরুষদের হাতেও দেখা যায় ('রঘু' : ৬ : ১৩)।

অবশ্য এই শ্লোকের লীলাকমল বা অন্য পুষ্পকে কৃত্রিম মনে করা সংগত নয় ; কবি ষড়ঋতুর সমাহার দেখাতে চেয়েছেন, মল্লিনাথের এই মত শ্রদ্ধেয়। কিন্তু এই পুষ্পালঙ্কারে Wilson যে-'Simplicity' দেখেছিলেন তা আমাদের কাছে অগ্রাহ্য। অলকা রত্নরাজিতে আকীর্ণ, তার বধূরাও 'গাঁয়ের বধূ' নয় ; ধাতু ও রত্নমণির অসীম ঐশ্বর্যের মধ্যে যারা বাস করে, তাদের পক্ষে ফুলের গহনাতেই চরম বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পায়।

এই শ্লোকে উল্লিখিত ফুল বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু আমাকে একটি পত্রে যা জানিয়েছেন তার সারাংশ : লোধ্র (বাং লোধ) শীতের ফুল, ছালে পীত রং পাওয়া যায়। 'সম্ভবত কালিদাসের আমলে লোধ্রপুষ্পরেণু আর লোধ ছালের গুঁড়ো দুইই চলত। কবিরা হয়ত ছালের গুঁড়োকেই গৌরবে পুষ্পরেণু বলতেন।' কুরুবক (বাং ঝিঁটি, ঝাঁটি—সং ঝিণ্টি) বুনো ফুল, পীত শাদা নীল লাল ফুল হয়। কুন্দ (বাং কুঁদ) মল্লিকা বর্গের, গন্ধ মৃদু, হেমন্ত ও শীতে ফোটে, শরৎ-বসন্তেও দেখা যায়। 'বেল জুঁই চামেলি কুঁদ শিউলি — সবই jasmine জাতীয় কিন্তু একই ঋতুর ফুল নয়।'

কারো-কারো মতে কুরুবক—কুরুণ্টক, বাং কুরকুণ্ডে, ইং amaranth—মোরগফুল। মোরগফুলের লাল ও ম্যাজেণ্টা রঙের কথা ভাবলে কালো খোঁপায় ধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ব'লে মনে হয়।

এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপন না-ক'রে পারা যায় না : অলকায় যদি ছয় ঋতু একসঙ্গে বিরাজ করে, তাহ'লে সেখানে পার্থিব বর্ষাঋতুতে প্রতি বছর মেঘের উদয় হবে কেন (টী পৃ৬৪ দ্র), আর বর্ষাগমের সার্থকতাই বা থাকে কোথায় ? মানতেই হয়, এখানে আলংকারিকের প্রিয় লজিক ভেঙে

পড়েছে, কিন্তু এ-রকম দু-একটা অসংগতি আছে ব'লেই বাঁচোয়া—এতে বোঝা যায় সংস্কৃত কবিরা সব সময় শুধু হিশেব মিলিয়ে পদ্য লেখেননি।

শ্লোক ৬৭, ৬৮

এই দুই শ্লোক অনেকের মতে প্রক্ষিপ্ত। যেখানে সর্বদাই ফুল ফোটে আর রাত্রি কখনো অন্ধকার হয় না, এমন ভূস্বর্গের কল্পনা আমাদেরও মনোমতো নয়। কিন্তু শ্লোক ৬৬ ও ৬৭-এ ভাবের সংগতি আছে; যেখানে বারোমাসের ফুল একসঙ্গে পাওয়া যায়, সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় চাঁদই বা উঠবে না কেন। নিত্য পদ্মের বিকাশ নলিনীতে : নলিনী—পদ্মের ঝাড়, মূলে বহুবচন আছে।

শ্লোক ৬৮ স্পষ্টত কাব্যের মূলবিষয়ের প্রতিবাদ করেছে; যেখানে আনন্দ ভিন্ন কেউ কাঁদে না, আর বিচ্ছেদের অনন্য কারণ প্রণয়কলহ, সেখানে যক্ষ ও তার পত্নীর এই দুর্ভোগ কেমন ক'রে ঘটতে পারলো? হয়তো এই অসংগতির জন্যই একে প্রক্ষিপ্ত ব'লে সন্দেহ করা হয়েছে। কিন্তু একে সমর্থন করা যায় না তাও নয়; মল্লিনাথের মতো যুক্তিপ্রয়োগ ক'রে বলা যায় যে যক্ষ এখন শাপগ্রস্ত ও বিগতমহিমা, তাই অলকাবাসীর দেবধর্ম থেকে চ্যুত হ'য়ে সে মনুষ্যের মতো দুঃখভাগী হয়েছে। এবং যা সাধারণত ঘটে না, এ-ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে ব'লেই যক্ষদম্পতির দুঃখ এত দুর্ভর। তবু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সহৃদয় ও ন্যায়সম্মত প্রশ্নটি বাকি থেকে যায় — যক্ষের অপরাধে যক্ষপত্নীকেও শাস্তি দেয়া হ'লো কেন? ('নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই, আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান দুজনকেই!')

শ্লোক ৬৯

তারার ছায়া দেয় ই : স্ফটিকের মেঝেতে তারার আভা যেন ফুল ছিটিয়ে দিয়েছে — এই হ'লো মল্লিনাথের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, এই বিলাসস্থানটি একটি খোলা বারান্দা বা চত্বর।

রতিফলমদ্য : মল্লিনাথ 'মদিরার্ণব' গ্রন্থ থেকে 'রতিফলমদ্যে'র প্রকরণ দিয়েছেন : দুধ, পরিস্রুত গুড়, ইক্ষুরস, কদলী ও অন্যান্য দ্রব্য, মধু ও পুষ্পাদির সঙ্গে মিশিয়ে এই স্বাদু ও শীতল স্মরোদ্দীপক মদিরা প্রস্তুত হয়। আধুনিক ভাষায় এটি একটি ককটেল।

সংস্কৃত সাহিত্যে মদ্যের উল্লেখ অসংখ্য, তার আরম্ভ ইতিহাসের আদিতে।

সমুদ্রমন্থনকালে অপ্সরাদের (অপ্ থেকে উদ্ভূত) পরে বারুণী (বরুণের কন্যা, সুরা) উঠলেন ; দিতির পুত্রেরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান ক'রে 'অসুর', ও অদিতির পুত্রেরা তাঁকে গ্রহণ ক'রে 'সুর' নামে পরিচিত হলেন। শুধু দেবতা বা দেবযোনিদের নয়, সর্ব বর্ণের নরনারীর মধ্যে সুরার ব্যবহার ব্যাপক ছিলো, কিন্তু কোনো-এক কালে ব্রাহ্মণের পক্ষে তা নিষিদ্ধ হ'য়ে যায় (মহাভারত, কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান দ্র)।

শ্লোক ৭০

হাতের মুঠো ভ'রে রত্নরাজি ই : মল্লিনাথের মতে এটি দৈশিক ক্রীড়া, এর নাম 'গুপ্তমণি'। সাধারণ ঘরের মেয়েরা পিণ্ড বা কন্দুক (বল) নিয়ে খেলা করে, অলকার কন্যারা মণিমুক্তো নিয়ে।

মন্দাকিনী, যার স্রোত মন্থর (মন্দাক্রান্তা, যার গতি মন্থর) : এ নদী পার্থিব গঙ্গা না স্বর্গের মন্দাকিনী সে-বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেননি, কিন্তু কবিতার পাঠকের পক্ষে কোনোটিতেই আপত্তি হবার কথা নয়। অলকা স্বর্গের অদূরবর্তী ব'লে অনুমেয়।

এই শ্লোকও প্রক্ষিপ্ত ব'লে কথিত, কিন্তু মণিমুক্তো নিয়ে মেয়েদের বল্ খেলার ছবিটি আমার রক্ষণযোগ্য মনে হ'লো।

মদ্য বা মদিরা মাদক পানীয়ের সাধারণ নাম, তার মধ্যে নানা উপবিভাগ আছে : সুরা ঐরেয় মৈরেয় আসব ও কোহল। যো-রায়ের মতে সুরা rice-beer, পরে whisky। তিনি কৌটিল্য থেকে ছয় প্রকার মদ্যের উল্লেখ করেছেন : মেদক প্রসন্ন আসব অরিষ্ট মৈরেয় ও মধু। আসব = liqueur, অরিষ্ট = cordial, মধু = wine (দ্রাক্ষারসে প্রস্তুত)। এদের উপাদানরূপে যব, তণ্ডুল, গুড়, দ্রাক্ষা, মধু, কিণ্ব (yeast), বিবিধ ফল ও অন্যান্য বহু দ্রব্যের উল্লেখ আছে। 'ঐরেয়' (ইরা = জল) শব্দ ফরাশি 'জীবনবারি' (eau-de-vie = ব্র্যাণ্ডি) মনে করিয়ে দেয়। 'কোহল'* যব থেকে প্রস্তুত

* 'কোহল' বিষয়ে পূর্বে যা মন্তব্য করেছিলাম, তা বর্জন ক'রে একটি পাদটীকা যোগ করছি। 'কোহল'-এর সঙ্গে 'alcohol'-এর বিষয়গত ও ভাষাগত সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। আরবি 'al-kuhl' (আল = the ; কুহ্ল = সেরাঞ্জন, আদি অর্থে সূক্ষ্ম চূর্ণ) থেকে, মধ্যযুগের লাতিন মারফৎ, য়োরোপীয় ভাষাগুলিতে 'alcohol' পৌঁছয় ; 'kuhl' থেকে এলো ইংরেজি 'kohl', (= কাজল বা সুর্মা) ; আদি উৎস 'কজ্জল' ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। সংস্কৃত 'কোহল' শব্দও 'কজ্জল'-এর সঙ্গে সংপৃক্ত কি না, এ-বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ আমি খুঁজে

(whisky); মৈরেয় = সুরা ও আসবের মিশ্রণ, রাম ও সীতা তা পান করতেন। রা-বসুর মতে ইক্ষুরস, ধান্য প্রভৃতির সহযোগে প্রস্তুত কামোদ্দীপক মদ্যের নাম মৈরেয়। রাবণের অন্তঃপুর বর্ণনা প্রসঙ্গে তালিকা-ভুক্ত আছে বিবিধ 'দিব্য ও প্রসন্ন সুরা', যার অর্থ করা যায় ফল অথবা সদ্যজাত অমিশ্র মাদক পানীয়; আর 'কৃতসুরা' (বোধ হয় মিশ্রিত মদ্য), তাছাড়া মাধ্বীক, পুষ্পাসব, ফলাসব ও শর্করাসব (সুন্দর : ১১)। রতিফলমদ্য শেষোক্ত কোনো-একটির প্রকরণভেদ হ'তে পারে।

পানশালার নাম ছিলো 'আপান' বা 'শুণ্ড' (হাতির শুঁড় বা বকযন্ত্র), তা থেকে শুণ্ডী (শুঁড়ি), মদ্যপ্রস্তুতকারী। নামান্তর, 'কল্যপাল' (কল্য = সুরা, স্বাস্থ্য বা চিত্তপ্রসাদ; তু কল্যাণ, পাশ্চাত্ত্য জাতিবর্গের 'স্বাস্থ্যপান' স্মর্তব্য)। M. W. 'আপান' অর্থ দিয়েছেন banquet বা drinking party; আপানশালা — tavern বা liquor-shop।

শ্লোক ৭১

ক্ষৌম = linen, ক্ষুমা শব্দের বিশেষণ, যার অর্থ flax অথবা শণ, মতান্তরে পট্টবস্ত্র। যো-রায়ের মতে 'ক্ষুমা'র ধাতুগত অর্থ : যা পক হ'লে শব্দিত হয় — আর যে-বস্ত্র শব্দিত হয় তা যে যৌন প্রসঙ্গের বিশেষ উপযোগী তা অভিজ্ঞজনকে ব'লে দিতে হয় না।

প্রাচীন ভারতে অভিজাতবর্গ ব্যবহার করতেন রেশম, যার সংস্কৃত নাম চীনাংশুক বা কৌষেয় (কৃমিকোষজাত), কিন্তু ক্ষৌমবাসও সম্মানিত ছিলো। বিবাহকালে দ্রৌপদীকে আমরা ক্ষৌমপরিহিতা দেখতে পাই।

বিফল হয় সেই চেষ্টা : সাধারণ দীপ হ'লে নিবে যেতো, কিন্তু মণিদীপে শিখার বদলে রত্ন জ্বলছে, কুঙ্কুমচূর্ণ তা নিবতে পারে না। মেয়েদের এই অসম্ভব চেষ্টায়, মল্লিনাথ বলেন, তাদের মুগ্ধতা (মূঢ়তা, বিহ্বলতা) সূচিত হচ্ছে।

পাইনি, তবে 'কজ্জল' (কু [কৎ] + জল)-এর মূল অর্থ কুৎসিত জল, এবং সুরাকেও বি-কৃত বা বিশেষীকৃত জল বললে ব্যাকরণগত ভুল হয় না। উল্লেখযোগ্য, আরবিতে 'alkuhl'-এর অর্থ কখনোই মাদক বারি ছিলো না, অর্থের এই পরিবর্তন ঘটে য়োরোপে। তুলনীয় 'assassin' শব্দ, আরবিতে যার অর্থ ছিলো হাশিস-সেবী (গাঁজাখোর)।

—চতুর্থ সংস্করণের পাদটীকা।

বিম্বাধরা : 'শব্দার্ণবে' স্ত্রীজাতিকে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : কামিনী, কান্তা, ভীরু, বিম্বাধরা ও অঙ্গনা। সংস্কৃত সাহিত্যে নারীদের শ্রেণীবিভাগ অফুরন্ত, তবে কাব্যে এই শব্দসমূহে অদল-বদল চলতো। আমাদের পক্ষে 'বিম্বাধরযুক্তা' অর্থই যথেষ্ট।

কামিনী = প্রণয়দাত্রী ; কান্তা = প্রণয়ভোগিনী ; বনিতা = ঈপ্সিতা। একই নারী যুগপৎ প্রণয়ের পাত্রী ও দাত্রী অথবা প্রার্থিতা ও প্রাপনীয়া নাও হ'তে পারে, কিন্তু শব্দার্থের এই পার্থক্যগুলি কবিদের ব্যবহারে সাধারণত ধ্বনিত হয় না।

শ্লোক ৭২

মল্লির মতে এই শ্লোকের একটি ব্যঙ্গ্যার্থ আছে ; দূতের সাহায্যে জার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে, এবং মেয়েদের মধ্যে ব্যভিচারদোষ ঘটিয়ে ছদ্মবেশে কোনো ক্ষুদ্র পথে পালিয়ে গেলো। 'সততগতিশীল'-এর ব্যঙ্গ্যার্থ : অন্তঃপুর-সঞ্চারী। উভয় অর্থেই 'স্বজলকণিকাদোষম্'-এর সুষ্ঠুতা ভেবে আমরা বিস্মিত হই।

চিত্রাবলি : মূলে 'আলেখ্য' আছে ; 'শব্দার্ণবে'র মতে 'আলেখ্য' যত্নে-আঁকা, ও 'চিত্র' রূপাঢ্য ছবি। কিন্তু দুয়ের মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট নয়।

শ্লোক ৭৩

চন্দ্রমণি বা চন্দ্রকান্ত : moonstone ; 'বর্ণহীন স্বচ্ছ মণি, নাড়লে ভিতরে আকাশতুল্য আভা দেখা যায়' (রা-ব)। প্রবাদ, এই মণি চন্দ্রকিরণে গঠিত হ'য়ে চন্দ্রলোকেই বিগলিত হয়। শয্যার উপরে চাঁদোয়া আছে, আর তা থেকে রেশমসূত্রে চন্দ্রমণি ঝুলছে ; মধ্যরাত্রে চাঁদ যখন উজ্জ্বল, সেই আলোয় মণিসমূহ বিগলিত হ'য়ে বিন্দুরূপে ক্ষরিত হচ্ছে — ব্যাপারটা হ'লো এই।

শ্লোক ৭৪

বৈভ্রাজ : স্বর্গীয় কানন, চৈত্ররথের নামান্তর। গন্ধর্ব চিত্ররথ কুবেরের উদ্যানসমূহ রচনা করেন।

বিবুধবনিতা : 'বিবুধ' অর্থ জ্ঞানী, কিন্তু 'বিবুধবনিতা' = স্বর্গস্ত্রী বা স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা। সমুদ্রমন্থনকালে অপ্সরাগণ যখন উত্থিত হ'লো, দেব দানব কেউ তাদের গ্রহণ না-করায় তারা গণিকারূপে গণ্য হ'লো।

এই শ্লোক কারো-কারো মতে প্রক্ষিপ্ত।

শ্লোক ৭৫

মন্দার : স্বর্গের পঞ্চপুষ্পের অন্যতম ; বাংলায় মাদার ('চলন্তিকা') অথবা ডেহুফল (ডেফল) গাছ ('বঙ্গীয় শব্দকোষ'), অথবা আকন্দ ('বাঙ্গালা ভাষার অভিধান')। M. W. একাধিক লাতিন নাম দিয়েছেন, তবে কালিদাসের মনে ঠিক কোন গাছ ছিলো তা নিশ্চিত বলা সম্ভব মনে হয় না। মল্লি কল্পবৃক্ষ অর্থ করেছেন, কিন্তু নারীর নর্মবাক্যে যে-গাছে ফুল ফোটে (টী উ৮১ দ্র), এ যদি সেই গাছ হয়, তাহ'লে একে পার্থিব গাছ ব'লেই ধরতে হবে (কেননা স্বর্গের গাছে দোহদের প্রয়োজন হ'তে পারে না), এবং পার্থিব হ'লে কবিতার আবেদনও বেড়ে যায়। (মন্দারের অন্যান্য উল্লেখের জন্য উ৭০ ও উ৭৮ দ্র।)

সোনার শতদল : মল্লির মতে স্বর্ণময় পদ্ম, কিন্তু কনকবর্ণও বোঝাতে পারে।

খণ্ড পত্রিকা : 'পত্রচ্ছেদ', পাতার টুকরো। এই টুকরোগুলো নানা ছাঁদে কাটা হ'তো, তা থেকে নায়িকা নায়কের অভিপ্রায় (বা মিলনস্থল) বুঝে নিতেন।

এই শ্লোকটিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রক্ষিপ্ত বলেছেন, কিন্তু পূ৩৮-এর আংশিক পুনরুক্তি ব'লে এটিকে গ্রাহ্য মনে হ'লো।

শ্লোক ৭৬

কন্দর্পের ধনু ইক্ষুদণ্ডে, তার জ্যা ভ্রমরপঙক্তিতে ও পঞ্চশরের অগ্রভাগ বিভিন্ন পুষ্পে (পদ্ম, অশোক, আম্রমুকুল, নবমল্লিকা, নীলপদ্ম) রচিত। মতান্তরে পঞ্চবাণের নাম : সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।

শ্লোক ৭৭

'রসাকরে' আছে, রমণীদের ভূষণ চতুর্বিধ : কচ-(কেশ) ধার্য, দেহধার্য, পরিধেয় ও বিলেপন। এ ছাড়া দৈশিক (স্থানীয়) প্রসাধনও গ্রাহ্য। এই শ্লোকে বিচিত্র বাস — পরিধেয় ; অলক্তক — বিলেপন ; কিশলয়সমেত পুষ্প— কেশধার্য ; ও অলংকার — দেহধার্য ; অতএব নয়নবিভ্রমজনক মদিরাকে দৈশিক বলতে হয়। যক্ষস্ত্রীরা সাধারণত মদ্যপান করে (উ১৮ দ্র), তাতে চোখের উজ্জ্বলতা বর্ধিত হয়। 'রেবতীলোচনাঙ্কিত' বলরামের সুরাও স্মর্তব্য (পূ৫০)।

যার আদেশে দেখা দেয় : 'বিভ্রমাদেশদক্ষম্' (বিভ্রমের আদেশে দক্ষ)। মল্লির মতে 'আদেশ' অর্থ উপদেশ। অনুবাদে 'আদেশ' ব্যবহার করতে পেরে আমি সুখী হয়েছি — যার আদেশে (প্রভাবে) চোখে বিভ্রম জন্মায়। এখানেও পুষ্পালংকারের উল্লেখদ্বারা কবি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যক্ষনারীরা মহামূল্য রত্নে ও বসনে শোভিত হ'য়েও — অথবা সেইজন্যেই — পুষ্পকে উপেক্ষা করে না।

এই শ্লোকটিকেও অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন, আর কাব্যের গতির দিক থেকে এর যথোচিত স্থান ছিলো উ৬৭-৬৮-এর প্রতিবেশে। দেখা যাচ্ছে, যে-যে স্থলে অলৌকিক ভূস্বর্গের চিত্র আছে, সেগুলোই প্রাচীন ও আধুনিক সমালোচকদের সবচেয়ে কম মনঃপূত। 'মেঘদূতে'র আবেদনের একটি প্রধান কারণ তার মানবধর্ম ; যক্ষ, দেবযোনি হ'লেও বর্তমানে বিগতমহিমা ; সে ও তার স্ত্রী সাধারণ মানুষের মতোই মরণশীল, দৈবাধীন ও দুঃখভোগী। তাদের সঙ্গে নিজেদের আমরা বহুদূর পর্যন্ত মেলাতে পারি, কিন্তু এই শ্লোকগুলির 'অবাস্তবতা'য় তার ব্যাঘাত ঘটে।

শ্লোক ৭৮

'আমাদের' (অস্মদীয়) শব্দ লক্ষণীয় ; 'আমাদের বাড়ি' বলামাত্র যক্ষের বেদনা আমরা বুঝতে পারলাম। যক্ষের ব্যক্তিগত সুর এই শ্লোকে প্রথম অনুভূত হয়, ক্রমশ তা নিবিড় হচ্ছে।

ইন্দ্রধনুকের তুল্য : 'এই তোরণ মণিময় ও ইন্দ্রধনুর মতো মেঘস্পর্শী' (মল্লি)। কিন্তু বৃত্তাকারের জন্যও ইন্দ্রধনুর তুল্য হ'তে পারে।

কৃত্রিমপুত্র : যক্ষপ্রিয়া নিঃসন্তান (টি উ৮৫ দ্র)।

শ্লোক ৭৯

বৈদূর্য : বিদূর পর্বতে জাত মণিবিশেষ ; **lapis lazuli** বা নীলকান্ত ; যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে **chrysoberyl**। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি প্রবন্ধ অনুসারে 'বৈদূর্য্য নামক রত্ন, ইংরাজীতে যাহাকে **cat's eye** বলে, উহাকে বিড়াল শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করা যাইতে পারে ; কিন্তু এই বৈদূর্য্য রত্নেরও নাকি অতি-প্রাচীন সাহিত্যে নাম নাই।' (রামেন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ২৩৪ পৃ)

হবে না যাত্রায় তৎপর : 'ন আধ্যাসত্তি', অভিলাষের সহিত স্মরণ করবে

না (আধ্যান — উৎকণ্ঠার সঙ্গে স্মরণ)। বর্ষাজনিত পঙ্কিলতা এড়াবার জন্য হাঁসেরা অন্য জল ছেড়ে মানস-সরোবরে চ'লে যায়, কিন্তু যক্ষের দিঘি চিরনির্মল, তাই মেঘ দেখেও তারা যাত্রার উদ্‌যোগ করে না।

শ্লোক ৮০

ইন্দ্রনীল : নীলকান্তমণি। কনককদলী : স্বর্ণময় কৃত্রিম কলাগাছ। যক্ষের এই চিন্তাকে মল্লি বলেছেন শালগ্রামে হরিভাবনাদর্শন, fetish।

এই ক্রীড়াশৈলের বর্ণনা প'ড়ে আমাদের নীচৈ পর্বতের 'শিলাবেশ্ম' (পৃ২৬) মনে প'ড়ে যায়।

শ্লোক ৮১

মল্লিনাথ বলছেন : নারীর স্পর্শে প্রিয়ঙ্গু বিকশিত হয়, মুখমদ্যে বকুল, পদাঘাতে অশোক, দৃষ্টিপাতে তিল আর আলিঙ্গনে কুরুবক। মন্দার ফোটে নর্মবাক্যে, পটু বা মৃদু হাস্যে চাঁপা, মুখের বাতাসে (নিশ্বাসে) আম্রমুকুল, গানে নমেরু (রুদ্রাক্ষ), আর সামনে নৃত্য করলে কর্ণিকার (কনকচাঁপা বা সোঁদাল ফুল)। 'বদনমদিরা' মল্লিনাথের মতে গণ্ডূষমদ্য ; অর্থাৎ নায়িকা মুখে মদ নিয়ে কুলি ক'রে গাছের গায়ে দিচ্ছেন, কিন্তু নিষ্ঠীবনও হ'তে পারে, কেননা ঐ বস্তু যক্ষের আকাঙ্ক্ষিত। দোহদ : যার প্রয়োগে গাছে অকালে ফুল ফোটে ; গর্ভিণীর স্পৃহা। M.W.-র মতে এই শব্দ 'দৌর্হৃদ'-এর প্রাকৃত রূপ, যার অর্থ হার্দ্য বিষাদ, বা বিবমিষা। শব্দটিতে গর্ভিণীদের বমনেচ্ছা আর নানারকম অদ্ভুত স্পৃহা দু-ই সূচিত হচ্ছে ; কিন্তু এখানে 'দোহদ' অভিলাষমাত্র, বকুলের গাছে বমন করার কথা উঠছে না, প্রণয়কালীন মুখমদ্যই কাম্য। উপরন্তু স্মর্তব্য যে যক্ষপ্রিয়া নিঃসন্তান (দ্বারপ্রান্তে তরুণ মন্দার তার পালিত পুত্র), তাই দোহদের অভিজ্ঞতা তার নেই। অশোক ফুল লাল আর শাদা দু-রকমের হয় ; মল্লিনাথ বলেন লাল রং স্মরোদ্দীপক ব'লে রক্তাশোক উল্লিখিত হয়েছে, সাদা বকুলের সঙ্গে অন্য লাল ফুলের বর্ণসমাবেশও হয়তো কবির অভিপ্রেত ছিলো। রা-ব আমাকে জানিয়েছেন, 'মাধবীর ফুল লাল হয় না, সাদা কিংবা সাদার মধ্যে ফিকে হলদে। এখানকার মালীরা Rangoon creeperকে ভুলক্রমে মাধবীলতা বলে।' 'মধু' শব্দের এক অর্থ বসন্ত ঋতু, বসন্তে ফুল ফোটে, তাই 'মাধবী' নাম।

উইলিয়ম জোন্স বলেছিলেন, পুষ্পিত অশোকতরুর চেয়ে মনোহর দৃশ্য

উদ্ভিদ্‌জগতে আর-কিছু নেই। তাঁকে সম্মান জানিয়ে লাতিনে এর নামকরণ হয়েছে Jonesia asoka।

শ্লোক ৮২

ভিত্তি মণিময় : মল্লির মতে এই মণি মরকত, emerald। মরকতের বর্ণ পীতাভ সবুজ, কিন্তু অনতিপক্ক বাঁশের উপমায় স্পর্শের মসৃণতাও বোঝাচ্ছে।

নীলকণ্ঠ : ময়ূর।

শ্লোক ৮৩

'শঙ্খ ও পদ্ম কুবেরের নবনিধির অন্তর্গত। এই দুইএর মূর্তি মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে মনুষ্যাকারে চিত্রিত হ'ত' (রা-ব)। এই দুই বস্তুই বিষ্ণু ধারণ করেন; বেদপরবর্তী হিন্দু মানসে পদ্মের পবিত্রতা অসীম, শঙ্খের মর্যাদাও কম নয়। আমরা এ-দুটিকে শুভচিহ্নরূপে গ্রহণ ক'রেই তৃপ্ত, কিন্তু শাস্ত্রী তাদের গাণিতিক মূল্য উল্লেখ করেছেন; তাঁর মতে ঐ চিহ্নদ্বয় যক্ষের ধনের বিজ্ঞাপন : এক পদ্ম + এক শঙ্খ = ১১০০০০০০০০০০০০ 'টাকা' তার আছে রবীন্দ্রনাথের 'দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র' স্মরণ ক'রে বলতে পারি, এই অর্থ স্বীকার্য হ'লে কবিতাকে শরশয্যায় শোওয়াতে হয়।

কুবেরের নবনিধি : 'শব্দার্ণবে'র মতে—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল, খর্ব। মতান্তরে, নন্দের বদলে কুন্দ।

Wilson এই নবনিধিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন : পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও খর্ব সংখ্যাবাচক শব্দ, কিন্তু তাদের অর্থান্তরও উপেক্ষণীয় নয়, বরং অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। মকর ও কচ্ছপ বিষ্ণুর অবতার, মুকুন্দ ও নন্দ তাঁর নামান্তর, 'খর্ব' শব্দে বিষ্ণুর বামনরূপ ধ্বনিত হ'তে পারে। কেউ-কেউ আটটিকে 'auriferous gems' (স্বর্ণপ্রসূ মণি) ব'লে ধ'রে নিয়েছেন — coral, pearl, cat's eye, emerald, diamond, sapphire, ruby ও topaz, কিন্তু নবমটির বিষয়ে মনস্থির করতে পারেননি। মতান্তরে, নীল = নীলমণি, পদ্ম = পদ্মরাগ, কচ্ছপ = tortoise-shell; মকর — মরকত শব্দের বিকৃতি। 'নন্দ' জৈনদের একটি গাণিতিক সংকেত। তন্ত্রশাস্ত্রে এই নববিধি লক্ষ্মীপূজার প্রতীক ব'লে চিহ্নিত।

শ্লোক ৮৪

করভ : হস্তীশাবক।

মেঘ আকারে ক্ষুদ্র হ'য়ে উচ্চস্থানে উপবিষ্ট হবে, এবং অল্প-অল্প বিদ্যুৎ

স্ফুরিত ক'রে যক্ষের অন্তর্ভবনে দৃষ্টিপাত করবে— সেই রূপসীশ্রেষ্ঠাকে হঠাৎ দেখে ফেলবে না। এই শ্লোক শুধু চিত্র হিশেবেই স্মরণীয় নয়, সৌন্দর্যের উন্মীলনের পূর্বমুহূর্তে আমাদের মনের মধ্যে এখানে টান পড়ে যেন, যেমন হয় প্রেক্ষাগৃহে আলো নেবার ও যবনিকা ওঠার মধ্যবর্তী মুহূর্তটিতে। লক্ষণীয়, মেঘ এখনো তাকে দেখতে পাচ্ছে না (উ১৮ দ্র) ; আমরা মেঘের কিছুটা আগেই তাকে দেখে ফেললাম।

শ্লোক ৮৫

শ্যামা : মল্লির মতে যুবতী বা মধ্যযৌবনা ; রা-ব অন্যান্য অর্থ দিয়েছেন, 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নারী যার গাত্র শীতকালে সুখোষ্ণ, গ্রীষ্মে সুখশীতল ; শ্যামাঙ্গী (brunette)।' (বাল্মীকির সীতাও তপ্তকাঞ্চনবর্ণা।) M.W-র মতে 'শ্যামা' অর্থ বিশেষ লক্ষণযুক্তা নারী — (১) যার দেহে ঋতুলক্ষণ প্রকট (২) যার সন্তান হয়নি (৩) ক্ষীণাঙ্গী। মনে হয় তপ্তকাঞ্চনবর্ণা আর নিঃসন্তান এই দুটি অর্থ গ্রহণ করলে প্রসঙ্গের পক্ষে সবচেয়ে সংগত হয়। (তারুণ্য ও তন্বিতার উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে আছে।) সূক্ষ্মাগ্রদন্তিনী ('শিখরিদশনা') নারী মল্লিনাথের মতে ভাগ্যবতী, তার পতি দীর্ঘায়ু লাভ করে। মতান্তরে, দাড়িম্ববীজের ন্যায় দশনযুক্তা। মল্লি 'সামুদ্রিক' উদ্ধৃত করেছেন : 'যে-নারীর দশন স্নিগ্ধ, সমান সুপঙক্তিক, শিখরিতুল্য ও শ্লিষ্ট, তার চরণে সর্বজগৎ লুণ্ঠিত হয়।' M.W-র অর্থ, 'আরব্য যূথীকোরকের তুল্য দাঁত যার'। Rooke বলেন, 'শিখরি'=oval। বাল্মীকির সীতার দাঁতও শিখরিতুল্য (টীকার শেষাংশ দ্র)। 'অধরোষ্ঠ'=নিচের ঠোঁট। বিম্ব : তেলাকুচো ফল, পাকলে টুকটুকে লাল হয়, আকারেও অনেকটা ঠোঁটের মতো। নিম্ননাভি : মল্লিনাথ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, নাভি গভীর হ'লে কামের তীব্রতা ('মদনাতিরেক') বোঝায়। যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা, 'স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্' এটি কালিদাসের একটি প্রিয়তম বর্ণনা ; 'কুমার' : ৩ : ৫৪-তে উমার বিশেষণ 'আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাম্' 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা' ; একই কাব্যে (৩ : ৩৯) লতাবধূর 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবক'রূপ স্তন কল্পনা করা হয়েছে, এবং 'রঘু : ১৩ : ৩২-এ রাম তন্বী ও স্তনস্তবকে অবনম্রা লতিকাকে সীতাভ্রমে আলিঙ্গনে উদ্যত। এই সবেরই আদি উৎস বাল্মীকি ; কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের শরৎবর্ণনায় 'পুষ্পাগ্রভারাবনতাগ্রশাখৈঃ' পাওয়া যায়—'প্রচুর পুষ্পভারে প্রিয়ক তরুর শাখাগ্র অবনত, তাতে বন যেন আলোকিত হয়েছে' (অনু : রা-ব)।

'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা'—পদ্মিনী নারীর চোখের কোনা লাল হয় আর দৃষ্টি চকিতমৃগসদৃশ। নারীর শ্রেণীবিভাগে পদ্মিনীর স্থান সর্বোচ্চে, এবং এই শ্লোকে নারীসৌন্দর্যের যে-আদর্শ বিধৃত হয়েছে, অজন্তার মারকন্যার সঙ্গে তার সাদৃশ সুস্পষ্ট (চিত্র ৪ দ্র)।

প্রথম যুবতীর প্রতিমা : মল্লির মন্তব্য — শিল্পীদের প্রথম রচনায় প্রযত্নের আধিক্যবশত প্রায়ই নির্মাণসৌষ্ঠব লক্ষিত হয় ; এই প্রপঞ্চে যক্ষপ্রিয়ার তুলনীয় রমণীবস্তু আর কোথাও নেই, এই হ'লো কবির বক্তব্য (প্রথম = শ্রেষ্ঠ)। বলা বাহুল্য, এ-বিষয়ে শিল্পীরাই অনেকে উল্টো কথা ব'লে থাকেন ; প্রথম চেষ্টায় ত্রুটি থাকে, পরবর্তী রচনা প্রকৃষ্ট হয়, এমন মত বহুবার শোনা গেছে। যুবতী বিষয়ে রবার্ট বার্নস :

> Auld Nature swears, the lovely dears
> Her noblest work she classes, O ;
> Her 'prentice han' she tried on man,
> An' then she made the lasses, O.

এবং ঈভার প্রতি মিল্টন : 'O fairest of creation, last and best / Of all God's works'।

অবশ্য ইহুদিপুরাণ অনুসারে নারী আক্ষরিক অর্থেই বিধাতার শেষ সৃষ্টি, এবং এই চিন্তা ভারতীয় সাহিত্যেও পাওয়া। অশোকবনে সীতাসমীপে উপস্থিত হ'য়ে রাবণ বলছেন :

> ত্বাং কৃত্বোপরতো মন্যে রূপকর্তা স বিশ্বকৃৎ।
> ন হি রূপোপমা হ্যন্যা তবাস্তি শুভদর্শনে ॥ (বা-রাম : সুন্দর ২০ : ১৩)

—'হে শুভদর্শনা আমার মনে হয় রূপকর্তা বিশ্বনির্মাতা তোমাকে সৃষ্টি ক'রেই নিবৃত্ত হয়েছেন, তাই তোমার রূপের আর উপমা নেই' (অনু : রা-ব)। কিন্তু কালিদাসের পক্ষপাত 'প্রথম সৃষ্টি'র দিকে ; 'রঘু' ৬ : ৩৭-এ ইন্দুমতীর প্রসঙ্গেও তা বোঝা যায়।

দণ্ডকারণ্যে, সীতাকে প্রথম দেখার পর রাবণের উক্তি এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য :

> সমাঃ শিখরিণাঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডুরা দশনাস্তব।
> বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে ॥
> বিশালং জঘনং পীনমূরূ করিকরোপমৌ।
> এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ সম্প্রগল্ভিতৌ ॥

পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ।
মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তৌ পয়োধরৌ॥ (অরণ্য : ৪৬ : ১৮-২০)

—'তোমার দশনরাজি সমান সুগঠিত চিক্কণ ও শুভ্র। নেত্র নির্মল ও আয়ত, অপাঙ্গ রক্তাভ, তারকা কৃষ্ণবর্ণ। নিতম্ব বিশাল ও স্থূল, উরুদ্বয় হস্তিশুণ্ডের ন্যায়। তোমার ওই উচ্চ বর্তুলদৃঢ় ও লোভজনক স্তনযুগল উত্তম মণিময় আভরণে ভূষিত। তাদের মুখ পীনোন্নত, গঠন স্নিগ্ধ তালফলের তুল্য সুন্দর' (অনু : রা-ব)।

ঔকারের আধিক্যবশত (এবং তিন চরণের মধ্যে দু-বার 'পীন' শব্দের ব্যবহারের জন্য) বাল্মীকির রচনা শ্রুতিমোহন হয়নি, কিন্তু এতে নারীবর্ণনার কয়েকটি মূলসূত্র বিধৃত হয়েছে, এবং এর প্রত্যক্ষতার গুণে আমরা একে 'তন্বী শ্যামা'র তুলনা ও প্রতিতুলনারূপে দাঁড় করাতে পারি। স্নিগ্ধ তালফলের সঙ্গে স্তনের তুলনায় (সীতার তপ্তকাঞ্চনের মতো গাত্রবর্ণ সত্ত্বেও) যে-প্রথামুক্ত প্রাণধর্মিতার স্বাদ আছে, তা কালিদাসের অনেক উপমাতেই পাওয়া যায় না।

শ্লোক ৮৩

চক্রবাকী : হংসশ্রেণীভুক্ত, ইংরেজীতে Brahmany duck বা ruddy goose। চক্রবাক-দম্পতি (চখাচখী), ইংলণ্ডে turtle-dove-এর মতো, ভারতে দাম্পত্যপ্রেমের নিদর্শন; প্রবাদ, তারা সারাদিন একত্রে থাকে, কিন্তু কোনো-এক মুনির শাপে নৈশ বিচ্ছেদ ভোগ করে, নদীর দুই তীরে পরস্পরকে আহ্বান ক'রে রাত কাটায়। দিনের বেলায় অনেকে তাদের একত্রে দেখেছেন, কিন্তু তাদের নৈশ বিচ্ছেদের প্রবাদ কত দূর সত্য বলা যায় না। রাত্রিকালে তাদের অবিরাম কণ্ঠস্বর বহু পক্ষীতত্ত্ববিদ শুনেছেন, কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞের মতে দম্পতিকে দিনে ও রাত্রে নদীর একই তীরে একভাবে দেখা যায়। লাহা বলেন, এরাও কতিপয়দিনস্থায়ী, কিন্তু বর্ষায় দ্রষ্টব্য নয়, কেননা এরা বসন্তকালেই তিব্বত অঞ্চলে চ'লে যায়। বিরহিণী সীতাকে বাল্মীকিও বলেছেন, 'হিমাহত নলিনী' ও 'সহচররহিত চক্রবাকী'র মতো।

অন্যরূপা : পূর্বশ্লোকে যক্ষপ্রিয়ার যে-স্বাভাবিক রূপ বর্ণিত হয়েছে বর্তমানে তা বিরহশোকে মলিন। (পূর্ববর্ণনা অনুসারে মেঘ যেন তাকে অন্য কেউ ব'লে ভুল না করে।)

দ্বিতীয় প্রাণ : রামায়ণে আছে, লক্ষ্মণ রামের 'বহিঃপ্রাণ' তুল্য (বাল : ১৮ : ৩০) আবার অযোধ্যাকাণ্ডে ৪ : ৪৩-এ রাম নিজের মুখে লক্ষ্মণকে বললেন, 'তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা'। এই ঋণকে মহিমান্বিত ক'রে কালিদাস চিরকালের হাতে দিয়ে গেছেন। এ-রকম আবেগসঞ্চারী বাক্যাংশ কালিদাসে — এবং সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে — বিরল। 'প্রাণাধিক'-এর চাইতে 'দ্বিতীয় প্রাণ' বেশি বাস্তব ব'লেই বেশি মর্মস্পর্শী।

শ্লোক ৮৭

ন্যস্ত কর আর স্রস্ত কেশদামে : গালে হাত রেখেছে, রুক্ষ চুল লুণ্ঠিত, তাই সম্পূর্ণ মুখ দেখা যায় না। যক্ষ নানাভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে তার পত্নীর স্বাভাবিক রূপের সঙ্গে বর্তমান রূপ কিছুই মেলে না।

পীড়িত ইন্দুর দৈন্য : বা-রাম-এ রাক্ষসীবেষ্টিত সীতা 'মেঘরেখাপরিবৃত চন্দ্ররেখার মতো নিষ্প্রভ'।

শ্লোক ৮৮

পূজায় মনোযোগী, 'বলিব্যাকুলা' : পতির প্রত্যাগমনের উদ্দেশে যক্ষপ্রিয়া প্রত্যহ পূজা করে ; Wilson-এর মতে এই পূজার নাম কাকবলি, এটি বর্ষাগমে বিরহিণীদের কৃত্য।

সারিকা (সারী, শারী) কী পাখি? লাহার মতে পাহাড়ি ময়না (শালিখ নয়), ইংরেজিতে grackle, এরা কথা বলায় ওস্তাদ। [কিন্তু Shorter OED অনুসারে grackle এক বর্গের নাম, jackdaw ও crowblackbird যার অন্তর্ভূত। এদের বাচনশক্তি বিষয়ে ইংরেজি অভিধান নীরব, কিন্তু Webster অনুসারে 'grackle' শব্দ সেই পাখির ডাকেরই অনুকরণ।] শুক — টিয়া, জাতিতে স্বতন্ত্র, এ-দুয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ লোকপ্রবাদ মাত্র। সংস্কৃতে 'সারিকা' বলতে শালিখও বোঝায়।

আঁকছে প্রতিকৃতি : চিত্রদর্শন বিরহিণীর অন্যতম বিনোদ। যক্ষও চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করে (উ ১০৮)।

রসিকা : বাঙালি পাঠকের মনে হ'তে পারে সারিকা মানুষের কথার নকল করে ব'লেই এই বিশেষণ ; কিন্তু 'রসিক' শব্দের ব্যঞ্জনিপুণ বা পরিহাসপ্রিয় অর্থ সংস্কৃতে নেই ; 'রসিকা'র প্রথম অর্থ M. W. দিয়েছেন

'আবেগপ্রবণ স্ত্রী'। যক্ষপত্নী বোধহয় বলতে চায়, 'তুমি তো আবেগপ্রবণ, তাঁকে কি তোমার মনে পড়ে না?' এই পঙক্তিতে যক্ষ (ও তার পত্নী) আরো একবার আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে।

শ্লোক ৮৯

মলিন বেশবাসে : কৃশতা ও মালিন্য প্রোষিতভর্তৃকার লক্ষণ (তু পৃ৩০)। অশোকবনে সীতাও 'উপবাসে কৃশ'। আমার নাম দিয়ে রচিত ই : মূলের 'গোত্র'—নাম (মল্লি), Wilson-এর মতে clan।

মূলের 'উদ্‌গাতুকামা'—উচ্চস্বরে গাইতে অভিলাষিণী। উ৭৪-এও এই ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে ('উদ্‌গারদৃভি'); মানবেরা ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রামে গান করে, দেবযোনিরা স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে গান্ধারে।

শ্লোক ৯০

দেহলি : চৌকাঠ বা দাওয়া। 'সম্ভবত যক্ষপত্নী গৃহদ্বারের কাছে কোনও পীঠের উপর প্রত্যহ একটি ক'রে ফুল রাখত আর মাঝে-মাঝে তা নামিয়ে গুনে দেখত ৩৬৫ দিন পূরণের কত বাকি' (রা-ব)

কল্পনায় যার জন্ম, 'হৃদয়নিহিতারম্ভম্' : মল্লির ব্যাখ্যা — যে-মিলনের উপক্রম হৃদয়ে সংকল্পিত (কল্পিত) হয়েছে। এতে পতিবিষয়ক (চুম্বনাদি ব্যাপার) মনোরথ (আশা, অভিলাষ) প্রকাশ পাচ্ছে; এই অবস্থার নাম সংকল্প, এটি প্রণয়ের তৃতীয় দশা।

বিনোদ : যার দ্বারা বিনোদন হয়, অবসরযাপনের উপায়। আধুনিক বাংলায় শব্দটির এই অর্থ প্রচলিত হ'লে কবিরা লাভবান হবেন।

শ্লোক ৯১

ভূতলশয্যায় : 'নিয়মার্থং স্থণ্ডিলশায়িনীম্' (স্থণ্ডিল—অনাবৃত ভূমি); বিরহ কালে প্রতিব্রতার ভূমিশয়নের নিয়ম ছিলো (মল্লি)।

মহৎ সুখ দিয়ো : "রত্নাকরে' আছে : বিরহিণীর পক্ষে সখা, ধাত্রী, পিতামাতা, মিত্র, দূত ও শুকাদি প্রীতিকর, কেননা এরা ইষ্ট (পতি) বিষয়ে কথা বলতে পারে। মেঘ বার্তাবহ দূত, যক্ষপ্রিয়াকে মহৎ সুখ দেবে। (মেঘ এখনো যক্ষপত্নীকে দেখতে পায়নি)

শ্লোক ৯২

বিরহশয্যায় : বিরহশয়ন পল্লবাদির দ্বারা রচিত হয় (মল্লি)। যক্ষপত্নী শূন্য ভূমিতে না পত্রশয্যায় শুয়েছে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কবিতার পক্ষে তাতে এসে যায় না।

কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের শেষ কলা : 'বা-রাম-এ হনুমান অশোকবনে সীতাকে দেখলেন, যেন শুক্লপক্ষের চন্দ্ররেখার মতো অমলা।' কিন্তু কালিদাসে পাচ্ছি কৃষ্ণপক্ষ ; শব্দটি মূলে নেই, কিন্তু 'প্রাচীমূলে কলামাত্রশেষাং'-এ তা স্পষ্ট সূচিত হচ্ছে। শুক্লপক্ষের চন্দ্ররেখা পশ্চিম আকাশে দৃষ্ট হয়, আর কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ পূর্বাকাশে ('প্রাচীমূলে')। চাঁদের কলামাত্র অবশিষ্ট থাকে অমাবস্যার পূর্বরাত্রিতে ; সেই তিথির রাত্রিশেষে পূর্বাকাশে অতি ক্ষীণ চাঁদের রেখাটি দেখার মতো সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা জানেন ও-রকম একটি করুণ ও সুন্দর দৃশ্য মানবগোচর প্রকৃতিতে আর নেই। এখানে বাল্মীকির তুলনায় কালিদাসের উপমাটি প্রসঙ্গের পক্ষে সার্থকতর ; কেননা শুক্লপক্ষে ক্ষীণ চাঁদও উজ্জ্বল, আমরা তা দেখে সুখ অনুভব করি, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লানিমা আমাদের মনে বিষাদের সঞ্চার করে।

শ্লোক ৯৩

মেঘলা দিনে যেন মলিন কমলিনী : উ ৮৬, 'তুহিনমন্থনে যেমন পদ্মিনী' তু। উ৮৫-এ যক্ষপ্রিয়ার স্বাভাবিক রূপ বর্ণিত হয়েছে, তার অব্যবহিত পরেই বলার প্রয়োজন ছিলো যে তার বর্তমান রূপ অন্য প্রকার ; শীতাহত পদ্মের মতো তারও এখন প্রাকৃত শ্রী অবলুপ্ত। কিন্তু শীতের পদ্ম মুমূর্ষু ; যক্ষপ্রিয়ার তবু আশা আছে (পৃ১০), তাই কবি আবার পদ্মের উপমাই অন্য ভাবে ব্যবহার করলেন ; 'জেগেও নেই, ঘুমিয়েও নেই' এই মন্তব্যে অবসাদ আর নবজীবনের সম্ভাবনা যুগপৎ বোঝা গেলো। মেঘ কেটে গেলে পদ্ম জেগে উঠবে, তেমনি যক্ষ ফিরে এলে, বা মেঘের বাণী শুনে, যক্ষপ্রিয়ার পুনরুজ্জীবন হবে।

মল্লির মতে এখানে প্রণয়ের ষষ্ঠ দশা (বিষয়দ্বেষ বা অবসাদ) সূচিত হচ্ছে

শ্লোক ৯৪

শুদ্ধস্নান : প্রসাধনহীন স্নান।

উ৯০-এ যে-মিলন সম্পূর্ণ কাল্পনিক, এখানে তাকে স্বপ্নের আকারে

উপলব্ধি করার চেষ্টা দেখা যায়। স্বপ্ন অলীক হ'লেও বাস্তবসদৃশ, আর সাক্ষাৎ সম্ভোগ যখন অসম্ভব তখন বাস্তবসদৃশ স্বপ্নই কাম্য। এখানে যক্ষপ্রিয়ার রোদনে লজ্জাত্যাগ সূচিত হচ্ছে, মল্লির এই মত আমরা মানতে পারি না।

উ৮৫-৯৬, এই বারো শ্লোক যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা, পরের পাঁচটিকেও প্রকারান্তরে তা-ই বলা যেতে পারে। 'মেঘদূতে' অন্য কোনো একটি প্রসঙ্গের জন্য এতগুলো শ্লোকের ব্যবহার হয়নি।

শ্লোক ৯৫

পরশে কর্কশ : স্পর্শে ক্লেশকর ; তৈলাদির অভাবে বেণী এত রুক্ষ যে স্পর্শ করলে আঘাত লাগে।

'কামসূত্রে' পুরুষ ও নারীর বাঁ হাতে দীর্ঘ ও রঞ্জিত নখ রাখার নির্দেশ আছে ; ডান হাত আহার ও অন্যান্য কর্মে ব্যবহৃত হয় ব'লে তাতে নখ রাখা বারণ। ধ'রে নিতে হবে, যক্ষপ্রিয়া ডান হাতে কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছে (বিরহাবস্থা বোঝাবার জন্য ডান হাতেরও নখ কাটছে না)। (টী উ৯৯ দ্র)।

মল্লির মতে এখানে প্রণয়ের অষ্টম দশা (উন্মাদ বা চিত্তবিভ্রম) সূচিত হচ্ছে (বার-বার চুল সরিয়ে দিচ্ছে ব'লে), কিন্তু আমরা সে-রকম কোনো লক্ষণ দেখতে অক্ষম।

শ্লোক ৯৬

উ৮৬-এ যে-বিরহাবস্থার বর্ণনা শুরু হয়েছে, এই শ্লোকে তার চরম পরিণতি। মল্লিনাথ প্রণয়ের দশ অবস্থার উল্লেখ করেছেন : চক্ষুপ্রীতি মনঃপ্রীতি সঙ্গ-সংকল্প অনিদ্রা কৃশতা অবসাদ হ্রীত্যাগ উন্মাদ মূর্ছা ও মৃত্যু। যক্ষপ্রিয়া নবম দশায় পৌঁচেছে, এখন মেঘ যক্ষের বার্তা জানিয়ে শীঘ্র তার প্রাণরক্ষা করুক।

সংস্কৃত সমালোচনা (সংস্কৃত কবিতার মতোই) কিছুটা আক্ষরিক পথে চলতো : এই অংশে প্রণয়ের প্রথম দশার (চক্ষুঃপ্রীতি) উল্লেখ নেই, মল্লিনাথ তা লক্ষ করতে ভোলেননি, এবং কবির এই অবহেলার সমর্থনে দীর্ঘায়িত যুক্তিও দিয়েছেন। নায়ক-নায়িকা (সম্ভবত বহুকাল ধ'রে) বিবাহিত, অতএব চক্ষুঃপ্রীতির অবস্থা তারা পেরিয়ে গেছে। অবশিষ্ট আট দশা পর্যায়ক্রমে

বর্ণিত হয়েছে কিনা, সে-বিষয়েও আমরা সন্দিহান ; কিন্তু যদি কিছু ব্যতিক্রম ঘ'টে থাকে, আমরা তাতে আপত্তি করবো না।

ভূষণবর্জিত পেলব তনু : আমরা ভাবছি যক্ষপ্রিয়া মনের দুঃখে ভূষণত্যাগ করেছে — কিন্তু না, মল্লিনাথ এখানেও আমাদের মোহভঙ্গ না-ক'রে ছাড়েননি, তাঁর মতে ভূষণত্যাগের হেতু কৃশতা (পৃঃ দ্র)।

অন্তরাত্মায় আর্দ্র' : 'আর্দ্র' শব্দের দুই অর্থ : কোমল ও সিক্ত।

যক্ষপ্রিয়া একবার উঠছে একবার বসছে, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না — এই অত্যন্ত অশক্তির (অক্ষমতা) দ্বারা, মল্লির মতে, প্রণয়ের নবম দশা (মূর্ছা) সূচিত হচ্ছে। যক্ষপত্নীর এই ব্যবহারে আতিশয্য প্রকাশ পাচ্ছে সন্দেহ নেই — সে যখন গালে হাত দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে তখনই তাকে বেশি ভালো লাগে আমাদের — কিন্তু অবস্থাবিশেষে এ-রকম অধৈর্য স্বাভাবিক, তাকে নবম বা দশম দশা বললে বেশি কিছু বলা হয় না।

শ্লোক ৯৭

'ভাগ্যবান আমি', তা ভেবে, 'সুভগম্মন্যভাবঃ' : নিজেকে যে সুভগ বা ললনাপ্রিয় ব'লে ভাবে ('সুভগ' শব্দের এক অর্থ ললনাপ্রিয়)। 'আমি জাঁক ক'রে এ-সব কথা বলেছি তা ভেবো না, আমার বর্ণিত কার্শ্যাদি লক্ষণসমন্বিত আমার প্রিয়াকে অচিরেই প্রত্যক্ষ করবে।'

'মেঘদূতে' কালের দুই স্তর বিষয়ে মাঝে-মাঝে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন ; যক্ষের এবং আমাদের কল্পনায় মেঘ যক্ষভবনে উপনীত হয়েছে, কিন্তু এখনো যক্ষপত্নীকে দ্যাখেনি ; আবার, মেঘ আসলে এখনো রামগিরিতেই অপেক্ষা করছে, যক্ষের উক্তি শেষ হ'লে যাত্রা করবে। দুই অর্থেই 'অচিরে' হ'তে পারে।

শ্লোক ৯৮

উ৮৭ দ্র : 'রুক্ষ কর আর স্রস্ত কেশদামে স্বল্প-প্রকাশিত প্রিয়ার মুখ'। বিরহিণী চুলে তেল দেয় না, গালে হাত দিয়ে ভাবে, তাই তার মুখ অংশত আচ্ছাদিত। লুটিয়ে-পড়া চুলের জন্য তার চোখের প্রসার অবরুদ্ধ, অর্থাৎ সে আড়চোখে তাকাতে পারে না। কাজল পরে না, সুরাপান করে না, তাই চোখের জ্যোতি ম্লান হয়েছে। এই অবস্থায়, মেঘ আসন্ন হ'লে তার চোখ

হঠাৎ স্পন্দিত হবে। অন্তত এই একস্থলে, যেন নিজেরই অজান্তে, কালিদাস স্বীকার করেছেন যে প্রসাধনহীন অবস্থাতেও সৌন্দর্য সম্ভব। 'মীনাহত পদ্মের মতো স্পন্দিত চোখ' এই উপমা বাল্মীকিতেও আছে।

স্নিগ্ধকজ্জলশূন্য, 'অঞ্জনস্নেহশূন্যম্' : কাজলের সঙ্গে ঘৃতাদি দ্রব্য মিশিয়ে তাকে 'স্নিগ্ধ' করা হ'তো।

এমন বাম আঁখি : 'বাম' শব্দ মূলে নেই, কিন্তু মল্লি বলেন বাম চোখই অভিপ্রেত, পরের শ্লোকে বাম উরুর উল্লেখেও তা বোঝা যায়। দানে, দেব-পূজায়, স্পন্দনে ও অলংকরণে পুরুষের দক্ষিণ ও নারীর বাম দিক প্রশস্ত। নারীর বাম অঙ্গের স্পন্দন মঙ্গলসূচক ; এখানে কোনো প্রকট ভঙ্গির পরিবর্তে শুধু যে বাম চোখ ও উরু স্পন্দিত হ'লো, তাতে এই বিষাদ প্রতিমার ছবিটি আরো স্পষ্ট হ'লো আমাদের মনে।

ঊর্ধ্বকম্পনে : 'নিমিত্তনিদানে' আছে — শিরস্পন্দনে রাজছত্রলাভ, ললাট-স্পন্দনে উষ্ণীষলাভ, ভ্রূস্পন্দনে শুভলাভ, নয়নের উপরিভাগের স্পন্দনে ইষ্টলাভ ও অপাঙ্গস্পন্দনে ইষ্টহানি সূচিত হয়। যক্ষপ্রিয়া অচিরে দয়িতের বার্তা শুনবে, তাই এ-সব শুভলক্ষণ। অশোকবনে হনুমান আসার প্রাক্কালে সীতার 'বাম নেত্র স্ফুরিত, বাম বাহু রোমাঞ্চিত ও বাম উরু স্পন্দিত' হ'লো (বা-রাম, রা-ব, সুন্দর : ৬)। কিন্তু চোখের উপরিস্পন্দনরূপ সুন্দর চিত্রের পিছনেও কোনো প্রচল ছিলো, তা ভাবতে আমরা মনঃপীড়া অনুভব করি। (বাম ও দক্ষিণ বিষয়ে টী পূ৯ দ্র।)

সুরার পরিহারে : অশোকবনে সীতার সাক্ষাৎ পেয়ে হনুমান তাঁকে বলছেন : 'তোমার অদর্শনে রাম শোকমগ্ন হয়ে আছেন, তিনি মাংস খান না, মদ্য পান করেন না, কেবল বিহিত বন্য ফলমূল খান।' (সুন্দর : ৩৬ : ৪১, অনু : রা-ব।) সুরাত্যাগ বিরহী ও বিরহিণীদের প্রথাসিদ্ধ কৃত্য কিনা সে-বিষয়ে, সুখের বিষয়, মল্লিনাথ কিছু বলেননি।

মদ্য বিষয়ে টী উ৬৯ দ্র। স্বল্প সুরাপানে চোখের দীপ্তি ও বিলাস বর্ধিত হয়, এ-বিষয়ে সংস্কৃত কবিরা অবহিত ছিলেন।

মেঘ এই শ্লোকে যক্ষপত্নীকে দেখতে পেলো।

শ্লোক ৯৯

মং : 'কররুহ' (তু মহীরুহ) : করজ, যা হাতে জন্মায়। 'কররুহপদ'

—নখচিহ্ন। ভারতীয় রতিশাস্ত্রে নখক্ষতের স্থান খুব উচ্চে; কাব্যে তা নিয়ে বিস্তর বাড়াবাড়ি ঘ'টে থাকলেও ব্যাপারটাকে নিছক কবিপ্রসিদ্ধি ব'লে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সেকালে উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নারীর বাঁ হাতে লম্বা নখ রাখার প্রথা ছিলো। (টী উ৯৫ দ্র) আধুনিক ফ্যাশানবতীরাও ত্রিকোণ ও রঞ্জিত নখ রাখেন — তাতে এই নিঃশব্দ ঘোষণাও থাকে যে তাঁদের কায়িক শ্রম করতে হয় না। কালিদাসের হাতে এই প্রসঙ্গের আশ্চর্য ব্যবহারের জন্য পৃ৩৬ দ্র।

মুক্তাজাল: মুক্তার মেখলা, কাঞ্চী বা রশনা, কটির ভূষণ, এর ঝালর উরু স্পর্শ করতো। (চিত্র ২, ১৫ ও ১৬ দ্র) আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নারীর বেল্টের মতো, মেখলাও বসনের উপরিভাগে ধারণ করা হ'তো; প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যে এই ভূষণ সর্বদাই দেখা যায়; পৃ২৯ ও ৩৬-এ এর উল্লেখ ভোলবার নয়।

মল্লিনাথের অতিসূক্ষ্মতায় কখনো-কখনো ক্ষিপ্ত হ'তে হয়: তিনি প্রথমে 'রতিরহস্য' উদ্ধৃত করেছেন: 'উদর স্তন পার্শ্ব বাহু বক্ষ শ্রোণী ও উরু — এই ক-টি নখক্ষতের স্থান,' তারপর বলছেন যক্ষপ্রিয়ার উরুতে বর্তমানে আর নখক্ষতজনিত দাহ নেই, তাই শীতলস্পর্শ মুক্তাজাল ধারণ করা নিরর্থক। কিন্তু মুক্তাজাল বসনের উপর ধারণ করা হ'তো, অতএব তার স্পর্শের কথাটা জরুরি নয়। উপরন্তু, যক্ষপ্রিয়ার ভূষণত্যাগের কারণ বিরহব্যথা নয়, এ-কথা ভেবে আমরা মনঃক্ষুণ্ণ হই। তার চোখ কটাক্ষ ভুলেছে, তাও দুঃখে নয়, সুরার অভাবে।

সংবাহন: মর্দন, massage। উ৮১ স্মর্তব্য: যক্ষ পত্নীর বাম পদ আকা করে, অর্থাৎ পা টিপে দিতে চায়। সম্ভোগের পরেও সে তা-ই ক'রে থাকে। বাৎস্যায়নে সংবাহনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তা উভয়পক্ষেরই কৃত্য, আর তার কোনো সময়ও নির্দিষ্ট নেই। সম্ভোগান্তিক পদসংবাহন যক্ষের ব্যক্তিগত অভ্যাস, বা তার কোনো ঐতিহ্য আছে, সে-বিষয়ে মল্লিনাথ কোনো মন্তব্য করেননি।

বাম উরু: যদি কোনো পাঠক হঠাৎ প্রশ্ন করেন, 'উরু কেন?' 'নিমিত্ত-নিদান' তারও উত্তর নিয়ে তৈরি। 'এক উরুর স্পন্দনে রতিপ্রাপ্তি' উভয় উরুর স্পন্দনে চারুবসনপ্রাপ্তি সূচিত হয়।' যক্ষপ্রিয়ার শুধু বাম উরু স্পন্দিত হচ্ছে।

শ্লোক ১০০

প্রহরকাল : এক যাম বা তিন ঘণ্টা। 'রতিসর্বস্বে'র উল্লেখ ক'রে মল্লি বলছেন, সমর্থ ও তরুণ দম্পতির মিলন প্রহরকাল স্থায়ী হ'তে পারে, স্বপ্নেও তা-ই হবে, মেঘ যেন হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে যক্ষপ্রিয়াকে বঞ্চিত না করে! কিন্তু এই ব্যাখ্যা আমাদের কাছে অগ্রাহ্য, কেননা কোনো স্বপ্নরমণ তিন ঘণ্টা স্থায়ী হ'তে পারে না (কোনো-কোনো মনোবিজ্ঞানীর মতে একটি স্বপ্নের দীর্ঘতম স্থায়িত্বকাল তিন সেকেণ্ডের বেশি নয়)। বরং এ-কথা ভাবা সংগত মনে হয় যে মেঘ রাত্রির শেষ যামে বিরহিণীর বাতায়নে উপস্থিত হবে, এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত (ঘুম ভাঙার স্বাভাবিক সময় পর্যন্ত) নিঃশব্দে অপেক্ষা করবে। (উ৯৪-এ যক্ষপ্রিয়া স্বপ্নমিলনের চেষ্টা করছে, এখানে হয়তো বা সে-চেষ্টা সফল হ'তে পারে।)

শ্লোক ১০১

বাতাসে মানিনীরে জাগিয়ে : মল্লির মতে 'মানিনী'—মনস্বিনী, অনুচিত বিষয়ে বা কার্যে অসহিষ্ণু। (আকস্মিক বা রূঢ় নিদ্রাভঙ্গে সে কুপিত হ'তে পারে।) অভিমানিনী অর্থগ্রহণেও বাধা নেই। বাতাসে : এটা যক্ষপ্রিয়ার প্রভুত্বের ব্যঞ্জনা। মল্লি ভোজরাজের উক্তি তুলে দিয়েছেন : 'পায়ে মৃদুমর্দন, বুকে শীতল ব্যজন, বা মধুর গীতধ্বনি — এই হ'লো প্রভুস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘুম ভাঙাবার উপায়।'

মালতী : অভিধানের প্রথম অর্থে যূথীজাতীয় সান্ধ্য ফুল বোঝায়, কিন্তু মল্লিনাথ অর্থ দিয়েছেন জাতী, যা nutmeg (জায়ফল)-এর সমার্থক হ'তে পারে। 'প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম,' — এই পঙক্তির দুই অর্থ সম্ভব : 'জেগে উঠলে প্রিয়াকে মালতীমুকুলের মতো প্রফুল্ল দেখাবে', বা 'মালতীকোরক যখন ফুটবে প্রিয়াও তখন জেগে উঠবে'। এখন মালতী যদি যূথী হয়, তাহ'লে ধ'রে নিতে হয় যক্ষপত্নী অপরাহ্নে ঘুমিয়ে সন্ধ্যার মেঘের ব্যজনে জাগরিত হ'লো; এই প্রস্তাব মেনে নেবার বাধা আছে, কেননা যক্ষপ্রিয়া নানা কাজে দিন কাটায় আর রাত্রে ঘুমের চেষ্টা করে (উ৯৬ দ্র)। তাছাড়া সুসংবাদ দেবার পক্ষে প্রাতঃকালই প্রশস্ত এবং রাত্রি-শেষে আগত ও অপেক্ষমাণ মেঘের চিত্রই অধিক চিত্তগ্রাহী। আমার ধারণা, মালতীকে কোনো প্রাতঃকালীন ফুলের নামান্তর ব'লে ধরলেই ভাবের দিক

থেকে সংগত হয়। রা-ব আমাকে জানিয়েছেন, মালতী — জাতী, 'সন্ধ্যায় ফোটে, সকালে শীর্ণ হয়। কিন্তু মুকুল সকালেও তাজা থাকে।'

লুকোবে বিদ্যুৎ: 'মেঘ তার প্রিয়া বিদ্যুৎকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, কিন্তু স্ফুরণ ক'রে ভয় দেখাবে না' (রা-ব); কিন্তু মল্লি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যা করছেন: বিদ্যুৎ স্ফুরিত হ'লে যক্ষপ্রিয়ার দৃষ্টি প্রতিহত হবে, সে বক্তার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাবে না।

দেখবে অনিমেষে, 'স্তিমিতনয়না'। 'স্তিমিত' — নিশ্চল, অনিমেষ (পৃ৩৭ দ্র)।

ধীরে-ধীরে, 'ধীর:' : মল্লির অর্থ, মেঘ দৃঢ় ও স্পষ্ট উচ্চারণে বলবে, যাতে কোনো কথা স্খলিত না হয়, মানিনী সব শুনতে পায়। যাতে সে ত্রস্ত না হয় এই অর্থও হ'তে পারে — সুন্দরকাণ্ডে সীতার সমক্ষে হনুমানের ভাষণও ছিলো ধীরমধুর।

শ্লোক ১০২

এখানে যক্ষের বার্তা আরম্ভ হ'লো। মেঘ প্রথমেই 'অবিধবা' সম্বোধন ক'রে জানিয়ে দেবে, যক্ষ এখনো বেঁচে আছে।

স্নিগ্ধগম্ভীর স্বননে প্রবাসীর ই: মল্লির মন্তব্য — মেঘ বলতে চায় সে শুধু বার্তাবহ নয়, ঘটক; তার সাহায্যে বিচ্ছিন্ন পতিপত্নীর মিলন ঘটে। এবং সে যখন পথিকেরও সহায়ক, তখন বন্ধুর (যক্ষের) পক্ষে অধিকতর উপকারী হবে তাতে আর সন্দেহ কী।

শ্লোক ১০৩

মেঘের মুখে যক্ষের বার্তা আরম্ভ ক'রেই কালিদাস একটি শ্লোকের বিরতি দিয়েছেন, এতে তাঁর নাটকীয় বোধের পরিচয় পাই। আর-একবার (এবং শেষবার) যক্ষপ্রিয়াকে আমরা দেখলাম। পূর্বে জেনেছি সে অনিমেষ নয়নে মেঘকে দেখছে, এখন সে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে উন্মুখ হ'য়ে তার কথা শুনছে — এখানেই তার কাছে আমাদের বিদায় নিতে হ'লো। কাব্যের পূর্ণতার দিক থেকে এই শ্লোকটির প্রয়োজন ছিলো। এর পর নয়টি শ্লোক (১০৫-১১৩) যক্ষের নিজের ক্লিষ্ট অবস্থার বর্ণনা — আমরা আবার রামগিরিতে ফিরে যাচ্ছি।

যেমন মৈথিলী পবননন্দনে : মল্লিনাথের সাহায্য না-পেলেও আমাদের বুঝতে দেরি হ'তো না যে এই উল্লেখের দ্বারা কাব্যের প্রথম শ্লোক আমাদের মনে করিয়ে দেয়াই কবির উদ্দেশ্য। প্রারম্ভেই সীতার স্মৃতিকে আহ্বান ক'রে তিনি কাব্যের সুর বেঁধেছিলেন ; সমাপ্তি যত কাছে আসে তত স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারি সেই স্মৃতি সমগ্র 'মেঘদূতে'র পক্ষে কত সংকেতময়। 'সীতা ও হনুমানের উল্লেখে যক্ষপ্রিয়ার পাতিব্রত্য ও মেঘের দৌত্য ব্যঞ্জিত হচ্ছে।' (মল্লি)

'রসাকরে' আছে, নারীর কাছে প্রেরণীয় দূত ব্রহ্মচারী, বলবান, ধীর, মায়াবী, মানবর্জিত, ধীমান, উদার ও নিঃশঙ্ক বক্তা হবে। পূর্বমেঘে নদীসমূহের সঙ্গে মেঘের ব্যবহার থেকে তার ব্রহ্মচর্যের কোনো পরিচয় পাই না, উপরন্তু পত্নী বিদ্যুৎকে সে সঙ্গে নিয়েই চলেছে। তবে অন্যান্য বিশেষণ তার বিষয়ে প্রয়োজ্য হ'তে পারে। (এই বর্ণনা অনুসারে আদর্শ দূত বাল্মীকির হনুমান ; হয়তো হনুমানের দৃষ্টান্ত থেকেই এই লক্ষণসমূহ রচিত হয়।)

প্রিয়ের সমাচার : অতিসতর্ক মল্লিনাথ বলছেন — পাছে কেউ ভাবে শুধু বার্তা শুনে কী লাভ, তাই যক্ষ বিরহকালে বার্তার শ্লাঘ্যতা বুঝিয়ে দিচ্ছে : এই বার্তা (আধুনিক কালে পত্র বা টেলিফোন) সাক্ষাৎমিলনের চাইতে অল্পমাত্র ন্যূন।

শ্লোক ১০৪

নিজেরও লাভহেতু : মল্লিনাথ ভারবি উদ্ধৃত করেছেন, 'পরোপকারের নামই লক্ষ্মী', আর শ্রীহর্ষ — 'সাধুসেবা, লক্ষ্মীলাভ ও আকাশভ্রমণ কার না অভিপ্রেত ?' পরোপকারহেতু পুণ্য ও আকাশভ্রমণরূপ সুখ মেঘেরও লাভ হবে। আয়ুষ্মান্* : পরোপকার হেতু যার আয়ু শ্লাঘনীয় (মল্লি); প্রশংসাত্মক বিশেষণ।

কেননা প্রাণীদের জীবন অস্থির : এখানে স্মর্তব্য যে দেবযোনি ও দেবতাগণ, এমনকি স্বয়ং ইন্দ্র অমর নন, প্রলয়কালে ত্রিলোকের ধ্বংস হয়, অসংখ্য ইন্দ্রের উত্থান ও বিনাশ ঘটেছে। যক্ষের আয়ুষ্কাল ও সম্ভোগের সীমা মানুষের তুলনায় অতি দীর্ঘ হ'লেও সে মরণশীল প্রাণীমাত্র, অতএব

* এই শব্দে এ-যাবৎ সংস্কৃত সম্বোধন-রূপ রেখেছিলাম, বর্তমানে তা বর্জিত হ'লো।— পঞ্চম সংস্করণের টী।

এ-ক্ষেত্রেও কুশল-প্রশ্নই প্রথম কৃত্য। যক্ষ 'অবিধবা' সম্বোধনদ্বারা ইতিপূর্বে জানিয়েছে সে নিজে ভালো আছে, এখন প্রিয়ার কুশল তার জিজ্ঞাস্য। কুশলসমাচারের উল্লেখ পূ৪-এ প্রথম পাওয়া যায়।

এখানেও আমরা বাল্মীকির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই: অশোকবনে সীতাকে হনুমান বলেছেন, 'দেবী, আমি রামের বার্তা নিয়ে এসেছি, তিনি কুশলে আছেন, তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।' (বা-রাম, রা-ব, সুন্দর: ৭)

শ্লোক ১০৫

কেবল মনোরথে: মূলে 'সংকল্প' (প্রণয়ের তৃতীয় দশা), মল্লির অর্থ মনোরথ বা অভিলাষ। উ৯০-তে যার জন্ম হৃদয়ে অথবা কল্পনায় ('হৃদয়নিহিতারম্ভম্') এখানে তারই উৎস অভিলাষ ('সংকল্পে'রও এক অর্থ কল্পনা)। শাদা বাংলায় দুয়েরই অর্থ 'মনে-মনে'। লক্ষণীয়, উ৮৬-৯৮এ পত্নীর প্রসঙ্গে উল্লিখিত অনেক তথ্য যক্ষ নিজের বিষয়েও ব্যবহার করছে (উ১০৫-১১১) —মানসরমণ, স্বপ্নমিলন, চিত্রদর্শন বা রচনা, অস্থৈর্য। অনুরাগের সমতাবশত নায়কনায়িকার একই অবস্থা বোঝানো হ'লো, অথচ তারই মধ্যে সুকুমার একটু প্রভেদ আছে যেন; কখনো মনে হয় নায়িকার কষ্ট বেশি, কখনো মনে হয় নায়কের, এবং দুই গুচ্ছে দুই রকমের স্বাদ পাওয়া যায়। অদূরে বা অব্যবধানে একই প্রসঙ্গের পুনরুক্তি 'মেঘদূতে' অনেক আছে (পূর্বমেঘের নদীনায়িকারা স্মরণীয়); কিন্তু এগুলোকে ঠিক পুনরুক্তি বলা যায় না; মূল প্রসঙ্গ এক হ'লেও, দৃশ্যগত বা ভাবগত বৈচিত্র্য অধিকাংশ স্থলেই বিদ্যমান। এই শ্লোকে বিশেষণ প্রয়োগের চাতুরী লক্ষণীয়; একই শব্দ, পরস্পর পঙক্তিতে বিন্যস্ত হ'য়ে, স্বল্প ও চারু পরিবর্তনের ফলে উভয় ক্ষেত্রেই মনোজ্ঞ হয়েছে। সব প্রথা মেনে নিয়ে, মহাশিল্পীরা প্রথার উপর বিজয়ী হন কেমন ক'রে, উত্তরমেঘের শেষাংশ তার প্রোজ্জ্বল দলিল।

মানসরমণ প্রসঙ্গে অন্য দুটি ঘটনা উল্লেখ্য। মহাভারতে আছে, মিথিলারাজ জনকের (সীতার পিতা নন) দেহে সুলভা নামে এক সন্ন্যাসিনী যোগবলে প্রবিষ্ট হন, এবং দেবশর্মা ঋষির শিষ্য বিপুল গুরুর অনুপস্থিতিকালে গুরুপত্নী রুচিরার দেহে ছায়ারূপে প্রবেশ ক'রে রুচিরাকে ইন্দ্রের লালসা থেকে রক্ষা করেন (অনু: বা-বা, শান্তি: ২২ ও অনুশাসন: ৯)। কিন্তু

যক্ষ যোগী নয়, তার অলৌকিক শক্তিও আপাতত বিনষ্ট হয়েছে ; 'মনে-মনে তোমার দেহে দেহ মিলাই', তার এই উক্তি সম্পূর্ণ মানবিক ব'লেই মর্মস্পর্শী।

শ্লোক ১০৬

সর্বসমক্ষে উচ্চার্য কথাও যে চুম্বনের লোভে কানে-কানে বলতো, সে আজ হৃদয়ের গোপন কথাও অন্যের মুখে ব'লে পাঠায়, এমনি দুর্দশা তার। পরবর্তী নয় শ্লোক (১০৭-১১৫) উত্তম পুরুষে রচিত ; যক্ষ, মেঘের মুখ দিয়ে, তার পত্নীকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করছে।

শ্লোক ১০৭

প্রিয়ঙ্গু (লতা) ও শ্যামা সমার্থক ; 'শ্যামা' বলতে প্রিয়দর্শনও বোঝায়, অন্যান্য অর্থের জন্য প্রিয়দর্শন টী উ৮৫ দ্র। প্রিয়ঙ্গুলতায় নারীর স্পর্শে ফুল ফোটে (টী উ৮১ দ্র)। ব্যাকরণ, অনুষঙ্গ ও সৌকুমার্য, তিন দিক থেকেই এই লতা প্রিয়ার দেহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

চণ্ডী—'ক্রুদ্ধা'। এখানে এই সম্বোধনের কারণ কী ? মল্লির ব্যাখ্যা উজ্জ্বল 'উপমানকথনমাত্রেণ ন কোপিতব্যমিতি ভাবঃ'। তোমার তুলনীয় কিছু আছে এ-কথা বলামাত্রই রাগ কোরো না, কেননা — শেষ চরণে বলা হ'লো — তোমার রূপের তুলনায় সত্যি আর-কিছু নেই। কিন্তু নেই ব'লে যক্ষ সুখী নয়, 'হায়' শব্দে তার আক্ষেপ প্রকাশ পাচ্ছে।

শ্লোক ১০৮

ধাতুরাগ—গেরিমাটি, পাহাড়েই তা পাওয়া যায়। ('কুমার' : ১:৪ ও ১:৭ দ্র)। মল্লির ব্যাখ্যা : পাথরের গায়ে পত্নীকে আঁকার পর যক্ষ নিজেকে তার পদতলে আঁকার চেষ্টা করতো, কিন্তু রা-ব একটি সরল অর্থ প্রস্তাব করেছেন, 'সে নিজেই চিত্রিত প্রিয়ার পায়ে পড়বার চেষ্টা করত।' মল্লির অর্থই সংগত, কেননা চোখের জল চিত্রাঙ্কনেরই অন্তরায় হ'তে পারে, পতনের নয়।

শ্লোক ১০৯

তরুপত্রে : বনদেবতাদের অশ্রুবিন্দু তরুপত্রে পড়ছে কেন ? মল্লি বলেন, তাঁরা স্থূলধারা অশ্রুধারণ করছেন, এই অর্থ ধ্বনিত হচ্ছে। তাছাড়া,

মহাত্মা গুরু ও দেবতার অশ্রু ভূমিতে পতিত হ'লে দেশভ্রংশ মহাদুঃখ ও মৃত্যু সূচিত হয়। এখানে দেবাশ্রু মাটিতে পড়ছে না, এটা যক্ষের পক্ষে সুলক্ষণ। মুক্তার মতো স্থূল অশ্রুবিন্দুর উল্লেখ 'রঘুবংশে'ও আছে (৬ : ২৮)।

শ্লোক ১১০

নিরুক্তকারের টীকা — 'বায়ু স্পৃশ্য, কিন্তু অমূর্ত, তাই আলিঙ্গনের অযোগ্য। যক্ষের এই কথা উন্মত্তের প্রলাপমাত্র, এই 'আলিঙ্গন'ও নির্দোষ। (এতে যক্ষের চরিত্রদোষ ঘটেনি)।' নিরুক্তকারের নির্বুদ্ধিতায় মল্লিনাথ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলছেন : 'এই মন্তব্যই উন্মত্তের প্রলাপ, অতএব উপেক্ষণীয়।' আমরা সর্বান্তঃকরণে মল্লিনাথকে সমর্থন করি। ১০৭-১০ শ্লোকে বিরহদশার চার বিনোদ বর্ণিত হয়েছে ; মল্লিনাথ 'গুণপতাকা' উদ্ধৃত ক'রে বলছেন যে বিয়োগের কালে সান্ত্বনার উপায় সদৃশ, প্রতিকৃতি, স্বপ্নদর্শন ও অঙ্গস্পৃষ্ট-স্পর্শ। (বা-রামে বিরহী রামের উক্তি : 'হে বায়ু, কান্তাকে স্পর্শ করার পর আমাকেও স্পর্শ কোরো।') যক্ষ প্রিয়ঙ্গু ইত্যাদিতে প্রিয়ার সাদৃশ্য দ্যাখে, পাথরে তার ছবি আঁকার চেষ্টা করে, স্বপ্নে মিলিত হয়, প্রিয়ার অঙ্গস্পৃষ্ট বায়ুকে স্পর্শ করে। প্রতিকৃতি ও স্বপ্নদর্শন, এই দুই বিনোদ যক্ষপ্রিয়ারও ব্যবহৃত।

শ্লোক ১১১

ত্রিযামা : দিনে ও রাত্রে চারটি ক'রে যাম আছে, কিন্তু রাত্রির প্রথম ও শেষ যামার্ধ কার্যত দিনের অংশ ব'লে রাত্রির এক নাম 'ত্রিযামা'।

শ্লোক ১১২

শ্লোক ১০৭-১১১তে যক্ষের উচ্ছ্বাস শুনে মনে হয় সে তার পত্নীর মতোই প্রণয়ের নবম দশায় পৌঁচেছে, কিন্তু এই শ্লোকে তার ধৈর্য ও সুবুদ্ধি প্রকাশ পেলো ; এই পরিবর্তন কিছুটা আকস্মিক। মল্লি বলেন, পতির দুর্দশার বিবরণে পত্নী পাছে ভীত হয়, যক্ষ তাই ধৈর্যের পরিচয় দিলো। কিন্তু পশ্চিমী সমালোচকেরা এতে দেখেছেন ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পন, কেউ বলেছেন পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যক্ষ নিজের দুঃখ ভুলে পুরুষোচিত আচরণ করেছে। এও হ'তে পারে যক্ষের হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো তার বিরহদশার আট মাসই কেটে গেছে — চার মাস বাকি, তাই এই ধৈর্যের সুর।

তুমিও, কল্যাণী : মল্লির মতে এখানে কল্যাণী = ভাগ্যবতী ; যক্ষ জানাতে চায় সে তার পত্নীর সৌভাগ্যের প্রভাবেই কোনোমতে বেঁচে আছে।

শ্লোক ১১৩

অনন্ত বা শেষনাগ বিষ্ণুর শয্যা। বর্ষার চার মাস (১১ আষাঢ় — ১১ কার্তিক) বিষ্ণু নিদ্রিত থাকেন, তাঁর উত্থানের তিথি কার্তিকের শুক্লা একাদশী। মিশরী দেবতা Horus-এর বার্ষিক নিদ্রা তুলনীয় ; বিষ্ণুর যেমন বর্ষার, তেমনি তাঁর নিদ্রা নীল নদীর বন্যার প্রতীক, যে-বন্যা ভারতের বর্ষার মতো, মিশরের সম্পদের নির্ভর। (চিত্র ৭ দ্র।)

'মেঘদূতে' কালের দুই স্তর বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করেছি (টি উ৯৭) ; মেঘের ভ্রমণের ও যক্ষের ভাষণের কাল এক নয়। মেঘের ভ্রমণ কাল্পনিক, কাব্যে অধিকৃত প্রকৃত কাল একদিন মাত্র (পয়লা আষাঢ়) — আসলে ঠিক ততটুকু সময়, যাতে 'মেঘদূতম্'-এর ষষ্ঠ থেকে শেষ শ্লোক আবৃত্তি করা যায়। শাপান্তের তারিখ পাঁজির হিশেবে পয়লা কার্তিকে পড়ে ; মল্লি লক্ষ করেছেন যে অতিরিক্ত দশ দিন উক্ত হয়নি, কোনো আধুনিক পাঠক তা নিয়ে বিব্রত হবে না।

শ্লোক ১১৪

দূতের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ তার হাতে বা মুখে একটি অতি গূঢ় অভিজ্ঞান পাঠাতে হয় — এমন কোনো বস্তু বা উক্তি, যা প্রেরক ও প্রাপক ভিন্ন অন্য কেউ জানে না। সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের হাতে রাম সীতাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়, সীতা বনবাস কালীন একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ব'লে, রামকে পাঠিয়েছিলেন একটি 'চূড়ামণি' (শিরোধার্য অলংকার)। যক্ষের অভিজ্ঞান কবিত্বগুণে অনেক বেশি সমৃদ্ধ, এবং প্রেমিকের পক্ষে সত্যিকার উপযোগী।

আমারই গলা ধ'রে : মল্লির ব্যাখ্যা — তোমার কণ্ঠলগ্ন অবস্থায় কেমন ক'রে অন্য নায়িকার কাছে যেতে পারি — কী অন্যায় অভিযোগ !

মৃদু হেসে, 'সান্তর্হাসম্' : মনে-মনে হেসে। জেগে উঠে নিজের ভুল বুঝে যক্ষপত্নীর হাস্যের কারণ সুখ ও লজ্জা, কিন্তু স্বামীর কাছে সে হাসি লুকোতে চায়।

ধূর্ত, 'কিতব' : এক অর্থ জুয়াড়ি।

শ্লোক ১১৫

লোকের কথা, 'কৌলীন'—লোকপ্রবাদ, gossip।

না যেন দেখা দেয় অবিশ্বাস: 'ময়ি অবিশ্বাসিনী মা ভূঃ'। আধুনিক পাঠকের মনে হ'তে পারে যক্ষ পত্নীকে তার প্রতি নিষ্ঠাবতী থাকতে বলছে (আমি মরেছি বা তোমাকে আর ভালোবাসি না ভেবে অন্য প্রণয়ী নিয়ো না), কিন্তু এ-রকম কোনো কল্পনা যক্ষের বা কালিদাসের পক্ষে অসম্ভব (টী পৃ৩৮ দ্র)। যক্ষ বলতে চায়, 'আমার মৃত্যু আশঙ্কা কোরো না, বা বিরহে আমার প্রেম নিবৃত্ত হয়েছে ভেবো না' — এর বেশি আর-কিছু নয়, কেননা সে আগাগোড়াই ধ'রে নিচ্ছে যে পত্নী নিয়তই তার জন্য প্রস্তুত থাকবে, নিজের বা পত্নীর মৃত্যুই তার প্রধান আশঙ্কা। ('আমার চরিত্রদোষ আশঙ্কা কোরো না', এই অর্থও বিবেচ্য।)

সংস্কৃতে 'স্নেহ' ও 'প্রেম'-এর সমার্থক ব্যবহারে বাধা ছিলো না, পৃ৪৫-এ 'পুত্রস্নেহ' অর্থে 'পুত্রপ্রেম' আছে। কিন্তু এখানে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট; অসহ বিচ্ছেদের প্রভাবে স্নেহ প্রেমরাশিতে পরিণত হ'লো। মল্লিনাথ 'রসাকর' থেকে সংযোগ বা মিলিত প্রেমের সাতটি পর্যায় তুলে দিয়েছেন: আলোকন (চোখে দেখা), অভিলাষ, রাগ (কামনা বা মিলনেচ্ছা), স্নেহ, প্রেম, রতি ও শৃঙ্গার। এই ক্রমানুসারে প্রেমের বিশেষ অর্থ — যে অবস্থায় বিচ্ছেদ অসহনীয়। লক্ষণীয়, উ৯৭-এ যক্ষপত্নীর প্রসঙ্গে 'স্নেহ' শব্দের ব্যবহার আছে, তার মন পতির প্রতি 'সম্ভৃতস্নেহ' ('সম্ভৃত'—বর্ধিত)। দুটি শ্লোক পাশাপাশি পড়লে ভাবা যেতে পারে যে বিরহে উভয়েরই 'স্নেহ' বর্ধিত হ'লেও পত্নীর মনে তা 'প্রেমে' পরিণত হয়নি; যক্ষ বলতে চায় দু-জনের মধ্যে সে বেশি ভালোবাসে।

শ্লোক ১১৬

এনো অভিজ্ঞান সঙ্গে: যক্ষের মতো, তার পত্নীও মেঘের মুখে কোনো অভিজ্ঞান পাঠাবে, তাতে যক্ষ বুঝবে মেঘ কর্তব্যে ত্রুটি করেনি।

প্রভাতকুন্দ: কুন্দ হেমন্ত বা শীতের ফুল (টী উ৬৬ দ্র), কিন্তু এখানে মনে হয় বর্ষাকালীন। Rooke-এর মতে এই 'কুন্দ' ও উ১০১-এর 'মালতী' সমার্থক—যূথী। M.W. 'কুন্দ' অর্থ যূথী ও করবীর (করবী) দু-ই দিয়েছেন। রা-বসুর মতে (তাঁর পত্র থেকে উদ্ধৃত করছি) 'জাতী আর মালতী একই—চামেলি। যূথী—জুঁই, জাতী বা চামেলী নয়। কুন্দ কখনই

করবী নয়। আমার মনে হয় মেঘদূতের কুন্দ আমাদের কুঁদ, চামেলি নয়। "প্রাতঃকুন্দ" শিথিল বটে, কিন্তু শিউলির মত ঝ'রে পড়ে না।'

শ্লোক ১১৭

আপনার : মূলে 'ভবতঃ'।

সাধুতা : মূলে আছে 'ধীরতা' — রা-বসু অর্থ দিয়েছেন সারবত্তা, নির্ভর-যোগ্যতা। যক্ষ বলছে, 'প্রত্যুত্তর পেয়েই আপনার ধীরতা অনুমান করবো তা নয়,' অর্থাৎ উত্তর না-পেলেও বুঝবো আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন।

শ্লোকের শেষার্ধ বিষয়ে মল্লি : শরতের মেঘ গর্জন করে বর্ষণ করে না, বর্ষার মেঘ বিনা গর্জনেও বর্ষণ করে। নীচজন কথা বলে কাজ করে না, সুজন কথা না-ব'লে কাজ করে। চাতক জল চাইলে বর্ষার মেঘ নিঃশব্দেই জল দেয়, তেমনি যক্ষের প্রার্থনাও সে পূরণ করবে। অর্থাৎ, পরোপকার করা মেঘের স্বভাব।

শ্লোক ১১৭

অনুচিত যাচনা : যক্ষ জানে তার অনুরোধ অনুচিত ; জড় মেঘ বার্তাবহ হ'তে পারে না (পৃ৫ দ্র)।

মল্লি 'সারস্বতালংকার' উদ্ধৃত করেছেন : 'কাব্যের অন্তে নায়কের ইচ্ছার অনুরূপ সর্বজনের প্রতি প্রয়োজ্য একটি আশীর্বাদ উচ্চারণীয়।' প্রিয়ার সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ না ঘটুক — কবি এই শুভকামনা পাঠককেও জানাচ্ছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই ভাবটিকে সুন্দর প্রকাশ করেছিলেন — '"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক," বন্ধু ! বন্ধুর আশিস লও।' এখানে 'বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ'-এর দুটো অর্থ করা যায় : বিদ্যুৎরূপিণী প্রিয়ার বিচ্ছেদ ও বিদ্যুৎস্ফুরণের উপযোগী ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছেদ। যুগবৎ দুই অর্থ অনুভূত হবার বাধা নেই।

এই টীকার প্রুফসংশোধনকালে আমাকে একাধিকভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

চিত্রপ্রসঙ্গ

চিত্র ১

এই মূর্তি Cnidian Venus নামে খ্যাত, এশিয়া মাইনরের দক্ষিণে ক্নিদস (Cnidos) দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে এটি বহুযুগ ধ'রে প্রাচীন প্রতীচীর মনোহরণ করে। আ খ্রি-পূ ৩৫০-এ প্রাক্সিতেলেস এটি রচনা করেন ; লুসিয়ান (আ খ্রি-পূ ১১৫-২০০)-এর সমকালীন এক লাতিন লেখকের রচনায় এই দেবীর মন্দিরদর্শনের উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। দ্রাক্ষালতায় পরিবৃত মন্দির, ফলপ্রসূ তরুতে বেষ্টিত ; সেই শ্যামল প্রাকৃত পরিবেশে শুভ্রতর দীপ্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মূর্তিমতী কামনা। 'কামনা' কথাটাই এখানে ঠিক, কেননা উক্ত লেখক ও তাঁর বন্ধুরা এই পূজনীয়াকে দেখে এতদূর মোহিত হয়েছিলেন যে কেউ-কেউ বেদীর উপর লাফিয়ে উঠে তাঁকে আলিঙ্গন না-ক'রে পারেননি। এই ব্যবহার পুরোহিতের ঠিক মনঃপূত হয়নি, কিন্তু পরে, কিঞ্চিৎ পারি-তোষিকের বিনিময়ে তিনি এমন ব্যবস্থা ক'রে দেন যাতে যাত্রীরা দেবীর পশ্চাৎভাগও অবলোকন করতে পারে, আর তার ফলে দর্শকদের উৎসাহ প্রায় অসীমে পৌঁছয়। কিন্তু এই ভুবনমোহিনী আজ বহুকাল ধ'রে লুপ্ত ; আধুনিক মানুষ দেখতে পায় তার রোমক অনুকৃতি, তাও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুই ধাপ দূরে সরানো। তবু, ছাপা ছবিতেও প্রতিভার সাক্ষর নেই তা নয় ; আমরা দেখতে পাচ্ছি, শীতল ও নিশ্চল মর্মর যৌবনে ও জৈবতায় স্পন্দমান।

চোদ্দ ও পনেরো শতকের ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রধান উৎস ছিলো লাতিন বা রোমক সংস্কৃতি, গ্রীক নয় ; স্বয়ং পেত্রার্কা গ্রীক ভাষা জানতেন না। আধুনিক জগৎ প্রাচীন গ্রীসকে উপহার পেলো ইতালি, ফ্রান্স, বা ইংলণ্ড থেকে নয় ; তথাকথিত ক্লাসিক মানসের বিপরীতধর্মী আঠারো শতকের ঝঞ্ঝাহত জর্মনির হাত থেকে। কিন্তু ক্লাসিক গ্রীক শিল্পের যে-ধারণা হ্বিঙ্কেল-মান্ ও গ্যেটে প্রচার করেন — এবং আজ পর্যন্ত যা লোকমানসে বদ্ধমূল — তার আংশিক প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির উপর। গ্রীক শিল্পে যে-তিনটি গুণ তাঁরা আবিষ্কার করেন — সৌষম্য, সরলতা ও পরিমিতি — তার মধ্যে শেষ দুটি মৌলিক গ্রীক শিল্পে স্থান পায়নি। পরবর্তী কালে জানা গেছে যে গ্রীক শিল্পের একটি প্রধান লক্ষণ ছিলো বর্ণবিলাস ; দক্ষিণ য়োরোপের যে-সব মূর্তি ও মন্দির হ্বিঙ্কেলমান্ দেখেছিলেন — এবং আমরাও দেখছি — তারা কাল, বায়ু ও বৃষ্টির প্রভাবে নিরঞ্জনতা প্রাপ্ত হ'লেও, মূল শিল্পীরা

তাদের সাজিয়ে দিয়েছিলেন বহুবিধ ভূষণে ও বর্ণপ্রলেপে। (আথেন্স মু্যজিয়মের কোনো-কোনো নমুনায় আজও তার আভাস দ্রষ্টব্য*। মর্মরমূর্তির গাত্রবর্ণ হ'তো জীবন্ত মাংসের মতো গোলাপি অথবা ব্রাউন, ওষ্ঠাধর রক্তিম, চুল কালো অথবা হলদে, চোখ রত্নরচিত। সোনার পাতে বর্ণ লেপন ক'রে তৈরি হ'তো বসন, শ্মশ্রু, হাতের অস্ত্র ও ঢাল, পাদুকা ও ভূষণদাম। প্রাক্সিতেলেস-এর মূর্তিসমূহে যিনি বর্ণলেপ করতেন তাঁর নাম ছিলো নিকিয়াস ; খ্যাতিতে তিনি প্রাক্সিতেলেস-এর প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। এ-সব তথ্য জানার পর আমরা বরং কৃতজ্ঞ বোধ করি বেশ কিছুটা দেরি ক'রে জন্মেছি ব'লে — যখন মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলো গ্রীক শিল্পের বর্ণময় বাহুল্যকে নিঃশেষে হরণ ক'রে নিয়েছে।

তাহ'লে গ্রীক শিল্পের যে-মৌলিক গুণ বাকি থাকলো, সেটি সৌষম্য বা হার্মনি। আলোচ্য প্রতিকৃতিতে এই গুণ সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

চিত্র ২

এ-যাবৎ আবিষ্কৃত যেগুলি প্রথমতম নারী বা দেবীমূর্তি, সেগুলি উর্বরতা ও প্রজননশক্তিরই দৃশ্যরূপ মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক য়োরোপে (আ খ্রি-পূ ২০,০০০) যে-সব নারীমূর্তি রচিত হয় (AIA, ১ম খণ্ড, চিত্র A৯ এ, বি, সি), সন্তান-ধারণের পরাক্রান্ত যন্ত্র ছাড়া তাদের আর-কিছু ব'লে ভাবা যায় না ; তাদের উদর, শ্রোণী ও স্তনযুগ বিরাট, মুণ্ড ক্ষুদ্র অথবা বিকৃত, নাক চোখ বা মুখ নেই। এই শক্তিরূপিণী আদিমাতাকে মানবজাতি ভুলতে পারে না ; সম্প্রতি পিকাসো যদি তাকে ফিরিয়ে নাও আনতেন, তবু বহু ঐতিহাসিক যুগ ধ'রে নারীমূর্তির বিবর্তনে আমরা তার প্রতিপত্তি দেখতে পেতাম। আফ্রিকার শিল্পে তার রাজত্ব ; মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার (আ খ্রি-পূ ৩০০০-১৫০০) নিদর্শনসমূহে তার নিশেন উড়ছে। (দেহকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে শুধু লিঙ্গ ও যোনি-গহ্বরের প্রতীকরচনা মোহেঞ্জোদারোরই কর্ম।) ভাবতে অবাক লাগে, নারীকে তার প্রজননধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে কত দেরি হয়েছে মানুষের, কী সুদীর্ঘ কাল কেটে গেছে 'সৌন্দর্য'কে আবিষ্কার করতে। এই যক্ষীমূর্তি সভ্য মানুষের সৃষ্টি, তার আত্মা আছে ; তার ঊর্ধ্বাঙ্গ

* আমার স্মৃতি থেকে একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি ; দেবী আথেনীর বিশাল এক মূর্তি, অবিকলভাবে বাস্তবধর্মী ; আয়ত নেত্রে নীলবর্ণের আভাসের জন্য প্রায় ভীতিকর অর্থে রোমাঞ্চকর। — চতুর্থ সংস্করণের পাদটীকা।

(হয়তো বাহু- ও স্তনযুগ ভগ্ন হয়েছে ব'লেই) আমাদের মনে সুন্দর ব'লে প্রতিভাত হয়, তবু তার অতিপীন উরুদ্বয়ে আদিমাতার স্মৃতিরেখা এখনো

চিত্র ৩

এই চিত্র যত উৎকৃষ্ট ততোধিক ভাগ্যবান ; ওঅল্টর পেটার একটি অবিস্মরণীয় অনুচ্ছেদে একে মহিমান্বিত করেছেন, এবং রাইনের মারিয়া রিলকে-র 'ভেনাসের জন্ম' কবিতা প'ড়েও (দুয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান সত্ত্বেও) এই চিত্র দুর্বারভাবে আমাদের মনে পড়ে। এর প্রধান লক্ষণীয় বস্তু এর মুখশ্রী, যা সুন্দর ও বিষাদময়, এবং বিষাদময় ব'লেই সুন্দর। পাশ্চাত্ত্য দৃশ্যশিল্পে এই প্রথম আমরা মুখশ্রী-মায়ার সম্মুখীন হলাম ; গ্রীক শিল্পের মুখাবয়বে নিখুঁত প্রত্যঙ্গবিন্যাস আছে, তার বেশি আর-কিছু নেই। বত্তিচেল্লির ভেনাসের দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত, 'অনাগত সুদীর্ঘ প্রেমের দিবসের দিকে', কিন্তু তাঁর গ্রীক ও রোমক প্রতিযোগীদের চোখ উপস্থিত মুহূর্তের চেতনাটুকুতেই সীমাবদ্ধ।

'দি ন্যুড' গ্রন্থে স্যর কেনেথ ক্লার্ক এই চিত্রের উপর গ্রীক প্রভাবের উল্লেখ করেছেন, শুধু চাক্ষুষ নয়, সাহিত্যিক প্রভাব। অজ্ঞাতনামা কবির (বা কবিদের) যে-সব রচনা হোমরীয় স্তোত্র নামে পরিচিত, তার একটিতে বর্ণনা আছে কেমন ক'রে আফ্রোদিতে সমুদ্র থেকে উঠলেন ; সেই কবিতার একটি ইতালীয় অনুকরণ এই চিত্রের উৎসস্থল ব'লে কথিত আছে। আমরা লক্ষ করি, দেবী এখানে সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও নিরাবরণ, কিন্তু হেলেনিস্টিক প্রথা অনুসারে তার যোনিদেশ লুক্কায়িত — এবং এখানে বত্তিচেল্লির সঙ্গে রিলকের মস্ত বড়ো প্রভেদ ধরা পড়ে।

এখানে উল্লেখ্য, একটি হোমরীয় স্তোত্রেই দেবীকে সালংকারা ও রশ্মি-বসনা ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে ; তাতেও বোঝা যায় আদি গ্রীক শিল্প ভূষণবিমুখ ছিলো না ('Hymn to Aphrodite', *The Homeric Hymns*-এর ষষ্ঠ কবিতা, লোয়েব সংস্করণে ঈভলিন হোয়াইট-কৃত ইংরেজি অনুবাদ দ্র)।

চিত্র ৪

'এই শ্লোকে নারীসৌন্দর্যের যে আদর্শ বিধৃত হয়েছে, অজন্তার মারকন্যার সঙ্গে তার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।' (টী উ৮৫) এই মন্তব্যের সঙ্গে এখানে কিছু

যোগ করা প্রয়োজন। পীন, বর্তুল ও পরস্পর-সংশ্লিষ্ট স্তন, ক্ষীণ কটি, গভীর নাভি, বিশাল উরু ও জঘন — প্রাচীন হিন্দুমানসে রমণীরূপের সর্বসম্মত লক্ষণ হ'লো এই। এর সবগুলি লক্ষণ মারকন্যায় দ্রষ্টব্য নয়; বরং চিত্র ২-কে কল্পনায় পূর্ণ করে নিলে বেশি সাদৃশ্য পাওয়া যায়, এবং কার্লীর (খ্রি-প ২য় শতক) একটি দ্বারপাল-মূর্তিতে (AIA, ২য় খণ্ড, চিত্র ৮১) এই লক্ষণ-সমূহের অবিকল আলেখ্য আছে। মারকন্যার দেহের গঠন কৃশতার দিকে, অথচ তার কটি ক্ষীণ নয়; তার নাভি অদৃশ্য, এবং আবৃত নিম্নাঙ্গে উরু বা জঘনের বিন্দুমাত্র স্ফাতি নেই। চিত্র ২, ৬, ১৫ বা ১৬-র তুলনায় তার দেহ অনেকটা এক ছন্দে গঠিত (তার বক্ষোদেশ ও কটির প্রসর সমান ব'লে মনে হয়); কিন্তু তার ভঙ্গিতে এমন একটি আশ্চর্য ভঙ্গুর নমনীয়তা আছে যে মনে হয় মৃদুতম স্পর্শেও সে ভূমিতে লুণ্ঠিত হবে। সবচেয়ে আশ্চর্য ও মোহময় তার অর্ধনিমীলিত চোখের দৃষ্টি: সে যেন কিছুই দেখছে না, বিন্দুমাত্র আত্মচেতনা তার নেই, যেন স্বপ্নের ঘোরে তাকিয়ে আছে সে, আর আমরাও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তাকে দেখছি। যে-পেলব, স্বপ্নিল, অর্ধ-ঘুমন্ত আবহ তাকে ঘিরে আছে, তারই জন্য যক্ষপ্রিয়ার প্রতিরূপ ব'লে মনে হয় তাকে — অন্তত আমরা এমনি ভাবেই যক্ষপ্রিয়াকে ভাবতে ভালোবাসি। আবয়বিক সাদৃশ্য না-থাকলেও এই দুই সৃষ্টিতে ভাবের দিক থেকে মিল আছে। '

মারকন্যার সব উন্মাদনা তার চোখে ও দেহের ভঙ্গিতে, তার মুখশ্রী সুন্দর নয়। চিত্র ৫-৬-এ যে-ক'টি মুখ দেখা যাচ্ছে তার একটিকেও রমণীয় বলা যায় না। এ-প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে আধুনিক যুগের জড়বাদী ব'লে যে-নিন্দা প্রচলিত আছে, সেটা কুসংস্কার; আসলে আধুনিক কালই আধ্যাত্মিক, সুন্দর মুখ আধুনিক কালেরই আবিষ্কার। যেমন গ্রীসে, তেমনি প্রাচীন ভারতে, প্রধান ভাবনা ছিলো দেহ নিয়ে; গ্রীস ছিলো ব্যায়ামবীরের উপাসক, এবং কালিদাসের সুপ্রচুর ও সমুজ্জ্বল দেহবর্ণনায় মুখের উল্লেখ নেই। নাক, চোখ, ঠোঁট ইত্যাদির বহু প্রথাসিদ্ধ বিশেষণ আছে; কিন্তু সমগ্রভাবে মুখশ্রীর যে-আবেদন, যার প্রভাবে ব্যক্তিত্ব নামক বস্তুটিকে আমরা চিনতে পারি, সে-বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্য সর্বত্র সমভাবে নিশ্চেতন। বত্তিচেল্লির পরে ক্লাসিকধর্মী রাফায়েল-এর বদনসমূহ মনকে টানে না, কিন্তু মুখশ্রীর চরম জয়ঘোষণা করলেন দা ভিঞ্চি তাঁর মোনা লিসায়, আর তার পরে ক্রিস্টফার মার্লোর পক্ষে লেখা সম্ভব হ'লো — 'Was this the face that launched

a thousand ships…?', এবং রেমব্রান্ট সৃষ্টি করলেন তাঁর বাঙ্ময় আননসর্বস্ব জগৎ।

কিন্তু এখানে আর একটু তফাৎ না-করলে ভুল হবে। প্রাচীন ভারত যে-মুখশ্রীকে আবিষ্কার করতে পারেনি তা শুধু নারীর, পুরুষের নয়। এ-প্রসঙ্গে আমি গান্ধার বুদ্ধের কথা ভাবছি না (VS, ১৫৪পৃ); গ্রীসীয়দের অনুকরণে প্রসূত সেই মুখটিকে বলা যায় অতিপক্ব, অত্যন্ত বেশি মানবিক, এবং রীতির বিচারে ক্ষয়িষ্ণু। আমার মন্তব্যের লক্ষ্য এলুরার বিবিধ বুদ্ধ- ও শিবমূর্তি (চিত্র ১০ ও ১২ দ্র), এলিফ্যাণ্টার অর্ধনারীশ্বর — এমনকি বিবাহকালীন পার্বতী (AIA, ২য় খণ্ড, চিত্র ২৫৮, ২৫৯), যার দেহ নারীর হ'লেও গ্রীবার উপরে শিবের মুখই বসানো, এবং সর্বোপরি, এলিফ্যাণ্টার তুলনাহীন ত্রিমূর্তি। মুখের তুলনীয় ভাবুকতা কোনো গ্রীক বা রোমক মূর্তিতে অচিন্তনীয়।

ফরাশি কবি পোল ভালেরি বলেছেন যে প্রাচ্য কলা সুখদা, আর গ্রীক শিল্প সুন্দর। প্রাচ্য কলার কোন-কোন নিদর্শন তিনি দেখেছিলেন জানি না, কিন্তু প্রাচীবাসীর কাছে ঠিক উল্টোটাই সত্য মনে হওয়া সম্ভব। অন্তত আমি গ্রীক শিল্পের যে-ক'টি নমুনার সঙ্গে পরিচিত, তার একটিকেও 'সুন্দর' আখ্যা দিতে আমার বিবেকে বাধে; ঐ দুরূহ ও বহুমুখী শব্দটি বিষয়ে আমার যা ধারণা তার সঙ্গে জগৎবিখ্যাত ভেনাস বা আপোলোগণের মিল নেই। ন্যুয়র্কের মেট্রপলিটান ম্যুজিয়ম অব আর্টস-এ মিলো-র ভেনাসের একাধিক প্রতিমূর্তি দেখেছি; আমার মন সাড়া দেয়নি। এর কারণ অনভ্যাস বলা যায় না, কেননা ঐ মূর্তির ছাপা ছবি আবাল্য আমাদের সহচর। এমনও ভাবতে পারি না যে গ্রীসে গেলে দৃষ্টিলাভ হ'তো, কেননা আমি এলুরা বা এলিফ্যাণ্টাতেও যাইনি,* এবং আজকের দিনের ছাপা ছবি খুব কম ফাঁকি দেয়, ভাস্কর্য হ'লে বরং মূলের চেয়ে কিছু বেশিও দাম করতে পারে।

গ্রীক শিল্প আদ্যন্ত প্রকৃতিপন্থী; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষম সমন্বয়কে সে সুন্দর ব'লে ভুল করেছিলো। একটি মূর্তির জন্য প্রাক্সিতেলেস বহু মডেল ব্যবহার

* এই মন্তব্য লেখা হবার পর আথেন্স ও এলিফ্যাণ্টা দুটোই আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। আথেন্স বিষয়ে জগৎবাসীরা আবহমান যা ব'লে এসেছে আমিও তা বলতে বাধ্য — আথেন্স অতুলনীয়। কিন্তু গ্রীক শিল্প বিষয়ে আমার ধারণায় মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। — তৃতীয় সংস্করণের পাদটীকা।

করতেন ; কারো কপোল, কারো চিবুক, কারো কটি, কারো উরু ও কারো বা জঙ্ঘা নিয়ে রচনা করতেন তিলোত্তমাকে। ফলত, মূর্তিটি হ'তো আলিঙ্গন-যোগ্য কামোদ্দীপক, বাস্তব অর্থে কাঙ্ক্ষণীয় — অর্থাৎ, জীবনের সঙ্গে যে-ব্যবধান সার্থক শিল্পের নিশ্চিত লক্ষণ ব'লে আমাদের মনে হয়, তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রেই গ্রীক শিল্প সম্ভব হ'তে পেরেছে, হলিউডের বিশ্ব-প্রেয়সীরা প্রাচীন ভেনাসেরই আধুনিক সংস্করণ। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্পের মূল কথা অনুকরণ নয়, ভাবনা — সেকেলে ভাষায় ধ্যান ; তার আদর্শ প্রকৃতি নয়, অতিপ্রকৃতি ; সেইজন্য বি-কৃতি বা ডিস্টর্শনে তার ভয় নেই। বুদ্ধের বাহু ও কর্ণের অস্বাভাবী দৈর্ঘ্যের দ্বারা বুঝিয়ে দেয়া হ'লো, তিনি মানব নন, দেবতা। দেবতা মানেই অলৌকিক, অলভ্য, অলোভনীয়, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং আধুনিক ভাষায় 'আর্ট' কথাটা এই অলৌকিকেরই নামান্তর। গ্রীস ও রোমে, ভারতের মতোই, দেব দেবী ও দেবযোনিদের বহু মূর্তি রচিত হয়েছে ; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নিদর্শনসমূহে আমরা দেখতে পাই দৈবতার পরা-কাষ্ঠা, আর ভারতে হস্তীর মতো জন্তুও (চিত্র ১৩ দ্র) শিল্পে রূপায়িত হ'য়ে কিছুটা দেবত্ব পেয়েছে। আপোলো বা ভেনাস নামে মাত্র দেবতা, আসলে অতি সুদর্শন মানব ও মানবী। কিন্তু ভারতশিল্পে এমন কোনো নারীমূর্তি নেই (অন্তত খাজুরাহোর আগে পর্যন্ত), যা প্রাকৃত অর্থে নারীমূর্তি। যক্ষী বা অপ্সরা, পার্বতী বা দুর্গা — নাম যা-ই হোক না, আমরা দেখামাত্র অনুভব করি সে অপ্রাকৃত, যামিনী রায়ের ভাষায় 'রচিত', সাংসারিক নয়, জীবনধর্মী নয়, আমাদের ব্যবহার, প্রয়োজন ও কামনার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই তার। আদিরসে পরিপ্লুত অপ্সরামূর্তিও নির্ভুলভাবে এই দূরত্ব বুঝিয়ে দেয়, তাকে আলিঙ্গনের কল্পনাও অসম্ভব মনে হয়, কেননা সে দেবী, আর আমরা মরত্ব-ভোগী জীব মাত্র। ইয়েটস নিজেকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যৌবনের 'তেল ও সলতে' ফুরোবার পর,

> '...to draw content
> From beauty that is cast out of a mould
> In bronze, or that in dazzling marble appears.'

কেননা 'The living beauty is for younger men'। কোনো ভারতীয় শিল্পকর্মকে মনে রেখে এ-কবিতা হ'তে পারতো না, কেননা তা 'সপ্রাণ সৌন্দর্যে'র প্রতিরূপ নয়, স্বতন্ত্র সৃষ্টি। স্বয়ং মারকন্যা, মূর্তিমতী রতি, সেও কোনো রক্তমাংসের মোহিনীর আলেখ্য নয়, তার বাহুর আকার

ও চক্ষুর আকৃতি অস্বভাবী; সর্বদেহে পূর্ণ যৌবন ও পূর্ণ নারীত্ব নিয়েও সে স্পষ্টই অমানবিক; যে-ধ্যান সে ভাঙাতে চাচ্ছে তার নিজের দৃষ্টি যেন সেই ধ্যানেই ভরপুর।

চিত্র ৫-৬

যক্ষ ও যক্ষীর পায়ের তলায় যে-বিকটাকার মূর্তিদ্বয় দেখা যাচ্ছে তাদের নাম 'অপস্মার'—বিস্মৃতি, অর্থাৎ অজ্ঞান বা অবিদ্যা। দেব, দেবী ও দেবযোনিদের পদতলে জন্তু বা বামনের রূপে অপস্মার প্রায়ই চিত্রিত হ'তো, কেননা তাঁরা স্বভাবতই অবিদ্যাকে দমন ক'রে থাকেন। লক্ষণীয়, মূর্তিদ্বয়ের মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত, অর্থাৎ তারা দমিত হ'য়েই সুখী ও তৃপ্ত; মহাবলীপুরম্-এর মূর্তিতে (AIA, ২য় খণ্ড, চিত্র ২৮৪), দুর্গার হাতে ধ্বংসোন্মুখ অসুরের মুখেও (তার মহিষমুণ্ড সত্ত্বেও) এই রকম তৃপ্তির ভাব দেখা যায়। Evil বিষয়ে হিন্দুর ধারণা এখানেও প্রতিফলিত; যেমন সংস্কৃতে 'evil'-এর প্রতিশব্দমাত্রেই নঞর্থক, তেমনি অসুরকুল যেন নিজেরাই জানে যে বিশ্বব্যবস্থায় তাদের সত্যি কোনো স্থান নেই, তাদের জন্মই দমিত হবার জন্য। তবে ১২-১৩ শতকের দক্ষিণী নটরাজ-মূর্তিতে (AIA, ২য় খণ্ড, চিত্র ৪১১-১২) অপস্মারের মুখে কিছুটা পীড়া ও প্রতিবাদের ভাব ফুটেছে।

চিত্র ৬-এ যক্ষীর বাহুতে যে-তোতাপাখিটি ব'সে আছে, পালিকার সঙ্গে তার প্রণয়সম্বন্ধ (যক্ষপ্রিয়ার সারিকা স্মরণীয়)।

চিত্র ৭

এটি গুপ্তযুগের অন্যতম কৃতি।

প্রাগার্য ভারতে প্রজননশক্তির দেবী ছিলেন শতদলবাসিনী পদ্মা বা পদ্মা-লক্ষ্মী; স্ত্রীজাতির এত বড়ো সম্মান পুরুষশাসিত আর্যসমাজ সহ্য করলেন না, তাঁরা প্রজননদেবের স্থান দিলেন ব্রহ্মাকে, আর লক্ষ্মীকে বিষ্ণুপত্নীরূপে স্বীকার করলেন। তবু, লক্ষ্মীর কাছে ব্রহ্মার ঋণ পদ্মসূত্রে চিহ্নিত হ'য়ে রইলো, প্রজাপতিও পদ্মাসনে উপবিষ্ট। এই ক্ষোদিত মূর্তির উপরের সারির মধ্যস্থলে আছেন চতুর্মুখ; তাঁর ডান দিকে ঐরাবতসহ ইন্দ্র, বাঁ দিকে সষণ্ড শিব ও পার্বতী, বাঁ দিকের শেষ মূর্তিটি সম্ভবত ময়ূরবাহন কার্তিকের। লক্ষ্মী, সাধ্বী স্ত্রী, বিনম্রভাবে পতির পদসেবায় রত। নিচের সারিতে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে দেখা যাচ্ছে।

বিষ্ণু শুয়ে আছেন স্বপ্নময় ললিত ভঙ্গিতে ; অনন্তনাগের বিরাট কুণ্ডলী তাঁর শয্যা ; প্রসারিত বহুমুখী ফণা তার ছত্র ; তাঁরই দেহ থেকে উত্থিত হয়েছে সেই মৃণাল, যার পুষ্পাধারের উপর প্রজাপতি আসীন। সর্প, পদ্ম ও বিষ্ণুর তরঙ্গায়িত অবয়বরেখা পরস্পরের সমর্থক ও পরিপূরক ; সমগ্র রচনাটিতে উদ্ভিদ, জান্তব ও মানবিক প্রাণশক্তি একছন্দে প্রবাহিত। বিষ্ণুর অনন্তশয্যার বিষয়ে টী উ১১৩ দ্র। লক্ষণীয়, শিব ও বিষ্ণু উভয়ের সঙ্গেই সাপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, যে-সাপ, সর্বাঙ্গে মাটি ও জলের সংলগ্ন ব'লে, পার্থিব উর্বরতার প্রতীক।

চিত্র ৮

এই ছবি দেখে 'মেঘদূতে'র পূ২২ ও ৪৭ আমাদের মনে পড়ে। যে-সব গগনচারী দম্পতি দূর থেকে পৃথিবীর নদী ও মেঘ অবলোকন করে, মেঘের ডাকে ত্রস্ত হ'য়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় — এরা তারাই। রাফায়েল ইত্যাদির দেবদূতগণের মতো এরা পক্ষবান বা পক্ষবতী নয় ; গুরু প্রস্তরে গড়া এদের দেহ, অথচ এমনি লঘু, গতিশীল, সলীল এদের ভঙ্গি যে কাউকে ব'লে দিতে হয় না এরা উড্ডীন। এখানেও আমরা গ্রীক-রোমক ও ভারতীয় মনোধর্মের প্রভেদ বুঝি ; পশ্চিমের ক্লাসিক শিল্প বস্তুটাকে আঁকড়ে থাকে, প্রাচীর ঝোঁক ভাবের ও ভঙ্গির উপর, যার সমন্বয়ে বস্তুকে বাদ দিয়েও অভিজ্ঞতাকে ফোটানো যায়, যাকে আমরা আধুনিক পরিভাষায় চিত্রকল্প নাম দিয়েছি। আমরা তাই ভেবে পাই না রাফায়েল-এর মাদোনায় কোন গুণ আছে যা কোনো রূপসী পার্থিবাতে নেই, প্রায় অবিশ্বাসে তাকিয়ে থাকি রুবেন্স-এর অতি স্বাস্থ্যবান স্থূলবপু যীশুর দিকে ; এবং পশ্চিমী শিল্প যেখানেই প্রাকৃতের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে — এল গ্রেকো থেকে ভ্যান গ, রেমব্রান্ট থেকে রুয়ো পর্যন্ত — সেখানেই আমাদের মন সহজে ও নিঃসংশয়ে সাড়া দেয়। রুবেন্সের দেবপ্রতিমায়, আমাদের মতে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি ; কিন্তু এল গ্রেকোর কৃশ, দীর্ঘায়িত ও বি-কৃত যীশুমূর্তিকে দেখামাত্র, আমরা তাঁকে শিব অথবা বুদ্ধের মতোই পূজনীয় ব'লে চিনতে পারি।

চিত্র ৯

ভারতশিল্পে মুখের গড়ন প্রায়ই গোল ছাঁদের (সংস্কৃতে বলে 'বদনমণ্ডল') কিন্তু চিত্র ৯ ও ১০-এ ডিম্বাকৃতি মুখ দেখতে পাচ্ছি। কার্তিকের প্রদীপ্ত চক্ষু

ও ক্ষীণ, তরুণ দেহের ভঙ্গিতে বীরত্বের ব্যঞ্জনা নির্ভুল। এই দেবসেনাপতি চিনতে হ'লে বাংলাদেশের নবনীকান্ত কার্তিকটিকে ভুলতে হবে। (টী পৃ ৪৩, ৪৫-৪৬, ৫১ ও ৫৮ দ্র।)

চিত্র ১০

টী পৃ ৩৭ দ্র।

নটরাজের শিব বলতে আমরা প্রায় অনিবার্যভাবে দক্ষিণভারতীয় মূর্তি কল্পনা করি, যেখানে শিব অগ্নিবলয়ে পরিবৃত হ'য়ে চতুর্ভুজে সাংকেতিক মুদ্রা নিয়ে নৃত্যরত। কিন্তু এলুরার কল্পনা একেবারেই ভিন্ন; তাতে শিবের ভুজ দুটির বেশি নয় আর মুখ ও দেহ ক্ষীণতর ও তরুণতর। শ্লোক পৃ ৩৭ প'ড়ে নটরাজের যে-ছবি আমাদের মনে জাগে, তাকে (বাহুসংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও) এলুরার মূর্তির সঙ্গে মেলানো সম্ভব, দক্ষিণভারতীয়ের নয়। এলুরায় অসুরহন্তা শিবেরও একটি স্মরণীয় মূর্তি আছে (AIA, ২য় খণ্ড, চিত্র ২১৭)। হিন্দু শিল্পে শিব, দুর্গা বা কৃষ্ণ যখন বধ করেন বা শাস্তি দেন, তখনও তাঁদের মুখ থাকে বিশান্ত ও ধ্যানসুন্দর — বধ্যের প্রতি কোনো ক্রোধ নেই তাঁদের, আর অশুভনাশনের জন্য লেশমাত্র প্রয়াসও তাঁদের করতে হয় না। পক্ষান্তরে, এল গ্রেকোর বিখ্যাত চিত্রে—যাতে যীশু মন্দির থেকে কুসীদজীবীদের বিতাড়িত করছেন—(VS, পৃ ৪২ ১-৩) ঈশ্বরপুত্রের চোখে রোষাগ্নি প্রোজ্জ্বল। দুই মানসতার প্রভেদ পদে-পদে বোঝা যায়।

চিত্র ১১-১২

টী পৃ ৫৭ ও ৫৯ দ্র।

চিত্র ১৩

টী পৃ ২ ও ১৪ দ্র। খ্রি-পূ দুই শতকের সাঁচী থেকে আরম্ভ ক'রে খ্রি-প তেরো শতকের কোনারক পর্যন্ত হস্তীমূর্তি ভারতশিল্পে প্রচুর। ভারবাহী বা caryatid রূপে তাদের উল্লেখ্য ব্যবহার হয়েছে এলুরায় (AIA, ২য় খণ্ড, চিত্র ১০৯ দ্র)।

চিত্র ১৪

গুপ্তযুগ ভারতশিল্পের স্বর্ণযুগ ব'লে কথিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার নিদর্শন

আমাদের কাল পর্যন্ত অল্পই পৌঁচেছে। যে-ক'টি নারীমূর্তি নিশ্চিতভাবে গুপ্তযুগের ব'লে চিহ্নিত হয়েছে, তার মধ্যে রাজগীরের নাগিনী উল্লেখ্য (AIA, ২য় খণ্ড, চিত্র ১০৫-বি দ্র)। চিত্র ২-এর তুলনায় রাজগীর-নাগিনী (খ্রি-প পঞ্চম শতক) অনেক বেশি পরিশীলিত হ'লেও, কটির ক্ষীণতা, উদরের স্ফীতি ও স্তনের পীনত্ব সে হারায়নি। এই যমুনামূর্তি রাষ্ট্রকূট-যুগের ; এতে গুপ্তযুগের পরিশীলনপ্রীতি চরমে পৌঁচেছে। লক্ষণীয়, এর দেহটি প্রায় যুবাপুরুষের মতো, নারীলক্ষণ সোচ্চার নয়, মুখের ভাবেও নারীত্বের ব্যঞ্জনা কম। কঠিনভাবে বিধিবদ্ধ অভিজাত সমাজে যে-শিল্পের জন্ম হয়, তাতে নারী ও পুরুষের আবয়বিক প্রভেদ অস্পষ্ট হ'য়ে যায়, বিশেষজ্ঞরা এই রকম ব'লে থাকেন। মিশরী শিল্প এই মতের সমর্থন করে, কিন্তু ইতিহাসে এর উল্টো সাক্ষ্য মেলে না তাও নয়। তবে মহাবলীপুরম-এর মহাকীর্তিতে (গঙ্গাবতরণ, খ্রি-প সপ্তম শতক, AIA, ২য় খণ্ড, চিত্র ২৭২-৫ দ্র) এই ধারাই দেখা যাচ্ছে ; স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সেখানে ক্ষীণাঙ্গ, দার্শনিক ভাষায় 'সূক্ষ্ম' ; এবং দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যথাসম্ভব অবদমিত। নারী ও পুরুষের দেহের যেগুলো সামান্য লক্ষণ, ভারতশিল্পে পল্লব-যুগ সেদিকেই মনোযোগী ছিলো, কিন্তু নারীদেহে যৌনতা ও দৈবতার সমন্বয় সগৌরবে ফিরে এলো কোনারকে।

চিত্র ১৫-১৬

ভারতশিল্পের শেষ সুপক্ক ফল কোনারক ; কিন্তু তার দুই শতক পূর্ববর্তী খাজুরাহোতেই যেন অবক্ষয়ের আভাস দেখা যায়। চিত্র ১৫-র সহাস্য অপ্সরা যেন কবিতার অধিষ্ঠাত্রী, আর চিত্র ১৬-র সুচারু ও সুপ্রসাধিতা নারীমূর্তি প্রায় একজন সামাজিক ভদ্রমহিলা। ভুবনেশ্বরের অপ্সরা যেন আলোকে আকাশে নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে মেলে দিয়েছে, তার ঠোঁটের হাসিতে আছে ভাবোন্মাদনা, আর খাজুরাহোর সুন্দরী যেন চিত্রিত হবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হয়, মুখশ্রী ও হাসি নামক আশ্চর্য বস্তু কোনারকে চরম পরিণতি লাভ করে (AIA, ২য় খণ্ড, চিত্র ৩৬২ ও ৩৬৯ দ্র)।

চিত্র ১৭

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ভারতের ইতিহাস পড়লে মনে হয় মাঝখানকার অনেকগুলো পাতা লুপ্ত হয়েছে এ-কথা যে সত্য তা শিল্পকর্মের ধারা-

বাহ্যিক অবলোকনেও উপলব্ধি হয়। এই রাজপুত-চিত্র দেখে আমাদের মনে প'ড়ে যায় যে জগতে সব গৌরবই অস্থায়ী ; যে-তেজ, দার্ঢ্য ও সাহস আমরা এতক্ষণ ধ'রে দেখে এলাম, হঠাৎ তার বদলে দেখছি এক অতি মৃদু সৌকুমার্য। বিন্যাস ভালো, নৈপুণ্যের অভাব নেই ; কিন্তু হরপার্বতী দেবত্ব পরিহার ক'রে দৈশিক ও ক্ষুদ্র মানবে পরিণত হয়েছেন।

চিত্র ১৮

ইনি কি 'মেঘদূতে'র যক্ষ, না বাল্মীকির ভূমিকায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ? যে-বীণা যক্ষপ্রিয়ার অঙ্কশায়িনী, তাকে যক্ষের কোলে বসিয়ে অবনীন্দ্রনাথ সম্ভবত তাঁর কবিস্বভাব বোঝাতে চেয়েছেন। বর্ষাগমে রামগিরি আশ্রম ব'লে এই স্থলটিকে চেনা যাচ্ছে, কিন্তু 'বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ-মেঘে'র দেখাটি ঠিক যেন পেলাম না।

তেরো শতকের একটি চীনে চিত্র আছে, তার নাম 'চন্দ্রাহত কবি' (VS, পৃ ৪৫)। ছবির বাঁ কোণে বাঁকা পাহাড়ের অংশ, একটি আধো-লুকোনো গাছের সরু দুটি ডাল দু-দিকে এগিয়ে এসেছে, পাহাড়ের তলায় শাদা-কাপড়-পরা ক্ষুদ্রাকার কবিকে কোনোরকমে দেখা যাচ্ছে, তার তলার দিকের ডান কোণে ক্ষুদ্রতর ভৃত্যটিকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ছবির অধিকাংশ জুড়ে আছে এক অস্পষ্ট অর্ধালোকিত বিশাল আকাশ — কুয়াশাময় জ্যোৎস্নায় আচ্ছন্ন, একেবারে উপরের দিকে ছোটো, চ্যাপ্টা, ঝাপসা চাঁদটিকে কষ্টে চিনে নিতে হয়। যে-কবি চাঁদ দেখছেন তাঁকে আমরা দেখছি না এখানে, যে-চাঁদটিকে দেখছেন তাকেও না, কবির সেই দেখাটাকেই দেখছি। এই শিল্পী 'মেঘদূতে'র ছবি আঁকলে হয়তো সারা পট জুড়ে একখানা মেঘ আঁকতেন, এক কোণে অতি ক্ষুদ্র যক্ষ, যে সেই মেঘকে দেখছে ; আমরা তাহ'লে যক্ষের মেঘ-দেখাটাকেই দেখতে পেতাম।